ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

Imran Ibn Hossain

ভূমিকা

সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বকে বর্জন করা হয়েছে। গ্রহন করা হয়েছে যাদুশাস্ত্রকেন্দ্রিক দর্শন উৎসারিত মিথ্যা সৃষ্টিতত্ত্ব। মুসলিম আলিমগন এসব গ্রহন করে নিয়েছেন। সেই সাথে ইসলামের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। এই বিকৃতির শুরু যেদিন থেকে গ্রীক দর্শন আরবে প্রবেশ করে, সেদিন থেকে। ওই যুগের আলিমগনও সেসব দ্বারা ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে শুরু করেন। একপর্যায়ে এখন আর অধিকাংশ মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্বসংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবীদের(রাঃ) আকিদা রাখে না। বরং এমন কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ইসলামের সাথে মিশ্রন ঘটিয়েছে যার উৎস শয়তান এবং যাদুবিদ্যার কুফরি শাস্ত্র। তারা 'প্রাকৃতিক দর্শন'কে গ্রহন করে কুরআন সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে, সেসবকে দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। তারা কুফর ও শিরকে ভরা বানোয়াট আকিদা গুলোর প্রচার করার সময় গ্রহনযোগ্য করবার জন্য কুরআনের পবিত্র আয়াতগুলোকে ব্যবহার করছে এই বলে যে "কুরআনে ১৪০০ বছর আগে অমুক অমুক বিষয় গুলো বলেছে", যা অপবিজ্ঞানী, দার্শনিকরা বলছে! নাউজুবিল্লাহ!! এভাবে সুস্পষ্ট বৈপরীত্যপূর্ন কুফরকে কুরআন এর দলিল দ্বারা সত্যায়ন এবং বিপরীত দিক দিয়ে, কুরআনের বর্ননার সাথে ওই সব শয়তানি আকিদার মেলবন্ধনের অপচেষ্টা চলছে।

অথচ বর্তমান অপবিজ্ঞানী,প্রাচীন যাদুকররা যা বলে তা তাদের অনুমান এবং শয়তানের বক্তব্য ছাড়া কিছুই নয়। ওদের কথা বাস্তব জগতের সাথেও কোনরূপ সাদৃশ্যতা রাখে না। বাস্তব জগতে বরং সেটাকেই সত্যরূপে দেখা যায়, যা রহমান আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে এবং সাহাবিদের(রাঃ) বর্ননাগুলোয় পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপবিদ্যার ধারক এবং শয়তানের আউলিয়ারা ১% সত্যের সাথে অনুমান নির্ভর ৯৯% কুফরি দর্শন মিশ্রিত করে প্রচার করে, মূর্খরা এতেই ফাঁদে পড়ে। তারা শয়তানের এবং তার অনুসারীদের অনুসরন করতে শুরু করে। আজকের সময়ে হাজারো ফিতনার মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত আকিদাগত ভ্রষ্টতার ফিতনায় উম্মাহ নিমজ্জিত। আপনারা ইতোমধ্যে বুঝে গেছেন যে,প্রচলিত বিজ্ঞান তথা ন্যাচারাল ফিলসফি অভিশপ্ত

দার্শনিক/যাদুকরদের মনগড়া কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা "বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?”[১] নামের কিতাবে এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অর্থহীন কল্পনা, বিভিন্ন যাদুশাস্ত্র এবং শয়তান হচ্ছে সেসব অপবিজ্ঞানীদের বিকৃত বিদ্যা ও বিশ্বাসব্যবস্থার উৎস। আমাদের কাছে ওসবের কোন গ্রহনযোগ্যতা নেই। এমতাবস্থায় সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। একমাত্র কুরআন হাদিসে বর্নিত সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আসমান-জমিনের বর্ননাই একমাত্র সত্য এবং বিশুদ্ধ। যা সর্বপ্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে । এজন্য সত্য মিথ্যাকে স্পষ্ট করতে এবং সতর্ক করতে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ধারাবাহিক আর্টিকেল প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি। আমি এখানে নিজস্ব কোন নবউদ্ভাবিত আকিদা বা চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করছি না, বরং এটা কুরআন সুন্নাহর দালিলের সুবিশাল সংকলন। এটা ১৪০০ বছর আগের সাহাবীদের সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আকিদা,জ্ঞানকেই পুনরুজ্জীবন করার প্রয়াস মাত্র। এ লক্ষ্যে cosmogony সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত,অজস্র সহীহ ও দুর্বল হাদিস এবং প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও সাহাবীদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাফসীর নিয়ে আসা হবে, ইনশাআল্লাহ। আমাদের কাছে কাফির মুশরিকদের(অপবিজ্ঞানীদের) মনগড়া এবং যাদুশাস্ত্র নির্ভর(অপবিজ্ঞান তথা) কুফরি বিশ্বাসের চেয়ে 'প্রাচীন বরেন্য উলামা, মুফাসসীরীন ও সাহাবীদের(রাঃ) দ্বারা গৃহীত' কুরআন সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসরাইলীয় বর্ননাও শত সহস্রগুন উত্তম।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ বুখারীতে আমর ইব্ন আস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا على ومن كذب على متعمدا فليبوأ مقعده من النار .

অর্থাৎ- “আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও, বনী ইসরাঈল সূত্র থেকেও বর্ণনা করতে পার তাতে কোন অসুবিধা নেই এবং আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা কর, তবে আমার নামে মিথ্যা রটনা করো না। ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা রটনা করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।”

দীর্ঘ এ লেখনীর মাঝে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বের পাশাপাশি মাঝেমধ্যে বর্তমান সময়ে বিচিত্র অপব্যাখ্যার চিত্রও তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাই এবং ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আশাকরি এসমস্ত বিষয়ে চলমান বিতর্ক-মতানৈক্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু তাদের ব্যপারে আশাহীন যারা কুরআন সুন্নাহর দলিলকে যথেষ্ট মনে করে না। যাদের হৃদয়ে ব্যধির দরুন সজ্ঞানে কাফিরদের কুফরি আকিদাকে গ্রহন করে এবং সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিকতা দেখা স্বত্ত্বেও সেগুলোকে দ্বীনের সাথে মেশাতে চায়। আল্লাহর কাছে মু'তাযিলা, মুরজিয়া এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য পথভ্রষ্ট ফের্কার ফিতনা থেকে পানাহ চাই।

[১] বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

সূচি

পর্ব ৪

যমীনের প্রান্তসীমা

মানচিত্রের বাইরের অদেখা জগৎ

পর্ব ৫

পাহাড়-পর্বত

পর্ব ৬

আসমান

সুউচ্চ জমাট ঢেউ ও সুরক্ষিত ছাদ

পর্ব ৭

আসমান - যমীন স্থির

পর্ব ৮

চন্দ্র-সূর্য

পর্ব ৯

নক্ষত্রমালা ও ছায়াপথ

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব
পর্ব -১

সৃষ্টি জগতের সূচনাঃ

আলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্ট জিনিসের ব্যপারে মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম সৃষ্টি পানি,আরশ,কলম,আলো আধার প্রভৃতির কোনটি সেটা আল্লাহই ভাল জানেন।

আবার এসবের মধ্যে কোন্‌টা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এ ব্যাপারেও আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, সব কিছুর আগে কলম সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন জাওযী (র) প্রমুখের অভিমত। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আর কলমের পর সৃষ্টি করা হয়েছে হালকা মেঘ। তাদের দলিল হলো, সে হাদীস যা ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب فجري في تلك الساعة كائن إلى يوم القيامة .

অর্থাৎ— "আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তাহলো, কলম। তারপর তাকে বললেন, লিখ—তৎক্ষণাৎ সে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা লিখে চলল।" হাদীসে এ পাঠটি ইমাম আহমদের। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব বলে মন্তব্য করেছেন।

পক্ষান্তরে হাফিজ আবুল আলা হামদানী (র) প্রমুখ এর বর্ণিত তথ্য মোতাবেক জমহুর আলেমগণের অভিমত হলো সর্বপ্রথম মাখলূক হলো, 'আরশ'। ইব্‌ন জারীর যাহ্‌হাক সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে এটিই বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ইমাম মুসলিমের হাদীসটিও এর প্রমাণ বহন করে। তাহলো ঃ ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবন আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি !

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموت والأرض بخمسين الف سنة قال وكان عرشه على الماء .

অর্থাৎ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই আল্লাহ সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।

আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কলম দ্বারা মাকাদীর লিপিবদ্ধ করাই হলো, এ তাকদীর।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, এ কাজটি আরশ সৃষ্টির পরে হয়েছে। এতে আল্লাহ যে কলম দ্বারা মাকাদীর লিপিবদ্ধ করেছেন, আরশ তার আগে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় যা জমহূর-এর অভিমত। আর যে হাদীসে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, কলম এ জগতের সৃষ্টিসমূহের প্রথম। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে ইমাম বুখারীর (র) বর্ণিত হাদীসটি এ মতের পরিপূরক। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেনঃ ইয়ামানের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল, দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং এ সৃষ্টি জগতের সূচনা সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার কাছে এসেছি। জবাবে তিনি বললেন ঃ

كان الله ولم يكن شئ قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ وخلق السموت والأرض.

অর্থাৎ— আল্লাহ ছিলেন, তাঁর আগে কিছুই ছিল না এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। স্মরকলিপিতে তিনি সবকিছু লিপিবদ্ধ করে পরে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

এক বর্ণনায় قبله (তার আগে)-এর স্থলে معه (তাঁর সাথে) এসেছে। আর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ আর অন্য বর্ণনায় وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ এর স্থলে আছে ঃ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

মোটকথা, তাঁরা নবী করীম (সা)-কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। আর এ জন্য তারা বলেছিল, আপনাকে এ সৃষ্টি জগতের প্রথমটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমরা আপনার নিকট এসেছি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক ততটুকুই জবাব দেন যতটুকু তারা জানতে চেয়েছিল। এ কারণেই তিনি তাদেরকে আরশ সৃষ্টির সংবাদ দেননি, যেমন পূর্ববর্তী আবূ রাযীনের হাদীসে দিয়েছেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আর অন্যদের মতে আল্লাহ তা'আলা আরশের আগে পানি সৃষ্টি করেছেন।

সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালিহ (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, মুররা সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে এবং আরো কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন ঃ আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল আর পানির আগে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি।

ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তাহলো-আলো ও অন্ধকার। তারপর দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে তিনি অন্ধকারকে কালো আঁধার রাতে এবং আলোকে উজ্জ্বল দিবসে পরিণত করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন যে, কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক কলমের পর যা সৃষ্টি করেছেন তাহলো কুরসী। তারপর কুরসীর পরে তিনি 'আরশ' সৃষ্টি করেন। তারপর মহাশূন্য ও আঁধার এবং তারপর পানি সৃষ্টি করে তার উপর নিজের আরশ স্থাপন করেন। বাকি আল্লাহ্ তা'আলা ভালো জানেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবী উবাদাহ বিন সামেতের ছেলে ওয়ালীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মৃত্যুর সময় আপনার আব্বার অসিয়ত কী ছিল?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমাকে আমার আব্বা ডেকে বললেন, বেটা! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখো, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ভয় রাখতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতি এবং তকদীরের ভালো-মন্দ সব কিছুর প্রতি ঈমান এনেছ। এ ঈমান ছাড়া মারা গেলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি যে, ‘‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, ‘লিখো’। কলম বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব?’ তিনি বললেন, ‘তকদীর এবং অনন্তকাল ধরে যা ঘটবে তা লিখো।’ (আহমাদ ২৩০৮১, তিরমিযী ২১৫৫, ৩৩১৯নং)

রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ১১৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com

সৃষ্টির প্রথমে কি ছিল এরূপ ভাবতে থাকলে শয়তান অনেকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন তৈরি করে, যেমনঃ "আল্লাহর পূর্বে কি ছিল"।

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ)তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ ".

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ লোকেরা একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকবে যে, এ আল্লাহ সব কিছুরই স্রষ্টা, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল?[মুসলিম ১/৬০, হাঃ ১৩৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৯৮)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭২৯৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ " .

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)

রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টিজগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে যেন বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি'। [৪৭] (ই.ফা. ২৪৩; ই.সে. ২৫১)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৪১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)

একদা রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ হে আবূ হুরায়রা! মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমন কি এ প্রশ্নও করবে, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, পরবর্তীকালে একদিন আমি মাসজিদে (নাবাবীতে) উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে কতিপয় বেদুঈন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, হে আবূ হুরায়রা! এ তো আল্লাহ তা'আলা। তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রাঃ) হাতে কিছু কংকর নিয়ে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, আমার বন্ধু (রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) সত্য কথাই বলে গেছেন। (ই.ফা. ২৪৮; ই.সে. ২৫৭)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৪৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ " .

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আপনার উম্মাত সর্বদা এটা কে সৃষ্টি করল। এ ধরনের প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি এ প্রশ্নও করবে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? (ই.ফা. ২৫০; ই.সে. ২৫৯)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৪৮
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
Source: ihadis.com

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتّى يُقَالَ هذَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا قَالُوا ذلِكَ فَقُولُوا اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِه ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ فِيْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ شَآءَ اللّهُ تَعَالى

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মানুষেরা তো (প্রথম সৃষ্টি জগত ইত্যাদি সম্পর্কে) পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করতে থাকবে, এমনটি সর্বশেষে এ প্রশ্নও করবে, সমস্ত মাখলূক্বাতকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন তোমরা বলবে : আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর কেউ তাকে জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। অতঃপর (শাইত্বনের উদ্দেশে) তিনবার নিজের বাম দিকে থু থু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাবে। [১]

(মিশকাতের লেখক বলেন) ‘উমার ইবনু আহ্‌ওয়াস-এর হাদীস ‘খুতবাতু ইয়াওমিন্ নাহ্‌র’ অধ্যায়ে বর্ণনা করবে ইন্‌শাআল্লাহ তা’আলা।

মিশকাতুল মাসাবিহ্, হাদিস নং ৭৫
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মাখলুকের জন্য। তিনি জীবন মৃত্যুর ধারনারও সৃষ্টিকর্তা। তিনি নিজে জন্ম মৃত্যু থেকে পবিত্র। তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি। এসব তার মাখলুকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ এসব ধারনা থেকেও পবিত্র।
আল্লাহ বলেনঃ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়(সূরা মুলক-০২)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি [সূরা ইখলাস ৩]

সুতরাং এরূপ প্রশ্ন একদমই অবান্তর। অনেক যিন্দিক এরূপ প্রশ্নও করে 'সব কিছুর শুরু থাকে আল্লাহর পূর্বে কি ছিল? '। এই প্রশ্নটিতে 'পূর্বে' বা 'আগে' শব্দটি সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار . متفق عليه
আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা’আলা বলেন, আদাম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তারা যুগ বা কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই দাহ'র অর্থাৎ যুগ বা কাল। আমার হাতেই (কালের পরিবর্তনের) ক্ষমতা। দিন-রাত্রির পরিবর্তন আমিই করে থাকি। [১]

ফুটনোটঃ
[১] সহীহ : বুখারী ৪৮২৬, মুসলিম ২২৪৬, আবূ দাঊদ ৫২৭৪, আহমাদ ৭২৪৫, সহীহাহ্ ৫৩১, সহীহ আল জামি‘ ৪৩৪৩।
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

এই হাদিসের মানে এই নয় যে, আল্লাহই সময়। বরং
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সময়ের সৃষ্টিকর্তা। তার হাতেই এর নিয়ন্ত্রন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনের বহু আয়াতে তার সৃষ্ট মাখলুকের শপথ করেছেন। কিন্তু মাখলুকের জন্য আল্লাহ ব্যতিত কারো নামে শপথ শিরক। আল্লাহ বলেনঃ
وَالْعَصْرِ
কসম যুগের (সময়ের),[আসর-১]

অতএব, সময়ের নিয়ন্ত্রন ও সৃষ্টি আল্লাহরই। আল্লাহ সময়ের যেকোন সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। যেখানে আল্লাহই সময়ের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক সেখানে আল্লাহর সত্ত্বার ব্যাপারে সময়কেন্দ্রিক প্রশ্ন নিতান্তই মূর্খলোকের কাজ ছাড়া কিছু নয়। এজন্য কাফির, যিন্দিক, মুশরিকরা মূলত নির্বোধ, যদিও তারা নিজেদের মহাজ্ঞানী মনে করে।
আল্লাহ বলেনঃ

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ 13

নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা’আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।[সূরা হাশর ১৩]

দেখুনঃ

https://islamqa.info/en/answers/9571/what-is-the-meaning-of-the-hadeeth-do-not-inveigh-against-time-waqt-for-allaah-is-time-waqt

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অস্তিত্বের ব্যাপারে পাঠের সময় শয়তান অনেকের মনে আল্লাহর

আকৃতি কিরূপ এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মানুষ তার সীমাবদ্ধ চিন্তাচেতনার দ্বারা আল্লাহকে কল্পনা করতে চেষ্টা করে। আর মানুষের কল্পনার সীমাবদ্ধতায় আল্লাহকে ফেলা অনেক বড় রকমের গোমরাহি। এ নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিতর্ক আছে, আল্লাহর সাকার বা নৈরাকার নিয়ে। চরম জাহেরী ও বাতেনিপন্থী দুই দল আল্লাহর আকার এবং নিরাকার কট্টরভাবে সাব্যস্ত করে। যেমনটা মুশাব্বিহা,সুফিদের মধ্যে দেখা যায়। আল্লাহর হাত,চক্ষু, পায়ের ব্যপারে অনেক গুলো আয়াতে এসেছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা হচ্ছে সেসবকে শুধুই পড়ে যাওয়া। সাহাবিদের(রাঃ) কেউই এসবের কোন রূপ জাহেরি বা বাতেনি ব্যাখ্যা করেননি। কোনরূপ মনগড়া ব্যাখ্যা করাই বিদআত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা হাত,চক্ষু,পা প্রভৃতির ব্যপারে যা বলেছেন তাতে আমরা বিশ্বাস করি, এবং এর সাথে কোন কিছুর সাদৃশ্যতা যোগ করিনা। আল্লাহ, মানুষের যেকোন ধরনের কাল্পনিক সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্র। আল্লাহর সাদৃশ্য সৃষ্টির কোন কিছুই নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ
এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।
(ইখলাস-০৪)

কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন(শূরা ১১)

‘সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সাদৃশ্য স্থির করো না’ (নাহল ১৬/৭৪)

আল্লাহর সত্ত্বাগত বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তা গবেষণা নিষিদ্ধ। এটা শয়তানকে বিভ্রান্ত করতে সুযোগ দেয়।

Ibn Abbas reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, *“Reflect deeply upon the creation, but do not reflect upon the essence of the Creator. Verily, his essence cannot be known other than to believe in it.”*

Source: Musnad al-Rabī’ 742

"একদা নবী কারীম (সা.) সাহাবাদের চুপচাপ বসে থাকা একটি দলের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছ? তারা বললেন, আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা কর; কিন্তু তার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করো না। যেহেতু তিনি ধারণার অতীত[তাফসীর ইবনে কাসির]।"
নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের বাহ্যিক ও কাল্পনিক সকল দৃষ্টির উর্ধ্বে। সকল প্রকার কল্পনা থেকে পবিত্র। আল্লাহ বলেনঃ

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ(আনআম ১০৩)

আজ কাফিররা অনেক রকম কাল্পনিক ফিলসফি তৈরি করে নিয়েছে। সেখানে তারা আল্লাহর ব্যপারে বিচিত্র কথা বলে। এমনকি বিশ্বজগতকেও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে, এমনকি প্রকৃতিকেও সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে(ন্যাচারালিজম/প্যান্থেইজম/ননডুয়ালিজম)।ব্যবিলনিয়ান শয়তানি প্রকৃতি পূজার শিরকি যে আকিদা(monism/gnostic non Dualism/pantheism) ইবনে আরাবি, মানসুর হাল্লাজ প্রমুখ ইসলামের মধ্যে সঞ্চালিত করেছে, এবং সুফি/পীরদের মাঝে (ওয়াহদাতুল উজুদ,হুলুল ওয়াল ইত্তেহাদ- ইউনিটি অব এক্সিস্টেন্স/ননডুয়ালিজম বা মনিজম বা প্যান্থেইজম) এখনো মওজুদ আছে, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সালাফের মধ্যে এ আকিদা ছিল না। বরং, এ আকিদার গোড়া তালাশ করলে বাবেল শহর ও এর আশপাশের মালাউন যাদুকর এবং শয়তানদের মিলবে। এটা তো সেই শয়তানের গড়া বিকল্প মেটাফিজিক্স, যা সম্পূর্নভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের শিক্ষার বিপরীত। এসব কুফরি আকিদাধারীরা আল্লাহর ব্যপারে মনগড়া যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।
আল্লাহ বলেনঃ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা' আলা তা থেকে পবিত্র[হাশরঃ২৩]

সেই সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ যতকিছুর খরচ করেছেন,এতে তার ভান্ডার থেকে কোন কিছুই কমে নি।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَدُ اللَّهِ مَلأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ـ وَقَالَ ـ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ـ وَقَالَ ـ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ".

আবু হুরায়রাহ (রাঃ)
আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র হাত পূর্ণ, রাতদিন খরচ করলেও তাতে কমতি আসে না। তিনি আরো বলেছেনঃ তোমরা কি দেখেছ? আসমান যমীন সৃষ্টি করার পর থেকে তিনি যে কত খরচ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর হাতে যা আছে, তাতে এতটুকু কমেনি। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। তাঁর অন্য হাতে আছে দাঁড়িপাল্লা, যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯০৭)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭৪১১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আরশ-কুরসি-লাওহে মাহফূজঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، - قَالَ أَحْمَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسْخَتِهِ وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُهِدَتِ الأَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ " وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ " وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا " . وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ " وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ

" . قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ " إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ
عَبْدُ الأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الصَّحِيحُ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ
مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا وَكَانَ سَمَاعُ عَبْدِ
الأَعْلَى وَابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَّارٍ مِنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا بَلَغَنِي.

*জুবাইর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনু মুত্বঈম তার পিতা হতে তার দাদা সূত্র তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! লোকজন খুবই কষ্ট করছে, পরিবার-পরিজন, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধন-সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে এবং জীবজন্তু মরে যাচ্ছে। সুতরাং, আপনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কেননা, আমরা আপনার সুপারিশ নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট যাই এবং আল্লাহ্‌র সুপারিশ নিয়ে আপনার নিকট আসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জানো! তুমি কি বলছো? অতঃপর তিনি তাসবীহ পড়তে থাকলেন, এমনকি তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এর (অসন্তুষ্টির) চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। তিনি আবার বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়! আল্লাহ্‌র সুপারিশ নিয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির নিকট যাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধে, অনেক মহান। তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি কি জানো আল্লাহ কে? তাঁর আরশ আসমানের উপর এভাবে আছে। তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, তাঁর উপর রয়েছে **গম্বুজ সদৃশ ছাঁদ**। তা সত্ত্বেও তা (আরশ) তাঁকে নিয়ে গোঙ্গানীর মত শব্দ করে, যেমনটি করে আরোহীর কারণে জিনপোষ। ইবনু বাশশার তার হাদীসে বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে এবং তার আরশ আসমানসমূহের উপরে। অতঃপর হাদীসটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। [৪৭২৫]*

দূর্বলঃ মিশকাত হা/৫৭২৭।
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭২৬
হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ

অর্থাৎ— 'তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর্‌শের অধিপতি।' (৪০ ঃ ১৫)

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

অর্থাৎ— মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সম্মানিত আর্‌শের তিনি অধিপতি। (২৩ ঃ ১১৬)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ— তুমি জিজ্ঞেস কর, কে সাত আকাশ এবং মহা আর্‌শের অধিপতি ? (২৩ ঃ ৮৬)

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ.

অর্থাৎ— 'তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, 'আর্‌শের অধিকারী ও সম্মানিত।' (৮৫ ঃ ১৪,১৫)

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰي.

অর্থাৎ— 'দয়াময়, 'আরশে সমাসীন।' (২০ ঃ ৫)

ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَى الْعَرْشِ.

অর্থাৎ— তারপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন।' (১০ ঃ ২)

এসব সূরাসহ কুরআনের আরো বহুস্থানে এ আয়াতটি রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا.

অর্থাৎ— "যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। (৪০ ঃ ৭)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থাৎ— সে দিন আটজন ফেরেশ্‌তা তাদের প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করবে। (৬৯ ঃ ১৭)

وَتَرَى الْمَلَٰئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ— 'এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আর্শের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে, প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। (৩৯ : ৭৫)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বিপদকালীন দু'আয় আছে ঃ

لا إله الا الله العظيم الحليم – لا اله الا الله رب العرش الكريم – لا اله الا الله رب السموت ورب الأرض رب العرش الكريم .

অর্থাৎ— আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি মহান পরম সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি আকাশ মণ্ডলীর অধিপতি ও পৃথিবীর অধিপতি। যিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

اذا سالتم الله الجنة فسئلوه الفردوس فإنه اعلى الجنة واوسطها الجنة وفوقه عرش الرحمن.

অর্থাৎ—যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কারণ তা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। আর তার উপরে হলো দয়াময়ের আরশ। فوقه শব্দটি ظرف হিসেবে ফাত্হা দ্বারাও পড়া হয় এবং যাম্মা দ্বারাও পড়া হয়। আমাদের শায়খ হাফিজ আল মুযী বলেন, যাম্মা দ্বারা পড়াই উত্তম। তখন فوقه عرش الرحمن এর অর্থ হবে أعلاها عرش الرحمن অর্থাৎ—তার উপরটা হলো রাহমানের' আর্শ'। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ফিরদাউসবাসীগণ আরশের শব্দ শুনে থাকে। আর তাহলো তাঁর তাসবীহ ও তাজীম। তাঁরা আরশের নিকটবর্তী বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ.

অর্থাৎ—'সাদ ইব্ন মুআযের মৃত্যুতে রাহমানের আরশ কেঁপে উঠে।'

হাফিজ ইব্ন হাফিজ মুহাম্মদ ইব্ন উছমান ইব্ন আবু শায়বা 'সিকতুল আরশ' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, "আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা তৈরি। তাঁর প্রান্তদ্বয়ের দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।'

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) উমায়্যা ইবন আবুস-সাল্ত-এর কবিতার নিম্নোক্ত দু'টো পংক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। উমায়্যা যথার্থ বলেছে। পংক্তি দু'টি হলো ঃ

رجل وثور تحت رجل يمينه - والنسر للأخري وليث مرصد .

অর্থাৎ—তাঁর (আরশের) ডান পায়ের নিচে আছে একজন লোক ও একটি ষাঁড়। আর অপর পায়ের নিচে আছে একটি শকুন ও ওঁৎ পেতে থাকা একটি সিংহ।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সে যথার্থই বলেছে। তারপর উমায়্যা বলল ঃ

والشمس تطلع كل أخر ليلة - حمراء مطلع لونها متورد

تأبى فلا تبد ولنا في رسلها - الا معذبة والا تجلد

অর্থাৎ—প্রতি রাতের শেষে লাল হয়ে সূর্য উদিত হয় যার উদয়াচলের রঙ হলো গোলাপী। আমাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে সূর্য ইতস্তত করে থাকে। অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে শাস্তিদানকারী রূপে এবং কশাঘাতকারী রূপে।

শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে যথার্থই বলেছে। এ হাদীসের সনদ সহীহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আরশ বহনকারীদের বর্তমান সংখ্যা চারজন। অতএব, পূর্বোক্ত হাদীসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের এ চারজনের উল্লেখের দ্বারা বাকি চারজনের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি বুঝায় না। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

'আরশ সম্পর্কে উমায়্যা ইবনুস সাল্ত-এর আরো কয়েকটি পংক্তি আছে। তাহলো ঃ

مجد والله فهوللمجد أهل - ربنا فى السماء امسى كبيرا

بالبناءالعالى الذى بهرالنا - س وسوي فوق السماء سريرا

شرجعا لايناله بصر العير - ن نرى حوله الملائك صورا

অর্থাৎ—তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। তিনি মহিমময়, আমাদের প্রতিপালক আকাশে, তিনি মহীয়ান গরীয়ান। সে এমন এক সুউচ্চ ছাদ যা মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দেয়। আর আকাশের উপরে তিনি স্থাপন করে রেখেছেন এমন সুউচ্চ এক সিংহাসন, চর্ম চক্ষু যার নাগাল পায় না আর তার আশে-পাশে তুমি দেখতে পাবে ঘাড় উঁচিয়ে রাখা ফেরেশতাগণ।

একদল কালাম শাস্ত্রবিদের মতে, আরশ হচ্ছে গোলাকার একটি আকাশ বিশেষ যা গোটা জগতকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ কারণেই তাঁরা একে নবম আকাশ, 'আল ফালাকুল আতলাস ওয়াল আসীর' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ কথাটি যথার্থ নয়। কারণ, শরীয়তে একথা প্রমাণিত যে, 'আরশের কয়েকটি স্তম্ভ আছে এবং ফেরেশতাগণ তা বহন করে থাকেন। কিন্তু আকাশের স্তম্ভও হয় না এবং তা বহনও করা হয় না। তাছাড়া আরশের অবস্থান জান্নাতের উপরে আর জান্নাত হলো আকাশের উপরে এবং তাতে একশটি স্তর আছে, প্রতি দু'স্তরের মাঝে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার সমান দূরত্ব। এতে প্রমাণিত হয় যে, আরশ ও কুরসীর মাঝের দূরত্ব আর এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব এক কথা নয়। আরেকটি যুক্তি হলো, অভিধানে আরশ অর্থ রাজ সিংহাসন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ" অর্থাৎ তার আছে বিরাট এক সিংহাসন। (২৭ ঃ ২৩)

বলা বাহুল্য যে, এ আয়াতে যে আরশের কথা বলা হয়েছে তা কোন আকাশ ছিল না এবং আরশ বলতে আরবরা তা বুঝেও না। অথচ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবী ভাষায়। মোটকথা, আরশ কয়েকটি স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি সিংহাসন বিশেষ যা ফেরেশতাগণ বহন করে থাকেন। তা বিশ্বজগতের উপরে অবস্থিত গুম্বজের ন্যায় আর তাহলো সৃষ্টি জগতের ছাদস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

অর্থাৎ—যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৪০ ঃ ৭)

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, তারা হলেন আটজন এবং তাদের পিঠের উপর রয়েছে আরশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ."

অর্থাৎ—এবং সে দিন আটজন ফেরেশতা তাঁদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধে। (৬৯ ঃ ১৭)

কালাম শাস্ত্র হচ্ছে ওই সমস্ত গ্রেসিয়ান-ব্যবিলনিয়ান শয়তানি দর্শন এবং আকিদা যার শাখা প্রশাখা আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আরবে প্রবিষ্ট গ্রীক দর্শন তথা কালাম শাস্ত্রের ব্যপারে ইবনে কাসির(রহঃ) এর দৃষ্টিভঙ্গি দেখেছেন? তিনি ওদের কাল্পনিক দর্শনকেন্দ্রিক আসমানজমিনের বর্ননা গ্রহন তো করেনই নি বরং কুরআন সুন্নাহর দলিল দ্বারা শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। আজকের আলিমদের সাথে পূর্ববর্তী এসকল আলিমদের পার্থক্যটা এখানেই। আজকের দিনে কাফির মুশরিকদের

কাল্পনিক দর্শনকেন্দ্রিক তত্ত্বকে আলিমরা ওয়াজ-বায়ানে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহন করতেও ছাড়ে না। অথচ সত্যিকারের জ্ঞানী আলিমরা এসবকে শরীয়াতের দলিল দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। এই কালাম শাস্ত্র হচ্ছে সেসমস্ত শয়তানের আকিদার উৎস যা মু'তাযিলাদের যুক্তিচর্চায় জ্বালানি হিসেবে কাজ করত। অনেক লোক মুর্তাদ হয়ে গেছে।

। আবূ দাউদ (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملئكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه ألى عاتقه مسيرة سبعماة عام.

অর্থাৎ—"আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী আল্লাহর ফেরেশতাদের একজনের বিবরণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি ও কাঁধের মাঝে সাতশ বছরের পথ।"

ইব্‌ন আবূ আসিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর পাঠ হলো ঃ

محقق الطير مسيرة سبعمائة عام.

কুরসী

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বলতেন, কুরসী আর 'আরশ একই কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়, হাসান এমন কথা বলেননি। বরং সঠিক কথা হলো, হাসান (র) সহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত হলো এই যে, কুরসী আর 'আরশ দুটি আলাদা।

পক্ষান্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সম্পর্কে বর্ণিত যে, তাঁরা وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন كُرْسِيُّهُ অর্থ عِلْمُهُ অর্থাৎ আল্লাহর ইলম কিন্তু ইবন আব্বাস (রা)-এর প্রকৃত অভিমত হলো এই যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর কুদরতী কদমদ্বয়ের স্থল এবং আরশের সঠিক পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত কারো জ্ঞাত নেই।

এ বর্ণনাটি হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তাঁরা তা বর্ণনা করেন নি।

আবার শুমা ইবন মুখাল্লাদ ও ইবন জারীর তাঁদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়ত করেন যে, কুরসী হলো আরশের নিচে। সুদ্দীর নিজস্ব অভিমত হলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কুরসীর পেটের মধ্যে আর কুরসীর অবস্থান আরশের সম্মুখে।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম যাহ্‌হাক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি পাশাপাশি বিছিয়ে একটির সঙ্গে অপরটি জুড়ে দেয়া হয়; তাহলে কুরসীর তুলনায় তা বিশাল প্রান্তরের মধ্যে একটি আংটি তুল্য। ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ما السموت السبع فى الكرسي إلا كدراهم سبعة القيت فى ترس.

অর্থাৎ—কুরসীর মধ্যে সাত আকাশ ঠিক একটি থালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি মুদ্রা তুল্য।

যায়দ বলেন, আবূ যর (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من جديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الأرض.

অর্থাৎ—'আরশের মধ্যে কুরসী ধূ ধূ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত লোহার আংটির চাইতে বেশি কিছু নয়।' হাকিম আবু বকর ইবন মারদূয়েহ্ (র) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর গিফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

والذى نفسى بيده ما السموت السبع والأرضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل كفلاة على تلك الحلقة -

অর্থাৎ— "যার হাতে আমার জীবন সে সত্তার শপথ! কুরসীর নিকট সাত আকাশ ও সাত যমীন বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত কড়া অপেক্ষা বেশি কিছু নয়। আর কুরসীর তুলনায় আরশ প্রান্তরের তুলনায় কড়ার মত।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে যথাক্রমে মিনহাল ইব্‌ন 'আমর' আমাশ সুফয়ান, ওকী ও ইব্‌ন ওকী সূত্রে ইব্‌ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ-এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পানি কিসের উপর ছিল ? জবাবে তিনি বললেন, বাতাসের পিঠের উপর। তিনি আরো বলেন, আসমান ও যমীনসমূহ এবং এ সবের মধ্যকার সমুদয় বস্তুকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে এবং সমুদ্ররাজিকে ঘিরে রেখেছে হায়কাল। আর কথিত বর্ণনা মতে, হায়কালকে ঘিরে রেখেছে কুরসী। ওহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন ওহ্‌ব হায়কাল-এর ব্যাখ্যায়

বলেন, হায়কাল আকাশমণ্ডলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ একটি বস্তু বিশেষ যা আসমানের প্রান্ত থেকে তাঁবুর লম্বা রশির ন্যায় যমীনসমূহ ও সমুদ্রসমূহকে ঘিরে রেখেছে।

১৬ শতক পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা আর আর এস্ট্রলজির(যেটাকে আল্লাহর রাসূল(সা) যাদুবিদ্যার শাখা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন) মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। জ্যোতিষীরাই মহাকাশবিজ্ঞানী হিসেবে ছিলেন। ১৯ শতকে এসে অল্প কিছু দিনের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রকে আলাদা করা হয়েছে, সবার মধ্যে এর শাখাপ্রশাখাকে প্রবেশ করানোর জন্য। এখন হাইপার ডাইমেনশনাল ফিজিক্স সেই পুরাতন যাদুশাস্ত্রকেই আবারো পুনরুজ্জীবিত করছে। মেইনস্ট্রিম ফিজিক্স থেকে ওই থিওরি গুলো খুব শীঘ্রই প্রকাশ পাবে যখন বলা হবে, তারকারাজি মানুষের কর্ম-ভাগ্যে প্রভাব ফেলে। অমুক তারকার অমুক স্থানে আসার জন্য এটা হয়। আজ ইতোমধ্যে পদার্থবিদগন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গুহ্যতত্ত্বানুসারে বলছেন, আমরা সবাই স্টার ডাস্ট,স্টার সিড...। ইবনে কাসির(রহঃ) তার যুগে কাফিরদের থেকে আসা জ্যোতিবিদ্যাকে গ্রহন করেননি। এমনকি ওদের নিজেদের মাঝেই তত্ত্বগত সাংঘর্ষিকতার কথা বলেছেন, যেমনটা আজও বিদ্যমান। আফসোস হচ্ছে আজকে উম্মাহ কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বকে দ্বীনের সাথে মেশাতে ব্যস্ত। সবকিছুকে ইসলামাইজ করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে। এরা শুধু ওইসমস্ত বিষয়গুলোকে গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানায় যা গ্রহন করলে এদের ভ্রষ্টতা আর শয়তানি সম্পূর্নরুপে প্রকাশ পেয়ে যাবে। যেমন বাবেল শহরের কবি গিলগেমিশের বিবর্তনবাদের আকিদা। তবে মর্ডানিস্ট মুসলিমদের অনেকে এটাকেও ইসলামাইজ করতে ছাড়ে নি। ইন্নালিল্লাহ। অথচ সত্য হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তা বলেননি যা আজ কাফিররা কল্পনা এবং শয়তানের সহযোগিতায় বলছে। আল্লাহ যা বলেছেন তা কুরআন সুন্নাহর দ্বারা আমাদেরকে জানানো হয়েছে যা মুশরিকদের কল্পনা এবং শয়তানের কথার সম্পূর্ন বিপরীত এবং সত্য।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কারো কারো ধারণা, কুরসী হলো অষ্টম আকাশ, যাকে স্থির গ্রহরাজির কক্ষ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ পূর্বেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরসী সাত আকাশ অপেক্ষা অনেক অনেকগুণ বড়। তাছাড়া একটু আগে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুরসীর তুলনায় আকাশ বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত একটি কড়ার ন্যায়। কিন্তু এক আকাশের তুলনায় আরেক আকাশ তো এরূপ নয়।

যদি এরপরও তাদের কেউ একথা বলে যে, আমরা তা স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ফালাক বা আসমান নামে অভিহিত করি। তাহলে আমরা বলব, অভিধানে কুরসী আর ফালাক-এর অর্থ এক নয়। বস্তুত প্রাচীন যুগের একাধিক আলিমের মতে, কুরসী আরশের সম্মুখে অবস্থিত তাতে আরোহণের সিঁড়ির মত একটি বস্তু বিশেষ। আর এরূপ বস্তু ফালাক হতে পারে না। তাদের আরো ধারণা যে, স্থির নক্ষত্রসমূহকে তাতেই স্থাপন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। উপরন্তু, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

লাওহে মাহ্ফূজ

ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه فى كل يوم ستون وثلثمأة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويعز ويذل ويفعل ما يشاء .

অর্থাৎ—"আল্লাহ্ শুভ্র মুক্তা দ্বারা লাওহে মাহফূজ সৃষ্টি করেছেন। তার পাতাগুলো লাল ইয়াকুতের তৈরি। আল্লাহ্ তা'আলার কলমও নূর এবং কিতাবও নূর। প্রতি দিন তাঁর তিনশ ষাটটি ক্ষণ আছে। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন। মৃত্যু দেন, জীবন দেন, সম্মানিত করেন, অপমানিত করেন এবং যা খুশী তা-ই করেন।

ইবন আব্বাস (রা) আরও বলেন, লাওহে মাহফূযের ঠিক মাঝখানে লিখিত আছে ঃ

لا اله الا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله .

অর্থাৎ—"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর মনোনীত দীন হলো ইসলাম এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহতে ঈমান আনবে, তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে স্বীকার করবে এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে; তাঁকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেন, লাওহে মাহফূজ শুভ্র মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি ফলক বিশেষ। তার দৈর্ঘ আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আর তার প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানের দূরত্বের সমান। তার পরিবেষ্টনকারী হলো মুক্তা ও ইয়াকুত এবং প্রান্তদেশ হলো লাল ইয়াকুতের। তার কলম হলো নূর এবং তার বাণী আরশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ও তার গোড়া হলো এক ফেরেশতার কোলে।

আনাস ইব্ন মালিক প্রমুখ বলেন, লাওহে মাহফূজ ইসরাফীল (আ)-এর ললাটে অবস্থিত। মুকাতিল বলেন, তার অবস্থান আরশের ডান পার্শ্বে।

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে মিথ্যাচারীতা,অপব্যাখ্যা এবং কাফিরদের আকিদাগুলোকে ইসলামাইজড করার মত জঘন্য কাজগুলো দেখে এবং অধিকাংশ লোকের নিশ্চুপ ভূমিকা দেখে শরী'আর দলিলকেন্দ্রিক কম্পাইল্ড আর্টিকেল সিরিজ প্রকাশ করা শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ এতে করে কুরআন সুন্নাহ থেকে আসা সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ননা প্রকাশের মাধ্যমে ঐ বিভ্রান্তি এবং অস্পষ্টতা দূর হবে, যে সত্য মিথ্যার অস্পষ্টতা এবং বিভ্রান্তি প্রাচীন ও এ যুগের মুরজিয়া-

মু'তাযিলারা তৈরি করেছে। খুব শীঘ্রই শয়তানী অসত্য সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে আকিদাগুলো স্পষ্ট হবে। এবং কুরআন সুন্নাহর দলিলের দ্বারা উৎপাটিত হবে। বিইযনিল্লাহ।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

পর্ব-২

মুসলিম উম্মাহ আজ সৃষ্টির সূচনাকে কিভাবে বিশ্বাস করে?! তারা কাফির মুশরিকদের শেখানো কাল্পনিক শয়তানি তত্ত্ব-বিগব্যাং কে গ্রহন করে নিয়েছে। অবস্থাটা এরূপ দাড়িয়েছে যে, বিগব্যাং এর বিকল্প হিসেবে তারা আজ অন্য কিছুকে চিন্তা করতে পারে না। অথচ বিগব্যাং তত্ত্বটির আনুষ্ঠানিক প্রবক্তা একজন ক্যাথলিক পাদ্রী(লেমাইত্রে)।আপনাদেরকে পূর্বে দেখিয়েছি ক্যাথলিকরা কিরূপ রোমান পৌত্তলিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন । যাহোক, বিগব্যাং এর গোড়া খুজলে বের দেখা যায় এর মূল উৎস হচ্ছে কাব্বালিস্টিক স্যাটানিক টেক্সট। বিভিন্ন অকাল্ট কমিউনিটিতে এই তত্ত্বটিকে(বিগব্যাং) তাদের প্রাচীন(শয়তানি) জ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। বৈদিক দর্শন এবং পিথাগোরিয়ান কুফরি দর্শন গুলোকে যৌক্তিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিগব্যাং অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তি। ওদের কুফরি দর্শনের পূর্নতা দানের জন্য বিগব্যাং এর পাশাপাশি বিগক্রাঞ্চও আছে। অর্থাৎ একসময় সম্প্রসারনশীল মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে আসা শুরু করবে। এবং একপর্যায়ে আবারো সেই এক বিন্দুতে চলে আসবে। শেষ যুগের অভিশপ্ত কাফিরদের শয়তানি আকিদাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সাইক্লিক্যাল অসোটেলিং ইউনিভার্স থিওরিসহ বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। আমি কুফরি দর্শনগুলো বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকছি। এগুলো নিয়ে "The occult origins of mainstream physics and astronomy" ডকুমেন্টারি আর্টিকেল সিরিজে বিস্তারিত নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ।

আজকে এই বিগব্যাং থিওরিকে অধিকাংশ মুসলিমরা গ্রহন করেছে। অগনিত আলিম এতে বিশ্বাস রাখে। তারা এই শয়তানি তত্ত্বটিকে যথাসম্ভব ইসলামাইজ করে নিয়েছে। আলিম, দাঈরা গর্বের

সাথে এই কথাও বলছে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বিগব্যাং এর কথা কুরআনেই বলে দিয়েছেন! দলিল দিচ্ছে সূরা আয যারিয়াতের ৪৭ নং আয়াত এবং ২১ঃ৩০। মা'আযাল্লাহ!! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কি এই বিগব্যাং এর দ্বারাই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন?! বিগব্যাং কস্মিক প্লুরালিজম, স্পেস বা মহাশূন্য,কোটি কোটি গোলাকৃতির গ্রহ, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ, ছায়াপথ,নীহারিকার কাল্পনিক অস্তিত্বকে যৌক্তিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহর বলা সৃষ্টিতত্ত্বটি কি এইরূপ যেটা কাব্বালিস্টিক মেইনস্ট্রিম মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে বলা হচ্ছে?নাকি দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারনা!? এ নিয়েই আজকের পর্ব।

বস্তুত, উভয় বর্ননা সম্পূর্ন ভিন্ন এবং এইরূপ ভিন্নতা যে, যেন তা পরস্পর দুমেরুর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ছয়দিনে সাত আসমান ও সাত জমিনকে স্তরে স্তরে নির্মান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা একদমই তা বলেন নি যা আজকের সায়েন্স নামের অপবিজ্ঞান বলছে। আল্লাহর সৃষ্ট আসমান বিগব্যাং এর ফলে হওয়া ইনফিনিট শূন্য(কথিত স্পেস) নয় বরং একটির উপর আরেকটি সাতটি গম্বুজাকৃতির সলিড স্তর, আদৌ অদৃশ্য বা অস্পৃশ্য নয়। আর জমিন বা পৃথিবী আদৌ মহাশূন্যে ছুটন্ত গোলক নয় বরং জমিন তথা পৃথিবী হচ্ছে একটির উপর আরেকটি(মোট ৭টি) সমতল দ্বীপ সদৃশ জমিন। আমাদের অবস্থান প্রথম জমিনে যার উপর সাতটি মজবুত আসমানের স্তর রয়েছে। আর আমাদের পায়ের নিচের দিকে আরো ছয়টি সমতল (পৃথিব ী)জমিন সদৃশ স্তর বিদ্যমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সর্বপ্রথম পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন এরপর সাত আসমান(বিগব্যাং থিওরির বিপরীত)। এটাই কুরআন সুন্নাহ, সাহাবীদের(রাঃ) শিক্ষা। এবং সুনিশ্চিতভাবে এটা আজকের দাজ্জালের অনুসারী বিজ্ঞানী তথা ন্যাচারাল ফিলসফারদের বিপরীত তত্ত্ব। অথচ আজ এই সম্পূর্ন বিপরীত মেরুর অপবিদ্যাকে ইসলামাইজ করে সবার সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত আকিদায় প্রবেশ করানো হয়েছে। কাফিররা চায়, দুনিয়ার সমস্ত লোকেরা ওদের ন্যায় কুফরি আকিদা গ্রহন করুক,সেটা যেভাবেই হোক। এই বিষয়গুলো প্রকাশ করার জন্য আজ অধিকাংশ মুসলিমই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। সুবহানআল্লাহ!

৬ দিনে সৃষ্টি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ৬ দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেন।
আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক (আরাফঃ৫৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও যমীনকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যার বর্ণনা কোরআন কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। ঐ ছয়দিন হচ্ছে রবিবার সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবারেই সমস্ত মাখলূক একত্রিত হয়। ঐ দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলো এই দিনের মতই ছিল কি এক হাজার বছর বিশিষ্ট দিনগুলো ছিল এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ধারণা মতে দিনগুলো ছিল হাজার বছর বিশিষ্ট দিন। এখন থাকলো শনিবার। ঐদিনে কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। ঐদিন সৃষ্টিকার্য বন্ধ ছিল। একারণেই ঐ সপ্তম দিন অর্থাৎ শনিবারের দিনকে يَوْمُ السَّبْتِ। বলা হয়। আর سَبْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা' বা কর্তন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে রয়েছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা শনিবারে সৃষ্টি করেন যমীন, রবিবারে সৃষ্টি করেন পাহাড়-পর্বত, সোমবারে সৃষ্টি করেন বৃক্ষরাজী, মন্দ ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলো সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে, বুধবারে সৃষ্টি করেন আলো,

সমস্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারের শেষভাগে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।" এ হাদীস দ্বারা সপ্তম দিনেও ব্যস্ত থাকা সাব্যস্ত হচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, ব্যস্ততার দিনের সংখ্যা ছিল ছয়। এজন্যে বুখারী (রঃ) প্রমুখ মনীষী এ হাদীসের সঠিকতার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্ভবতঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) এটা কা'ব আহবার থেকে শুনেই বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

এই ছয়দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হন। এ স্থানে লোকেরা বহু মতামত পেশ করেছেন এবং বহু জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ এখানে নেই। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী গুরুজনদের মাযহাব অবলম্বন করেছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক (রঃ), আওযায়ী (রঃ)-সাওরী (রঃ), লায়েস ইবনে সা'দ (রঃ), শাফিঈ (রঃ), আহমাদ (রঃ) ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রঃ) ইত্যাদি এবং নবীন ও প্রবীণ মুসলিম ইমামগণ। আর ঐ মাযহাব হচ্ছে এই যে, কোন অবস্থা ও সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই ওটার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কোন জল্পনা-কল্পনা করাও চলবে না যার দ্বারা সাদৃশ্যের আকীদা মস্তিষ্কে এসে যায় এবং এটা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী হতে বহু দূরে। মোটকথা, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ওটাকে কোন খেয়াল ও সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে এবং কোন -চুল চেরা করা চলবে না। কেননা, আল্লাহ পাক কোন বস্তুর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত নন। তিনি হচ্ছেন শ্রোতা ও দ্রষ্টা। যেমন মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এঁদের মধ্যে নাঈম ইবনে হাম্মাদ আল খুযায়ীও (রঃ) রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারীর (রঃ) উস্তাদ। তিনি

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভুমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না?(সিজদাহ ৪)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাতটি ধারণ করে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যমীন, আসমান এবং এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিবসে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি মাটিকে শনিবার, পাহাড়কে ররিবার, গাছ-পালাকে সোমবারে, মন্দ জিনিসকে মঙ্গলবার, জ্যোতিকে বুধবার, জীবজন্তুকে বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদম (আঃ)-কে শুক্রবার আসরের পরে দিবসের শেষভাগে সৃষ্টি করেন। তাঁকে তিনি সারা দুনিয়ার মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। এতে লাল, কালো, সাদা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সব রকমের মাটি ছিল। এ কারণেই আদম সন্তান ভাল ও মন্দ হয়ে থাকে।"[১]

আল্লাহ তা'আলার আদেশ সপ্তম আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং সাত তবক যমীনের নীচে পর্যন্ত চলে যায়। যেমন অন্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীন। তাঁর হুকুম এগুলোর মাঝে অবতীর্ণ হয়।" (৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নিজ কাচারীর দিকে উঠিয়ে নেন যা দুনিয়ার আকাশের উপরে রয়েছে। যমীন হতে প্রথম আসমান পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধানে

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে মুআল্লাল বলে উল্লেখ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রয়েছে। ঐ পরিমাণই ওর ঘনত্ব। এতো দূরের ব্যবধান সত্ত্বেও ফেরেশতারা চোখের পলকে নীচে আসেন ও উপরে যান। এজন্যেই বলা হয়েছেঃ তোমাদের হিসেবে সহস্র বছরের সমান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ প্রতিদিন আমলগুলো অবগত হয়ে থাকেন। ছোট ও বড় সব আমল তাঁর কাছে আনীত হয়। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু নিজের অধীনস্থ করে রেখেছেন। সমস্ত বান্দার গ্রীবা তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকে। তিনি মুমিন বান্দাদের উপর বড়ই স্নেহশীল। তাদের উপর তিনি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

ছয়দিনে সৃষ্টির বিষয়টি শুধু কুরআনেই নয় তাওরাতেও ছিল। এখনো আছে, কিন্তু ওরা সামান্য পরিবর্তন করেছে। ওরা বলে আল্লাহ ছয়দিনের সৃষ্টির শেষে বিশ্রাম গ্রহন করেন! নাউজুবিল্লাহ!! এই কথা আল্লাহর রাসূল(সাঃ) সামনেও বলেছিল, যা শুনে তিনি প্রচন্ডভাবে রাগান্বিত হন। ওদের বানোয়াট মিথ্যাচারীতা খন্ডন করে নিচের আয়াতটিঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি (ক্বাফ ৩৮)

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আর ঐ দিনটি ছিল শনিবার। ঐ দিনের নামটিই তারা يَوْمُ السَّبْتِ রেখে তবে ছেড়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবনদান করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"(৪৬ ঃ ৩৩) আর যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক আয়াতে বলেনঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা বহুগুণে বড় (কঠিন)।" (৪০ঃ ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ـ

অর্থাৎ "তোমাদেরকেই কি সৃষ্টি করা কঠিন, না আকাশ, যা তিনি বানিয়েছেন?"(৭৯ ঃ ২৭)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। [হাদীদঃ০৪]

এ আয়াতের তাফসীরে জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা স্বীয় সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় তাঁদের উপর এক খণ্ড মেঘ দেখা দেয়। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এটা কি তা তোমরা জান কি?" তাঁরা জবাবে বললেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তিনি তখন বললেনঃ "এটাকে 'ইনাল; বলা হয়। এটা যমীনকে সায়রাব বা পানিসিক্ত করে থাকে। জনগণের উপর এটা বর্ষিত হয় যারা না আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না তাঁকে ডাকে।" আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের উপর এটা কি তা জান কি?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই বেশী অবহিত।" "এটা হলো উঁচু সুরক্ষিত ছাদ ও জড়িয়ে ধরা তরঙ্গ।" বললেন তিনি। এরপর তিনি বললেনঃ "তোমাদের এবং এর মধ্যে কতটা ব্যবধান আছে তা কি তোমরা জান?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী।" তিনি বললেনঃ "তোমাদের ও এর মধ্যে পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধান।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "এর উপরে কি আছে তা কি তোমরা জান?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) বেশী খবর রাখেন।" তিনি বললেনঃ "এর উপরে দ্বিতীয় আকাশ রয়েছে। আর এই দুই আকাশের মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো পাঁচশ' বছরের পথ।" অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাতটি আকাশের কথা বললেন এবং প্রত্যেকটির মাঝে এই পরিমাণ দূরত্বেরই বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "সপ্তম আকাশের উপর কি আছে তা কি তোমাদের জানা আছে?" সাহাবীগণ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বেশী অবগত।" তিনি বললেনঃ "সপ্তম আকাশের উপর এই পরিমাণ দূরত্বে আরশ রয়েছে অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের নীচে কি আছে তা কি তোমরা জান?" তাঁরা জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-ই সবচেয়ে ভাল জানেন।" তিনি বললেনঃ "তাহলো যমীন।" তারপর বললেনঃ "এর নীচে কি আছে তা কি জান?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী।" তিনি বললেনঃ "এর নীচে আর একটি যমীন

আছে। এই দুই যমীনের মধ্যেও পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধান।'' এই ভাবে তিনি সাতটি যমীনের কথা সমপরিমাণ দূরত্ব সহ বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ ''যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা যদি সর্বাপেক্ষা নিম্নতম যমীনে একটি রশি লটকিয়ে দাও তবে ওটাও আল্লাহ তা'আলারই নিকট পৌঁছবে।'' অতঃপর তিনি ...... هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।''[১]

কোন কোন আহলুল ইলম এই হাদীসের শরাহ্তে বলেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রশির আল্লাহ তা'আলারই ইলমে কুদরত পর্যন্ত পৌঁছা, তাঁর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ইল্ম ও তাঁর প্রভাব এবং তাঁর রাজত্ব নিঃসন্দেহে সব জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর জাত বা সত্তারূপে আরশের উপর রয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর এই বিশেষণ স্বীয় কিতাবের মধ্যে স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি রয়েছে এবং তাতে দুই যমীনের মাঝে দূরত্ব সাত শ' বছরের পথ বলে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিম এবং মুসনাদে বাযযারেও এ হাদীসটি আছে, কিন্তু মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রশি লটকিয়ে দেয়ার বাক্যটি নেই এবং প্রত্যেক দুই যমীনের মাঝের দূরত্ব তাতেও পাঁচশ বছরের পথের কথা রয়েছে। ইমাম বায্যার (রঃ) বলেন যে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ছাড়া আর কেউই এটা নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেননি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ ''আমাদের নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে।'' অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। সম্ভবতঃ এটাই সঠিক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটা গারীব, কেননা এর বর্ণনাকারী হাসানের তাঁর উস্তাদ হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে শোনা প্রমাণিত নয়। যেমন এটা আইয়ূব (রঃ), ইউনুস (রঃ), আলী ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসের উক্তি।

ছয়দিনে সৃষ্টির ব্যাপারে আরো দলিলঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পাবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না ? [ইউনুস ৩]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ
তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেরেরা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু!(হুদঃ৭)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا
তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃস্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর(ফুরকানঃ৫৯)

এই ছয়দিনের সৃষ্টির বর্ননা আদৌ 'বিগব্যাং থিওরি' নয় যেটা আজকের মডারেট মুসলিম থেকে শুরু করে প্রায় সবাই সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে। বরং এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ন ভিন্ন এবং বিগব্যাং তত্ত্বের বিপরীত। এই কথা আমরা বারবার বলছি। বিগব্যাং তত্ত্বানুযায়ী মহাবিস্ফোরণের দ্বারা ভ্যাকুয়াম মহাশূন্য(যেটাকে আকাশ বলা হয়) সৃষ্টি হয়, এই মহাকাশ সৃষ্টির বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর পর বিলিয়ন মিলিয়ন পৃথিবীর মত গোলাকৃতি পাথুরে বা গ্যাসের দলা ঠান্ডা হয়ে গ্রহ নামের কিছু জিনিসের সৃষ্টি হয়, এরকম কোটিকোটি গ্রহের একটি হচ্ছে পৃথিবী। এই অপোজিট অল্টারনেটিভ সৃষ্টিতত্ত্বে আসমান মানে অনন্ত শূন্যস্থান। সলিড কিছু নয়। অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুযায়ী মহাকাশ সর্বপ্রথম একাএকা সৃষ্টি হয় মহাবিস্ফোরণের দ্বারা এরপর বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পর কোটি কোটি সূর্যের মত তারকা এবং এর চারপাশে অস্থিরভাবে ঘুর্নায়মান গ্রহ,উপগ্রহ। সেই সোলার সিস্টেমও দৌড়াচ্ছে,ছায়াপথ হচ্ছে গ্রহনক্ষত্রকে ধারনকারী। সেটাও ছুটে চলছে।

অথচ কুরআনিক কস্মোজেনেসিস একদম ভিন্ন কিছু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সর্বপ্রথম

পৃথিবী সৃষ্টি করেন।এরপর পৃথিবীর পর আসমানকে ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। যেমনটা অট্টালিকার ভিত্তি প্রস্তুতের পরে ছাদ নির্মান করা হয়। আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।(বাকারাঃ২৯)

সৃষ্টিসমূহের বিন্যাসঃ

এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সাতটি আকাশ নির্মাণ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অট্টালিকা নির্মাণের এটাই নিয়ম যে, প্রথমে নির্মাণ করা হয় নীচের অংশ এবং পরে

উপরের অংশ। মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা ইনশাআল্লাহ এখনই আসছে। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলেছেনঃ "আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি কঠিন কাজ, নাকি আসমান? আল্লাহ ওটা (এরূপে) নির্মাণ করেছেন যে, ওর ছাদ উঁচু করেছেন এবং ওকে সঠিকভাবে নির্মাণ করেছেন। আর ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর দিনকে প্রকাশ করেছেন। আর এরপর জমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তা হতে পানি ও তৃণ বের করেছেন এবং পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন। (তিনি এ সব কিছু করেছেন) তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর উপকারের জন্যে।" এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আকাশের পরে যমীন সৃষ্টি করেছেন।" কোন কোন মনীষী তো বলেছেন যে, উপরের আয়াতটিতে ثُمَّ শুধু عَطْفِ خَبَرٌ -এর জন্যে এসেছে, عَطْفِ فِعْل -এর জন্যে নয়। অর্থাৎ ভাবার্থ এই নয় যে, যমীনের পরে আকাশের সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেছেন, বরং উদ্দেশ্য শুধু সংবাদ দেয়া যে, আকাশসমূহও সৃষ্টি করেছেন এবং জমীনও সৃষ্টি করেছেন। আরব কবিদের কবিতায় এ দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন কোন স্থলে ثُمَّ শুধুমাত্র খবর দেয়ার জন্যেই সংযুক্ত হয়ে থাকে–'আগে ও পরে' উদ্দেশ্য হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, পরবর্তী আয়াতটিতে আসমানের সৃষ্টির পরে যমীন বিছিয়ে দেয়া ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, সৃষ্টি করা নয়। তাহলে ঠিক আছে যে, প্রথমে যমীন সৃষ্টি করেছেন, পরে আসমান। অতঃপর যমীনকে ঠিকভাবে সাজিয়েছেন। এতে আয়াত দু'টি পরস্পর বিরোধী আর থাকলো না। এ দোষ হতে মহান আল্লাহর কালাম সম্পূর্ণ মুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার আরশ পানির উপরে ছিল। এর পূর্বে তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর যখন তিনি অন্যান্য জিনিস

সৃষ্টি করার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি পানি হতে ধূম্র বের করেন এবং সেই ধূম্র উপরে উঠে যায়। তা হতে তিনি আকাশ সৃষ্টি করেন। তারপর পানি শুকিয়ে যায় এবং ওকে তিনি যমীনে পরিণত করেন। এবং পরে পৃথক পৃথকভাবে সাতটি যমীন করেন। রোববার ও সোমবার এই দু'দিনে সাতটি যমীন নির্মিত হয়। যমীন আছে মাছের উপরে, মাছ ওটাই যার বর্ণনা কুরআন মাজীদের نُوْنَ وَ الْقَلَمِ এই আয়াতটিতে রয়েছে। মাছ আছে পানির উপরে, পানি আছে, 'সাফাতের' পিঠের উপর এবং 'সাফাত' আছে ফেরেশতার পিঠের উপর এবং ফেরেশতা আছেন পাথরের উপর, এটা ঐ পাথর, যার বর্ণনা হযরত লোকমান করেছেন।

পাথরটি আছে বাতাসের উপর, আসমানেও নেই এবং যমীনেও নেই। যমীন কাঁপতে থাকলে আল্লাহ তাঁর উপর পাহাড় স্থাপন করেন, তখন তা থেমে যায়। আল্লাহ তা'আলার এ কথার অর্থ এটাইঃ 'আমি ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে। পাহাড়, যমীনে উৎপাদিত শস্য এবং যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস মঙ্গল ও বুধ এই দু'দিনে সৃষ্টি করেন। এরই বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত আয়াতটিতে রয়েছে। অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ওটা ছিল ধূম্র।। অতঃপর তা হতে সাতটি আকাশ নির্মাণ করেন। এটা বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই দু'দিনে নির্মিত হয়। শুক্রবার আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কার্য জমা হয়েছিল বলে তাকে জুমআ' বলা হয়েছে।

আকাশে তিনি ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেন–যার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারও নেই। দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন এবং ওগুলোকে শয়তান হতে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন। এসব সৃষ্টি করার পর বিশ্বপ্রভু আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হন। যেমন তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও জমীনকে এবং ঐ সমুদয় বস্তুকে, যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হন।"

জগত সৃষ্টির মোট সময়ঃ

তাফসীর-ই-ইবনে জারীরে রয়েছে–হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রাঃ) বলেন যে, রোববার হতে মাখলুকের সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। দু'দিনে সৃষ্টি করা হয় যমীন, দু'দিনে যমীনের সমস্ত জিনিস এবং দু'দিনে আসমান সৃষ্টি করা হয়। শুক্রবারের শেষাংশে আসমানের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ঐ সময়েই হযরত

আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। ওটা হতে যে ধোঁয়া উপরের দিকে উঠেছে তা হতে আকাশ নির্মাণ করেন–যা একটির উপর আর একটি এভাবে সাতটি এবং যমীনও একটির নীচে আরেকটি এভাবে সাতটি। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন সূরা-ই-সিজদাহ্‌র মধ্যে রয়েছে। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত। শুধুমাত্র কাতাদাহ্ (রঃ) বলেন যে, আকাশ যমীনের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। কুরতুবী (রঃ) এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। وَالنّٰزِعٰتِ -এর আয়াতকে সামনে রেখে ইনি বলেন যে, আকাশের সৃষ্টির বর্ণনা পৃথিবীর পূর্বে রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে আছে, হযরত আব্বাস (রাঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, যমীন তো আকাশসমূহের পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু বিছানো হয়েছে পরে। সাধারণ

আলেমদেরও উত্তর এটাই। সূরা-ই- وَالنّٰزِعٰتِ -এর তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ এর বর্ণনা দেয়া হবে। ফলকথা এই যে, যমীন বিছানো হয়েছে পরে। কুরআন মাজীদের মধ্যে دَحٰىهَا শব্দটি আছে এবং এর পরে পানি, চারা, পাহাড় ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এ শব্দটির ব্যাখ্যা যেন নিম্নরূপঃ মহান আল্লাহ যে যে জিনিসের বৃদ্ধির ক্ষমতা এই যমীনে রেখেছিলেন, ঐ সবকে প্রকাশ করে দিলেন এবং এর ফলে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদন রেরিয়ে আসলো। এভাবেই আকাশেও স্থির ও গতিশীল তারকারাজি ইত্যাদি নির্মাণ করলেন।

সহীহ মুসলিম ও সুনান-ই-নাসাঈতে হাদীস আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড় রোববারে, বৃক্ষরাজি সোমবারে, খারাপ জিনিসগুলো মঙ্গলবারে, আলো বুধবারে, জীবজন্তু বৃহস্পতিবারে এবং হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারে আসরের পর সেই দিনের শেষ সময়ে আসরের পর থেকে নিয়ে রাত পর্যন্ত।" এ হাদীসটি 'গারাইব-ই-মুসলিম' এর মধ্যে রয়েছে। ইমাম ইবনে মাদীনী (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) প্রভৃতি মনীষীগণ এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা হযরত কা'বের (রাঃ) নিজস্ব উক্তি এবং হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হযরত কা'বের (রাঃ) একথা শুনেছেন এবং কতক বর্ণনাকারী একে ভুলবশতঃ মারফূ' হাদীস হিসেবে ধরে নিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) এটাই বলেন।

নূনঃ

নূন হচ্ছে বিশালাকার মাছ, যার উপর যমীনকে বিস্তৃত করা হয়েছে।

Ibn 'Abbas told all of you by Wasil b. 'Abd al-A'la al-Asadi-Muhammad b. Fudayl-al-A'mash-Abu Zabyan-Ibn 'Abbas: The first thing created by God is the Pen. God then said to it: Write!, whereupon the Pen asked: What shall I write, my lord? God replied: Write what is predestined! He continued. And the Pen proceeded to (write) whatever is predestined and going to be to the Coming of the Hour. God then lifted up the water vapor and split the heavens off from it. Then God created the fish (nun), and the earth was spread out upon its back. The fish became agitated, with the result that the earth was shaken up. It was steadied by means of the mountains, for they indeed proudly (tower) over the
earth.352

I was told about the same by Wasil-Waki'-al-A'mash-Abu Zabyan-Ibn 'Abbas.

According to Ibn al-Muthanna-Ibn Abi 'Adi-Shu'bah Sulayman (al-A'mash ?)-Abu Zabyan-Ibn 'Abbas: The first (thing) created by God is the Pen. It proceeded to (write) whatever is going to be. (God) then lifted up the water vapor, and the heavens were created from it. Then He created the fish, and the earth was spread out on its back. The fish moved, with the result

that the earth was shaken up. It was steadied by means of the mountains, for the mountains indeed proudly (tower) over the earth. So he said, and he recited: "Nun. By the Pen and what they write."353

I was told the same by Tamim b. al-Muntasir-Ishaq (b. Ytzsuf)-Sharik (b.'Abdallah al-Nakha'i)-al-A'mash-Abu Zabyanor Mujahid

[History Of Tabari- Six Days Creation]

এ ব্যপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ এটা মশহূর ছিল যে, নূন দ্বারা ঐ মাছকে বুঝানো হয়েছে যা সপ্তম যমীনের নীচে রয়েছে। বাগাভী (রঃ) প্রমুখ তাফসীরকার বলেন যে, এই মাছের পিঠের উপর এক কংকরময় ভূমি রয়েছে যার পুরুত্ব আকাশ ও পৃথিবীর সমান। ওর উপর একটি বলদ রয়েছে যার চল্লিশ হাজার শিং রয়েছে।

১. ইমাম ইবনে আবি হাতিম ও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেন।
৩. এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ওর পিঠের উপর সাতটি যমীন এবং ওগুলোর সমস্ত মাখলূক আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

'নূন' প্রভৃতি হুরূফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরায়ে বাকারার শুরুতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কথিত আছে যে, এখানে ن দ্বারা ঐ বড় মাছকে বুঝানো হয়েছে যা এক জগত পরিবেষ্টনকারী পানির উপর রয়েছে যা সপ্ত আকাশকে উঠিয়ে নিয়ে আছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেনঃ "লিখো।" কলম বলেঃ "কি লিখবো?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তকদীর লিখে নাও।" সুতরাং ঐ দিন থেকে

www.QuranerAlo.com

নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবার আছে সবগুলোই কলম লিখে ফেলে। তারপর আল্লাহ পাক মাছ সৃষ্টি করেন এবং পানির বাষ্প উত্থিত করেন যার দ্বারা আকাশ নির্মিত হয় এবং যমীনকে ঐ মাছের পিঠের উপর রাখা হয়। মাছ নড়ে ওঠে, ফলে যমীনও হেলতে দুলতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা যমীনে পাহাড় গেড়ে দেন। ফলে যমীন মযবূত হয়ে যায় এবং ওর নড়াচড়া করা বন্ধ হয়ে যায়।" অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[১] ভাবার্থ এই যে, এখানে نٓ দ্বারা এই মাছকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও মাছ সৃষ্টি করেন। কলম জিজ্ঞেস করেঃ "কি লিখবো?" উত্তরে বলা হয়ঃ "কিয়ামত পর্যন্ত যতকিছু হবে সবই লিখে নাও।" অতঃপর তিনি نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।"[২] সুতরাং نٓ দ্বারা উদ্দেশ্য মাছ এবং قلم দ্বারা উদ্দেশ্য এই কলম।

আসমানের আগে পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি বিগব্যাং থিওরির মিথ্যাচারীতা এবং আধুনিক মুসলিমদের অপব্যাখ্যাকে প্রকাশ করে দেয়। মাছের পিঠে যমীন ও আসমানকে রাখার বিষয়টিও অপবিজ্ঞান পরিপন্থী বিষয়। নাসার প্রকাশ করা পৃথিবীর (ভুয়া)ছবি গুলোতে এরকম কিছুই দেখা যায় না,কিন্তু হলিউডের Color of magic ফিল্মের শুরুতে ঠিকই ডিস্ক ওয়ার্ল্ড কচ্ছপের পিঠে দেখানো হয়।

আমরা মুসলিমরা আজ এমন, যে স্টিফেন হকিং যখন বলে জগতসমূহ কচ্ছপের পিঠে আছে তখন সেটাকে খুব গভীর জ্ঞানগর্ভের বিষয় বলে মনে করি, অথচ যখন শার'ঈ দলিলে কাফিরদের কথার বিপরীত সত্যকে উল্লেখ দেখি তখন সেটার প্রতি অবিশ্বাসকে মুখে প্রকাশ না করলেও অন্তরে ঠিকই অবিশ্বাসবশত সংশ্লিষ্ট হাদিসটিকে জাল-জঈফ বানাতে সনদ তালাশ শুরু করি। এটাকে তখন কুসংস্কার কিংবা অতিরিক্ত ধর্মীয়গোড়ামিপূর্ন বিশ্বাস বলে মনে করি, কিন্তু ওদিকে হকিং কমিউনিটির ইউনিভার্স অন টার্টেল থিওরিকে শ্রদ্ধার সাথে দেখি। নিঃসন্দেহে এটা অন্তরের রোগসমূহের একটি।

যারা কাফিরদের বিগব্যাং তত্ত্বকে ইসলামাইজ করেছে,তাদের নিকট প্রশ্ন, বিগব্যাং থিওরিতে কিভাবে পৃথিবীকে মহাশূন্য বা মহাকাশ ছাড়াই সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে(যেহেতু কুরআন-হাদিস এ কথা বলছে), এটা তো বিগব্যাং এর সাথে বৈপরীত্যপূর্ন সাংঘর্ষিক বর্ননা!? তারা এখন কিরূপ অপব্যাখ্যার দ্বারা ইসলাম ও কুফরকে সমন্বয় করবে?!

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে বলেনঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰي اِلَى السَّمَاءِ
فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ—তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ ঃ ২৯)

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا.
ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ
فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ. ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا. قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ.
فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا. ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

অর্থাৎ—বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ ঃ ৯-১২)

Contents

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পৃথিবী আকাশের আগে সৃষ্ট হয়েছে। কেননা, পৃথিবী হলো, প্রাসাদের ভিত স্বরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ—আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন

উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক, এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ! (৪০ ঃ ৬৪)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا. وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا. وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا . وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا . وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا . وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا .

অর্থাৎ—আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক? আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়, তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আর তোমাদের ঊর্ধদেশে নির্মাণ করেছি সুস্থিত সাত আসমান এবং সৃষ্টি করেছি প্রদীপ। (৭৮ ঃ ৬-১৩)

واَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. افَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ—যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে; তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণসম্পন্ন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ? (২১ ঃ ৩০)

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে আমি ফাঁক করে দিয়েছি; ফলে প্রবাহিত হয়েছে বায়ুমালা, বর্ষিত হয়েছে বারিধারা, প্রবাহিত হয়েছে ঝরনা ও নদ-নদী এবং জীবনীশক্তি লাভ করেছে প্রাণীকুল। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ.

অর্থাৎ—এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২১ ঃ ৩২)

অর্থাৎ আকাশে আল্লাহর সৃষ্টি করা স্থির ও চলমান তারকা রাজি, প্রদীপ্ত নক্ষত্র ও উজ্জ্বল গ্রহমালা, ইত্যাকার নিদর্শনাবলী এবং তাতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিকর্তার হিকমতের প্রমাণসমূহ থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

Contents

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সকল প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে না; কিন্তু তাঁর শরীক করে। (১২ ঃ ১০৫-১০৬)

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا

وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا . اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ .

অর্থাৎ—তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন। তিনি একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা থেকে নির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য। (৭৯ ঃ ২৭-৩৩)

এ আয়াত দ্বারা কেউ কেউ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আকাশ সৃষ্টির প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এতে তাঁরা পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি। কারণ এ আয়াতের মর্ম হলো, পৃথিবীর বিস্তার এবং বাস্তবে তা থেকে পানি ও তৃণ নির্গত করা আকাশ সৃষ্টির পরে হয়েছে। অন্যথায় এসব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। যেমন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا .

এবং তাতে (পৃথিবীতে) রেখেছেন কল্যাণ এবং তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (৪১ঃ ১০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফসলের ক্ষেত্র এবং ঝরনা ও নদী-নালার স্থানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারপর যখন নিম্নজগত ও উর্ধ্ব জগতের আকার সৃষ্টি করেন, তখন পৃথিবীকে বিস্তৃত করে তা থেকে তার মধ্যে রক্ষিত বস্তুসমূহ বের করেন। ফলে ঝরনাসমূহ বের হয়ে আসে, নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং শস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। এ জন্যই তো دَحٰى -কে পানি ও তৃণ বের করা এবং পর্বতকে প্রোথিত করা দ্বারা ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا .

অর্থাৎ—তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন (অর্থাৎ) তা থেকে পানি ও তৃণ নির্গত করেন। তিনি পর্বতসমূহকে যথাস্থানে স্থাপন করে সেগুলোকে দৃঢ় ও মজবুত করে দিয়েছেন। (৭৯ ঃ ৩০-৩২)

Contents

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ

الْمَاهِدُوْنَ وَمِنْ كُلِّ شَيْئٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

অর্থাৎ—আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা-সম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি এটা কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (৫১ ঃ ৪৭-৪৯)

بَأْيْدٍ অর্থ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ ক্ষমতা বলে। আর আকাশ সম্প্রসারণ করার তাৎপর্য হলো, যা উঁচু তাই প্রশস্ত। সুতরাং প্রতিটি আকাশ তার নিচেরটির চেয়ে উচ্চতর বিধায় নিচেরটি অপেক্ষা তা প্রশস্ততর। আর এ জন্যই তো কুরসী আকাশসমূহ থেকে উঁচু বিধায় তা সব ক'টি আকাশ অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। আর আরশ এর সব ক'টি থেকে অনেক বড়।

এরপর وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا অর্থ আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে বিস্তৃত করে স্থির অটল করে দিয়েছি; ফলে তা আর তোমাদেরকে নিয়ে নড়ে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ অর্থাৎ আমি এটা কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতগুলোতে প্রতিটি বাক্যের মাঝে যে واو (যার অর্থ, এবং) ব্যবহার করা হয়েছে তা বিষয়গুলো সংঘটনে ধারাবাহিকতা নির্দেশক নয়। নিছক সংবাদ প্রদানই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ই সম্যক অবহিত। ইমান বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেছেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হই এবং আমার উটনীটি দরজার সংঙ্গে বেঁধে রাখি। এ সময়ে তাঁর নিকট বনু তামীমের কিছু লোক আগমন করলে তিনি বললেন ঃ

اقبلوا البشرى يابنى تميم.

অর্থাৎ—সুসংবাদ নাও হে বনু তামীম। জবাবে তারা বলল, সুসংবাদ তো দিলেন, আমাদেরকে কিছু দান করুন। কথাটি তারা দু'বার বলল। তারপরই ইয়ামানের একদল লোকের আগমন ঘটলে তিনি বললেন ঃ বনু তামীম যখন গ্রহণ করেনি তখন হে ইয়ামানবাসী তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। জবাবে তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা বলল, আপনার নিকট আমরা এ সৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। নবী করীম (সা) বললেন ঃ

كان الله ولم يكن شيئ غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيئ وخلق السموت والأرض .

অর্থাৎ—"আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর। লিপিতে তিনি সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" এমন সময় কে একজন ডেকে বলল, হে হুসায়নের পুত্র! তোমার উটনী তো চলে গেল। উঠে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, উটনীটি মরিচীকার দিকে চলে যাচ্ছে। আল্লাহর শপথ! পরে আমার আফসোস হলো—হায়, যদি আমি উটনীটির পিছে না পড়তাম!

প্রথমাবস্থায় আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী কোনরূপ ফাকা স্থান ছিল না। পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। এমনকি আসমান-জমিনকে সাত স্তরেও বিভক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে আসমান ও জমিনকে পৃথক করে, আসমানকে সাত স্তরে বিভক্ত করা হয়। আল্লাহ বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মিশে(rat'q) ছিল ওতপ্রোতভাবে , অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক(fat'q) করে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়।

وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।

(আম্বিয়াঃ৩০-৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এর বর্ননা খুবই স্পষ্ট। আসমান এবং জমিন উভয়ই সলিড অবজেক্ট। যা সর্বপ্রথম একত্রে মিশে ছিল, পরবর্তীতে আল্লাহ উভয়কে পৃথক করে উভয়ের মাঝে ফাকাস্থান সৃষ্টি করেন। এবং আসমানকে ফেড়ে সাতটি স্তরে বিভক্ত করে পৃথিবীর ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর চাঁদ সূর্য নক্ষত্রমালা এবং দিন রাত্রিকে সৃষ্টি করেন যারা প্রত্যেকের নির্ধারিত ফালাকে আবর্তন করে।

যারা বিবর্তনবাদী শয়তানি বিজ্ঞানকে ইসলামের সাথে মিশ্রিত করছে, তারা কি করে এটা সমন্বয় করছে যে, (প্রচলিত তত্ত্বানুযায়ী) নন সলিড শূন্য আকাশ(ভ্যাকুয়াম) জমিনের সাথে মিশে ছিল! এবং সেই ফাকা স্থান বা এম্পটি স্পেস আবার আলাদাও করা হল! যারা কুরআন আর অপবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে দাওয়ার নামে এরা শুধু অপব্যাখ্যাই করেনি,বরং কুরআনের আয়াত গুলোকে অর্থহীন করে তুলছে। কারন দুইটা ভিন্ন জিনিসকে এক করার চেষ্টা করে খিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে। আমরা যেরূপে সমস্ত দলিল গুলো একের পর এক প্রকাশ করছি, এরূপ করে যদি কুফর-ঈমানের মাঝে অবস্থানকারী মুসলিমরা অপব্যাখ্যা আর গোঁজামিল দিয়ে আধুনিক অপবিজ্ঞানকে সমন্বয় করতে চেষ্টা করত, তাহলে ওদের ভাঁওতাবাজি সহজেই প্রকাশ পেত। কিন্তু ওরা এটা কখনোই করবে না, বরং বিচ্ছিন্নভাবে আয়াত গুলোকে নিজের মত অনুবাদ করে অপব্যাখ্যা করবে।
আফসোসের বিষয় হচ্ছে, যে আয়াত(২১:৩০) বিগব্যাং এর ভুয়া তত্ত্ব থেকে আল্লাহর সৃষ্টির পবিত্রতা ঘোষনা করে, সেই আয়াতকেই ওরা বিগব্যাং কে সত্যায়নের দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। ইন্না লিল্লাহ। এজন্য যারা কুরআন হাদিসে বর্নিত কস্মোলজির সম্পর্কে জ্ঞানহীন তারা অপব্যাখ্যাকেই সত্য বলে ভাবতে শুরু করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান জমিনকে ঘোরাঘুরি বা আবর্তন উপযোগী করে সৃষ্টি করেন নি। বরং আসমান জমিন স্থির(এ ব্যপারে সামনে শরী'আতের আরো মজবুত দলিলের সম্মুখীন হব,বিইযনিল্লাহ) । আল্লাহ আসমানকে আমাদের উপরে গম্বুজাকৃতির ছাদ এবং জমিনকে বিছানার ন্যায় বিছিয়েছেন। পাহাড়কে স্থাপন করেছেন কীলকরূপে সমতল জমিন স্থির রাখার জন্য যাতে তা এদিক ওদিক কাত হয়। বড় আফসোসের বিষয় হচ্ছে কুরআন সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যাকারীরা সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতকে ব্যবহার করে স্থির জমিনকে ঘূর্নয়মান চলমান প্রমানের জন্য। কারন তাদের নীতি অনুযায়ী, কাফিরদের প্রচলিত এ বিজ্ঞান অনুযায়ী দ্বীনকে খাপ খাওয়াতে হবে। তারা "সবাই" শব্দের ভেতর জমিনকেও অন্তর্ভুক্ত করে, অথচ স্পষ্টভাবে দেখছেন আল্লাহ এই "সবাই" বলতে দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য এ চারটি জিনিসের কথা বলেছেন।

এবার আসুন, সূরা আম্বিয়ার এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির(রঃ),প্রাচীন আলিম,মুফাসসীরিন এবং সাহাবীরা(রাযি.) কি বলছেন সেটা দেখি-

প্রথমে আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিল না। আল্লাহ তাআ'লা পরে ওগুলিকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। যমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করতঃ অত্যন্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাতটি যমীন ও সাতটি আসমান বানিয়েছেন। যমীন ও প্রথম আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রেখেছেন। আকাশ হতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করেন। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস তিনি পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। এই সমুদয় জিনিস, যে গুলির প্রত্যেকটি, কারিগরের একচেটিয়া ক্ষমতা ও একত্ব প্রমাণ করে না কি? এ লোকগুলি নিজেদের সামনে এসব কিছু বিদ্যমান পাওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেই শিরক্ পরিত্যাগ করছে না।

فَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَّهٗ اٰيَةٌ ۞ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

অর্থাৎ "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, তিনি এক।"

হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাসকে (রঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "পূর্বে রাত ছিল, না দিন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ

"প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তা হলে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে একটি লোক হযরত ইবনু উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেনঃ "এ সম্পর্কে তুমি হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস কর। তিনি উত্তরে যা বলবেন তা আমাকে জানাবে।" তখন লোকটি হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। তিনি জবাবে বলেনঃ "যমীন ও আসমান সব এক সাথেই ছিল। না বৃষ্টি বর্ষিত হতো, না ফসল উৎপন্ন হতো। যখন আল্লাহ তাআ'লা আত্মা বিশিষ্ট মাখলূক সৃষ্টি করলেন তখন তিনি আকাশকে ফেড়ে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং যমীনকে ফেড়ে তা হতে ফসল উৎপন্ন করলেন।" প্রশ্নকারী লোকটি এটা হযরত ইবনু উমারের (রাঃ) সামনে বর্ণনা করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলে ওঠেনঃ " আজকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রাঃ) কুরআনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে। মাঝে মাঝে আমার ধারণা হতো যে, হয়তো বা হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) এ ব্যাপারে সাহসিক উদ্যম বেড়ে গেছে। কিন্তু

আজ ঐ কুধারণা আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল।" [1]

আল্লাহ তাআ'লা আসমান ফেড়ে সাতটি আসমান বানিয়ে দেন এবং যমীনকে ফেড়ে সাতটি যমীন বানিয়ে দেন। হযরত মুজাহিদের (রাঃ) তাফসীরে এও রয়েছে যে, এগুলি মিলিত ভাবে ছিল। অর্থাৎ পূর্বে সাত আসমান এক সাথেই ছিল এবং অনুরূপভাবে সাত যমীনও একটাই ছিল। তারপর পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়। হযরত সাঈদের (রঃ) তাফসীরে আছে যে, এ দু'টো পূর্বে একটাই ছিল, পরে পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। পানিকে সমস্ত প্রাণীর আসল বা মূল করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার মন খুব খুশী হয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে সমস্ত জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! জেনে রেখো যে, সমস্ত জিনিস পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। [2]

---

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন আমি অপনাকে দেখি তখন আমার প্রাণ খুশী হয় ও চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আপনি আমাদেরকে প্রত্যেক জিনিস (এর মূল) সম্পর্কে খবর দিন।' তিনি বললেনঃ "প্রত্যেক জিনিস পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।" আমি পুনরায় বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যে, যখন আমি তা করবো তখন আমি বেহেশতে প্রবেশ করবো। তিনি বলেনঃ "লোকদেরকে সালাম দিতে থাকো, (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খেতে দাও এবং রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড় যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [1]

যমীনকে আল্লাহ তাআ'লা পর্বতরূপ পেরেক দ্বারা দৃঢ় করে দিয়েছেন যাতে তা হেলে দুলে মানুষকে পেরেশান করে না তুলে এবং তাদেরকে প্রকম্পিত না করে। যমীনের তিন ভাগ পানিতে খোলা আছে, যাতে মানুষে আকাশ ও ওর বিস্ময়কর বস্তুরাজি চক্ষু দ্বারা অবলোকন করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রহমতের গুণে যমীনে রাস্তাপথ বানিয়ে দিয়েছেন। যাতে মানুষ সহজে তাদের সফরের কাজ চালিয়ে যেতে পারে এবং দূর দূরান্তে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ তাআ'লার মাহাত্ম্য দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, এক শহর হতে অন্য শহরের মাঝে পর্বত রাজি প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এর ফলে চলাফেরা বাহ্যতঃ কষ্টকর মনে হচ্ছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা বলে ঐ পর্বত রাজির মধ্যেও পথ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে এখানকার

লোক সেখানে এবং সেখানকার লোক এখানে পৌঁছতে পারে এবং নিজেদের কাজ কারবার চালিয়ে যেতে পারে। তিনি আসমানকে যমীনের উপর ছাদরূপে বানিয়ে রেখেছেন। যেমন–

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি আকাশকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি এবং আমি প্রশস্ত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী।" (৫১ঃ ৪৭)

আর এক জায়গায় বলেছেনঃ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا

অর্থাৎ "শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তার।" (৯১ঃ ৫) আরো বলেনঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ـ

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ "তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?" (৫০ঃ ৬)

قبـــة বলা হয় ছাদ ও তাঁবু খাড়া করাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলামের 'বেনা' বা ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে।" যেমন পাঁচটি স্তম্ভের উপর কোন ছাদ বা তাঁবু দাঁড়িয়ে থাকে।

অতঃপর এই যে আকাশ, যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটা সুউচ্চ ও নির্মল।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আকাশ কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হচ্ছে তরঙ্গ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।" [১]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আসমান ও যমীনে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যে গুলি মানুষের চোখের সামনে বিদ্যমান, অথচ তারা সেগুলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষণা করে না যে, কত প্রশস্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তাআ'লা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। ওগুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান

রয়েছে। সূর্যের কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যখন ওটা বিদ্যমান থাকে তখন দিন হয় এবং যখন ওটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন রাত্রি হয়। এই সূর্য শুধু মাত্র একদিন ও রাতে সারা আকাশকে প্রদক্ষিণ করে। ওর চলন ও তীব্রতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু অনুমানের উপর বলা হয়ে থাকে সেটা অন্য কথা।

বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের আবেদদের মধ্যে কোন একজন আ'বেদ তাঁর ত্রিশ বছরের ইবাদতের সময় পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য আ'বেদদের উপর যেমন ত্রিশ বছরের ইবাদতের পর মেঘের দ্বারা ছায়া করা হতো, তাঁর উপর তা হলো না। তখন তিনি তাঁর ঐ অবস্থার কথা তাঁর মায়ের নিকট বর্ণনা করেন। তখন তাঁর মা বলেন, "হে আমার প্রিয় বৎস! হয় তো তুমি তোমার এই ইবাদতের যুগে কোন পাপকার্য করে থাকবে।" তিনি বললেনঃ "আম্মা! আমি তো এরূপ কোন কার্য করি নাই।" মা বললেনঃ "তা হলে তুমি অবশ্যই কোন

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদ গারীব।

পাপ কার্যের পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করে থাকবে।" তিনি বললেনঃ খুব সম্ভব তুমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেছো, কিন্তু কোন চিন্তা গবেষণা না করেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছো।" আ'বেদ তখন বললেনঃ "এরূপতো বরাবরই হতে আছে।" মা বললেনঃ "তা হলে কারণ এটাই।"

আশা করি এবার স্পষ্ট হয়েছে। সাহাবা(রাঃ), মুফাসসিরীন সবাই আসমান জমিনের ব্যপারে সেই অভিন্ন সত্য কথা বলছেন, যার বর্ননা আমরা করছি। মহাবিস্ফোরণের ন্যায় কিছুই ঘটে নি, যা কাফিররা বিশ্বাস করতে বলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সবই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বপ্রথম আসমান ও জমিন একত্রিত ছিল। সাহাবীদের বর্ননানুযায়ী উভয়ই বস্তু একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা পৃথক করে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী ফাকাস্থান তৈরি করলেন।আসমানকে ফেড়ে সাত স্তরে বিভক্ত করলেন।

…divided (Fat'r) into parts
Water
Water
Earth
parts
Disjointed or separate
(Fat'q)
The separation or
the rupture (Fat'q)

Water
Water
earth
Retained waves
Smoke
Water
Water
earth
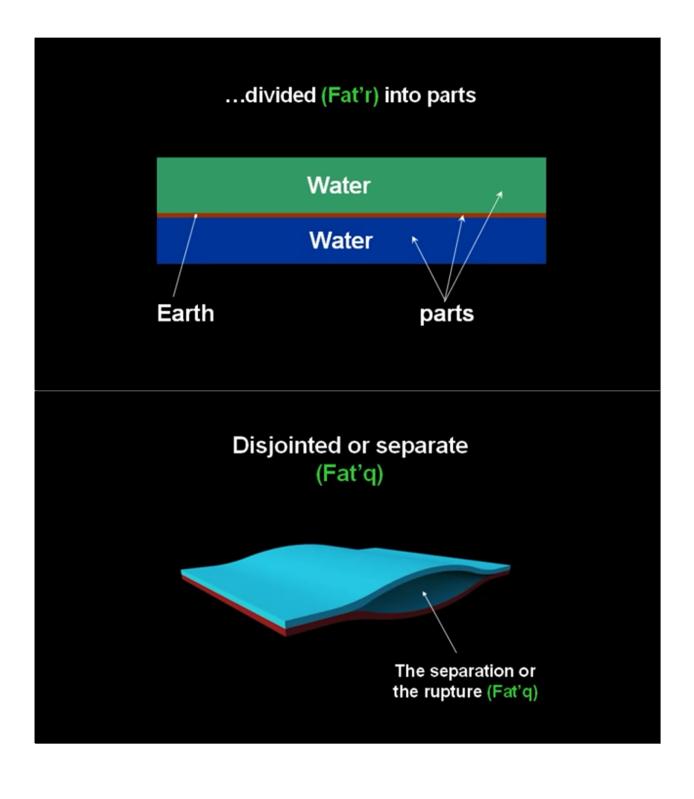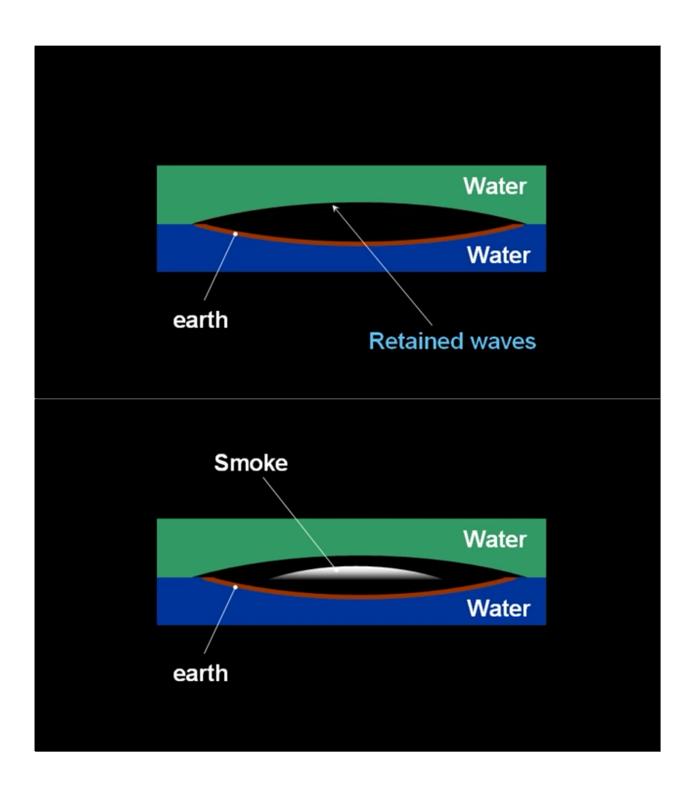
প্রথম আসমান থেকে জমিনের ফাকা স্থানটি ৫০০ বছরের পথের সমান দীর্ঘ। আল্লাহ আসমান ফেড়েঁ বর্ষন করলেন। বিষয়টি আলজেরীয় এক ভাই গ্রাফিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। দেখুনঃ

https://youtu.be/RvTxxRwxQX0

আজকের বিজ্ঞান বলে আসমান বলতে অন্তহীন 'শূন্য' অথচ আল্লাহ আসমান জমিনের মধ্যকার শূন্যস্থান সৃষ্টি করেছেন। আসমান যদি সত্যিই শূন্যস্থান হত তাহলে সাহাবীরা(রাঃ), প্রাচীন মুফাসসিরীন কখনোই আসমান জমিন পৃথক করে মাঝে শূন্যস্থান নির্মানের কথা বলতেন না। আসমানকে পৃথক করার প্রশ্নও আসতো না, কারন যেহেতু আসমান মানেই শূন্য। শূন্যতা বা ফাকাস্থানকে জমিন থেকে পৃথক করে আবারও ফাকাস্থান তৈরির চিন্তা একদমই অর্থহীন। তাফসিরেও একই কথা যে, পর্বতের দ্বারা যমীনকে স্থির করা হয়েছে। আসমানকে তাবু বা বেনার ন্যায় স্তম্ভ ছাড়াই স্থির রাখা হয়েছে। আসমান হচ্ছে তরঙ্গায়িত সুউচ্চ ছাদ যা আমাদের জন্য বন্ধ(যদিও থিয়েটারে/কম্পিউটারে বানানো চাদে মঙ্গলে যাওয়ার ভিডিও মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে)। আর আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে উল্লিখিত ৪ টি জিনিস ছাড়া অন্যকিছুকে আবর্তনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

পৃথিবীকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং এর পরবর্তীতে আসমানকে সপ্তস্তরে বিভক্তকরনের দলিল হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ
তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা

[হা মীম সেজদাহঃ৯-১২]

এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসিরের(রহঃ) তাফসীরে এসেছেঃ

সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ। সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্ট জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের তাঁর সাথে কুফরী করাও উচিত নয় এবং শির্ক করাও না। তিনিই যেমন সবারই সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই সবারই পালনকর্তা। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এখানে এগুলোকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অট্টালিকা নির্মাণ করারও পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ করা হয়। তারপর উপরের অংশ ও ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ـ

অর্থাৎ "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং ওকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।"(২ ঃ ২৯) আর আল্লাহ্ তা'আলা যে বলেছেনঃ

ءَ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ـ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ـ وَاَغْطَشَ لَیْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ـ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ـ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ـ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ـ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ـ

অর্থাৎ "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন; তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক; এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, এবং

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এসব তোমাদের ও তোমাদের (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর ভোগের জন্যে।"(৭৯ ঃ ২৭-৩৩) এর দ্বারা বুঝা

যাচ্ছে যে, আসমানকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যমীনকে এর পরে বিছানো হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা ভাবার্থ এই যে, পরে যমীন হতে পানি, চারা বের করা হয়েছে এবং পাহাড়কে গেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন এর পরেই রয়েছেঃ "তিনি ওটা হতে বের করেছেন ওর পানি ও তৃণ।" তারপর তিনি আসমান ও যমীনকে ঠিকঠাক করেছেন। সুতরাং দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "কুরআন কারীমের কতকগুলো আয়াতের মধ্যে আমি কিছুটা অনৈক্য দেখতে পাচ্ছি। যেমন একটি আয়াতে রয়েছেঃ

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ -

অর্থাৎ "ঐ দিন তাদের মধ্যে কোন বংশ সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।"(২৩ ঃ ১০১) অন্য আয়াতে আছেঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ -

অর্থাৎ "তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।"(৫২ ঃ ২৫) এক আয়াতে আছেঃ

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্‌র কাছে কোন কথা গোপন করবে না।"(৪ ঃ ৪২) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ -

অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।"(৬ ঃ ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা গোপন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ..... وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا -

অর্থাৎ "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা সৃষ্টি করেছেন।...... এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।"(৭৯ ঃ ২৭-৩০) এখানে মহান আল্লাহ্ আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে। আর এখানে (সূরায়ে হা-মীম, আস্ সাজদায়) বলেছেনঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ ..... طَائِعِيْنَ

এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। আর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

তাহলে কি আল্লাহ্ এরূপ ছিলেন, তারপর গত হয়ে গেছেন? দয়া করে এগুলোর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিন, যাতে অনৈক্য দূর হয়ে যায়। লোকটির এসব প্রশ্নের উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "যে দু'টি আয়াতের একটির মধ্যে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদের কথা রয়েছে এবং অন্যটিতে তা অস্বীকার করা হয়েছে। এটা দুই সময়ের কথা। শিংগায় দুটি ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের সময় পরস্পরের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। যে দু'টি আয়াতের একটির মধ্যে কোন কথা গোপন না করার এবং অন্য আয়াতে গোপন করার কথা রয়েছে। এরও স্থল দু'টি। যখন মুশরিকরা দেখবে যে, একত্ববাদীদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে তখন তারা বলবেঃ "আমরা মুশরিক ছিলাম না।" কিন্তু যখন তাদের মুখে মোহর লেগে যাবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে তখন আর কিছুই গোপন থাকবে না এবং তাদের কৃতকর্মের স্বীকারুক্তি হয়ে যাবে। তখন তারা বলবেঃ "হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম।"

আসমান এবং যমীনের সৃষ্টির ক্রম পর্যায়ের ব্যাপারেও কোন অনৈক্য নেই। প্রথমে দুই দিনে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়। তারপর দুই দিনে আসমানকে সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর যমীনের জিনিসগুলো, যেমন পানি, চারা, পাহাড়-পর্বত, প্রস্তরাদি, জড় পদার্থ ইত্যাদি দুই দিনে সৃষ্টি করেন। دَحٰهَا-এর অর্থ এটাই। সুতরাং যমীনের পূর্ণ সৃষ্টিকার্য চার দিনে হয়েছে। আর আসমান সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে।

যে নামগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছেন ওগুলোর তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে, সদা-সর্বদা তিনি ঐরূপই থাকবেন। আল্লাহ তা'আলার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। সুতরাং কুরআন কারীমের মধ্যে মোটেই অনৈক্য নেই এবং এর আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। এর এক একটি শব্দ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে।

যমীনকে আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রবিবার ও সোমবারে। আর যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি

বরকতময় করেছেন। মানুষ এতে বীজ বপন করে এবং তা হতে গাছ, ফলমূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই উৎপন্ন হয়। ক্ষেত এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনের এই ঠিক-ঠাককরণ মঙ্গল ও বুধবারে হয়। চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হয়। যে লোকগুলো এর জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছিল তারা পূর্ণ জবাব পেয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

যমীনের প্রতিটি অংশে মহান আল্লাহ ঐ জিনিস সরবরাহ করেছেন যা তথাকার বাসিন্দার জন্যে উপযোগী। যেমন ইয়ামনে 'আসব', সাবূরে 'সাবূরী' এবং রাঈ এ 'তায়ালিসা'। আয়াতের শেষ বাক্যের ভাবার্থ এটাই। এটাও বলা হয়েছে যে, যার যা প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে তা সরবরাহ করেছেন। এ অর্থটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণঃ

واتكم من كل ما سالتموه

অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু চেয়েছো, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তার সবই দিয়েছেন।"(১৪ ঃ ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা বলি তাই হয়ে যাও, খুশী মনে অথবা বাধ্য হয়ে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আকাশকে হুকুম করা হলো সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি উদিত করার। আর যমীনকে হুকুম করা হলো পানির নহর জারী করার এবং ফল-মূল উৎপন্ন করার ইত্যাদি। উভয়েই খুশী মনে হুকুম মেনে নিতে সম্মত হয়ে গেল এবং বললোঃ 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।' কথিত আছে যে, এদুটোকে কথোপকথনকারীদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, যমীনের ঐ অংশ কথা বলেছিল যেখানে কা'বা ঘর নির্মিত হয়েছে। আর আসমানের ঐ অংশ কথা বলেছিল যা ঠিক এর উপরে রয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার না করতো তবে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হতো, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব করতো।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করে দেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলো যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে এবং ঐ শয়তানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা ঊর্ধ জগতের কিছু শুনবার উদ্দেশ্যে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং ওগুলো সব দিক হতে ঐ শয়তানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা রবিবার ও সোমবারে যমীন সৃষ্টি করেন। পাহাড় পর্বত এবং সমুদয় উপকারী বস্তুকে সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে। বুধবারে গাছ-পালা, পানি, শহর এবং আবাদী ও অনাবাদি অর্থাৎ জনপদ ও মরু প্রান্তর সৃষ্টি করেন। সুতরাং এটা হলো চার দিন।" এটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবারে তিন ঘন্টা বাকী থাকা পর্যন্ত নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র এবং ফেরেশতামণ্ডলী সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় ঘন্টায় প্রত্যেকটি জিনিসের উপর বিপদ আপতিত করেন যার থেকে লোক উপকার লাভ করে থাকে। তৃতীয় ঘন্টায় তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, তাঁকে বেহেশতে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইবলীসকে হুকুম করেন হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার এবং পরিশেষে তাকে সেখান হতে বের করে দেন।" ইয়াহূদীরা বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এরপর কি হলো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।" তারা বললোঃ "আপনি সবই ঠিক বলেছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেননি। তা হলো এই যে, অতঃপর তিনি আরাম গ্রহণ করেন।" তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ - فَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"(৫০ ঃ ৩৮-৩৯)[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মাটিকে শনিবারের দিন সৃষ্টি করেন। তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেন রবিবারে। বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন সোমবারে। অপ্রীতিকর জিনিস সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে। আলো সৃষ্টি করেন বুধবারে। জীব-জন্তু যমীনে ছড়িয়ে দেন বৃহস্পতিবারে। আর শুক্রবারের দিন আসরের এবং রাত্রির মাঝামাঝি সময়ে, দিনের শেষ ভাগে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং এভাবে সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেন।"[২]

সুতরাং,এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সর্বপ্রথম ২ দিনে জমিনকে(পৃথিবীকে) সৃষ্টি করেন। পরের দুইদিন আসমানকে সপ্তস্তরে সজ্জিত করেন। এরপর আরো দুইদিনে জমিনকে বিছানার ন্যায় সমতলে বিস্তৃত করেন, বসবাস উপযোগী করেন, পানি,গাছপালা, পর্বত স্থাপন করেন। নিকটতম (১ম)আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এরমানে তারকারাজি প্রথম নিকটতম আসমানেই রয়েছে। কিন্তু বিবর্তনবাদী অপবিজ্ঞান আমাদের শোনায়, এই তারকারা সর্বত্র আর এরা সূর্যের মত আলো দান কারী। তারকা-চন্দ্র-সূর্য নিয়ে সামনে বিস্তারিত আসছে। ইবনে আব্বাস(রাঃ) এর কাছে আগত ব্যক্তির প্রশ্ন(আসমান আগে নাকি জমিন আগে) টি অবশ্যই ভাল করে পাঠ করেছেন। তার সাথে শতভাগ ঐক্যমত পোষন করি। আর তিনি যা বর্ননা করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিকে ভ্রান্ত প্রমান করে। উমার(রাঃ) সত্য বলেছেন, ইবনে আব্বাস(রাঃ) এর কুরআনের জ্ঞানই সর্বাধিক। বর্তমানে সাহাবিদের(রাঃ) ব্যাখ্যার বিপরীতে যে যাই বলুক সবই ভ্রান্ত এবং বর্জনীয়।

ইবনু আব্বাস(রাঃ) যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, তার নির্ভুলতার দলিল মেলে নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا
তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন,

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন

[আন নাযিয়াতঃ ২৭-৩২]

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যমীনকে বিস্তৃতকরন বা সমতলায়নের কাজটি আসমানকে সপ্তস্তরে বিন্যাস্ত করবার পর করেন। আফসোসের বিষয় যে আয়াত দ্বারা রহমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জমিনকে বিস্তৃত ও সমতলভাবে বিছানোর কথা বলেন, কাফিরদের মতাদর্শের সাথে মিল রাখার জন্য এই আয়াতকেই আজকের মুসলিমরা ব্যবহার করে। তারা কাল্পনিক "গোলাকার" পৃথিবীর দলিলরূপে আন নাযিয়াতের ৩০ নং আয়াতকে ব্যবহার করে। তারা دَحَاهَا শব্দটিকে অপব্যাখ্যা করে বলে পৃথিবী উটপাখির ডিমের ন্যায়। তারা এই ডিম্বতত্ত্বটি গ্রহন করে রাশাদ খলিফা নামের নবী দাবিকারী মুর্তাদের থেকে। এর চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ আর কি হতে পারে!

The only "official" translation of the Qur'an that so far picked up on this "meaning", is the one completed in 1989 by Dr. Rashad Khalifa who is called by the title "God's messenger of the Covenant" by his followers, but otherwise generally considered a heretic by orthodox Muslims. The footnote to 79:30 states: *The Arabic "dahhaahaa" is derived from "Dahhyah" which means "egg."* The copy in my possession is the revised edition of 1992.

দাহাহা শব্দটির অর্থ বিস্তৃত করা। দাহাহা শব্দটির দূরবর্তী শব্দের অর্থটিকেও যদি গ্রহন করা হয় তবে এর দ্বারা বোঝায় উটপাখি ডিমপাড়ার জন্য অসমতল ভূমি পা দিয়ে আঁচড়ে যেভাবে বিস্তৃত করে ঐরূপ। এর সাথে ডিমের কোন সম্পর্ক নেই। উটপাখির এই কাজটিকেও যদি আয়াতের অর্থের সাথে সংযোগ করা হয়, তবে অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবী বিস্তৃত সমতল!

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহর তার তাফসিরে বলেনঃ

যারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতো না তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা যুক্তি পেশ করছেন যে, আকাশ সৃষ্টি করার চেয়ে মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহর নিকট বহুগুণে সহজ ব্যাপার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ "আসমান ও জমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন কাজ।" (৪০ ঃ ৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেনঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ـ

অর্থাৎ "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।" (৩৬ ঃ ৮১)

তিনি অত্যন্ত উঁচু, প্রশস্ত ও সমতল করে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তারপর অন্ধকার রাত্রে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। জমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। পানি এবং খাদ্যদ্রব্যও তিনি বের করেছেন। সূরা হা-মীম সাজদায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকাশের পূর্বেই জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে যমীনের বিস্তৃতিকরণ আকাশ সৃষ্টির পরে ঘটেছে। এখানে এটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক তাফসীরকার এ রকমই বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন। পাহাড় সমূহকে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। তিনি বিজ্ঞানময় এবং অভ্রান্ত ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়ালু ও পরম করুণাময়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে শুরু করে। সুতরাং তিনি তখন পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনের বুকে স্থাপন করে দেন। ফলে

যমীন স্থির ও নিশ্চল হয়ে যায়। এতে ফেরেশতামণ্ডলী খুবই বিস্মিত হন। তাঁরা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের অপেক্ষাও অধিক শক্ত অন্য কিছু আছে কি?" তিনি উত্তরে বলেন! হ্যাঁ আছে। তা হলো লোহা।" ফেরেশতাগণ পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "লোহা অপেক্ষাও কঠিনতর কিছু আছে কি?" আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে। তা হলো আগুন।" ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "আগুন অপেক্ষাও বেশী কঠিন কিছু কি আছে?" আল্লাহ তা'আলা উত্তর দেনঃ "হ্যাঁ আছে। তা হলো পানি।" তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করেন "পানির চেয়েও বেশী কঠিন কিছু আছে কি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে। তা হচ্ছে বাতাস।" তাঁরা আবারও প্রশ্ন করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষাও অধিক কঠিন কিছু কি আছে?" তিনি জবাব দেনঃ "হ্যাঁ আছে। সে হলো ঐ আদম সন্তান যে তার ডান হাতে যা খরচ (দান) করে বাম হাত তা জানতে পারে না।"[১]

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ যখন যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা কাঁপতে থাকে এবং বলতে থাকেঃ 'আপনি আমার উপর আদম (আঃ)-কে এবং তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করলেন যারা আমার উপর তাদের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করবে এবং আমার উপরে অবস্থান করে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে?' তখন আল্লাহ তা'আলা পাহাড় স্থাপন করে যমীনকে স্থির ও নিশ্চল করে দেন। তোমরা বহু সংখ্যক পাহাড় পর্বত দেখতে পাচ্ছ। আরো বহু পাহাড় তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। পর্বতরাজি স্থাপনের পর যমীনের স্থির হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনিই ছিল যেমন উট যবেহ করার পর ওর গোশত কাঁপতে থাকে এবং কিছুক্ষণ কম্পনের পর স্থির হয়ে যায়।"[২]

অর্থাৎ তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেন এবং পর্বত স্থাপনের দ্বারা স্থির ও নিশ্চল করেন। আল্লাহ আসমানকে সপ্তস্তরে বিন্যাস্ত করেন এবং নিকটতম আসমানের গায়ে নক্ষত্রদের বসিয়ে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জমিনের ন্যায় আসমানকেও স্থির রাখেন এবং সেটা ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্টে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্টে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান।(হাজ্জ্ব ৬৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা গম্বুজাকৃতির সমুন্নত ছাদকে স্বীয় অনুগ্রহে স্থির রাখেন, এবং যমীনের উপর পতন রোধ করেন। আশা করি, পাঠকদের আর কোন সন্দেহ নাই, আসমানের ব্যপারে। এই আয়াতটি আবারো বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা কস্মোলজিকে মিথ্যা প্রমান করে। এই আসমান মানে মহাশূন্য নয়। মহাশূন্য বলে বস্তুত কিছুই নেই। সবই কল্পনা। আসমান বলতে এটাই যেটা আমরা আমরা উর্ধ্বলোকে দেখতে পাই । যমীন বলতে এই আমাদের সমতলে বিছানো যমীনই, এর বাহিরে কিছু নেই। গ্রহ বলতে কল্পনা ব্যতিত কিছুই নেই।

আসমানি ছাদ যদি আল্লাহর ইচ্ছায় পতিত হয় তবে তা এই ভূপৃষ্ঠেই পড়বে। সৃষ্টির শুরুতে এটা মাটির সাথে লেগে ছিল, পরবর্তীকালে আসমানকে উর্ধ্বে স্তম্ভব্যতিত দ্বার করানোর দ্বারা মধ্যবর্তী ফাকাস্থান তৈরি করা হয়, যার ভেতর আমরা আছি। ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর পড়ে যাচ্ছে না। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের অধিবাসী সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এটা তাঁর পরম করুণার পরিচায়ক, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক লোকদের যুলুম সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কঠিন শাস্তিদাতাও বটে।" (১৩ঃ ৬)

আজকের পর্বের দ্বারা সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে সম্পূর্নভাবে প্রকাশ হয়েছে। সেই সাথে স্পষ্ট হয়েছে যাবতীয় অপব্যাখ্যা এবং অপবিজ্ঞানের বিষয়গুলো। প্রকৃত সত্য এটাই যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে জানিয়েছেন তার পবিত্র কালামের দ্বারা এবং যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাহাবীদের থেকে পাওয়া গেছে। প্রাচীন যুগের প্রকৃত জ্ঞানী আলিমগন সাহাবিদের থেকে ভিন্ন

মনগড়া তাফসিরে যান নি,যেমনটা এ যুগের আলিমদের পাওয়া যায়। গ্রীক দর্শন আরবে প্রবেশের পরবর্তী সময় থেকে সব বদলে যেতে শুরু করে। যারা কুফরি দর্শনের ব্যপারে লেখালিখি করেছেন, তাদেরও অনেকে সৃষ্টিতত্ত্বে এসে গ্রীকচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আলিমদের মধ্যে যে বা যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেসব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা বিদ্বেষ পোষন করিনা। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেসীয়ান-পিথাগোরিয়ান কস্মোলজিকে গ্রহন করেছেন তাদের ব্যপারেও সুধারনা রাখার চেষ্টা করি, আমরা মনে করি তারা নেহাৎ নিরুপায় হয়ে এমনটা করেছেন, কেননা বিজ্ঞানকেন্দ্রিক ফিতনাহ ওই যুগ থেকেই শুরু। অপবিদ্যার আগমনে, হক্ক জ্ঞানকে পিছনে ঠেলে দেওয়া শুরু হয়, ভ্রান্ত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন তত্ত্বের নাম দিয়ে। হতে পারে সমকালীন আলিম সম্প্রদায় তখন থেকেই নিরুপায় হয়ে ইল্মুল কালাম অনুযায়ী যুক্তিসিদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রেখে জিনিস গুলোকে গ্রহন এবং ইসলামিকীকরনের চেষ্টা করেছেন। গত পর্বেই দেখেছেন, ইবনু কাসির(রহঃ) জ্যোতির্বিদদের কথা ইসলামের দলিল দ্বারা খন্ডন করেছেন, হয়ত আলিমদের একটা দল এভাবে খন্ডন করে টিকতে পারেন নি বরং ইসলামের সাথে সমন্বয়ের দিকে গিয়েছেন। অথবা নেহাৎ অন্তরের ব্যাধির দরন কাফিরদের মিথ্যা ইল্ম তাদের নিকট সুশোভিত মনে হয়েছে এবং গ্রহন করেছেন। এটা আজকের যামানায় খুব সাধারন দৃশ্য। যারা এরূপ করছে, তাদেরকে দেখবেন, এ সমস্ত দলিল সমূহ তাদের সামনে পেশ করা হলে এসব বর্ননা সহীহ কিনা তা যাচাইয়ের দিকে যাবে, কারন তারা অন্তর থেকে এগুলো মানে না। এরা তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নিঃসৃত যুক্তি দ্বারা সব কিছু বুঝতে চায় এবং মানতে চায়। অথচ মূল দলিল গুলো কুরআনেই আছে। তারা এসবকে রূপক বর্ননা বলে এড়িয়ে যায়, পাশে যুক্তিনির্ভর দূরবর্তী অপব্যাখ্যার বিদ্যা এদের ভালই জানা আছে।

ওয়াআল্লাহু আ'লাম।

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

[পৃথিবী]

পর্ব-৩

গত পর্বের আলোচ্য বিষয়বস্তুর দ্বারা সত্য ও মিথ্যা উভয় সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে এবং দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে। সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্ব আর মানব ও জ্বীন শয়তানের শেখানো মিথ্যা সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে আসা পৃথিবী বা যমীনের আকৃতিগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ নিষ্প্রোয়োজন বলে মনে করি, এরপরেও কুরআন সুন্নাহে যমীনের ব্যপারে যেসমস্ত তথ্য আছে সেসব উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি, এ নিয়েই আজকের পর্ব।

পৃথিবী কি শূন্য স্পিরিট লেভেলে সমতল? আমরা যমীনের ব্যপারে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আর্টিকেলেই "সমতল" শব্দটি ব্যবহার করি। অথচ পৃথিবী বন্ধুরতা বিহীন একদম সমতল নয়। সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পাহাড় পর্বত, মালভূমি, মরুভূমির দরুন পৃথিবীর আকৃতিকে একদম সমতল বলা যায় না, বরং পৃথিবীর আকৃতির প্রকৃতির জন্য উত্তম শব্দ হবে- সমতলে বিছানো, বিস্তৃত প্রশস্ত বিছানা বা শয্যা। এই সামান্য বক্রতা বা বন্ধুরতা খুব শীঘ্রই বিলীন করা হবে, ঐদিন যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। আসমান সমূহকে ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং দস্তরখানার ন্যায় গুটিয়ে নেওয়া হবে,পাহাড় সমূহ ধূলিকণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হবে। ওইদিন যমীনে বন্ধুরতা বা উঁচুনিচু বলে কিছুই থাকবে না। সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে। বিশ্বাসীরা মাটিকে শুভ্র রুটির ন্যায় পাবে।

আমরা শুধুমাত্র বর্তমানে কাফির ও শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্র নির্ভর বিদ্যা উৎসারিত বিকল্প কুফরি কস্মোজেনেসিসের স্ফেরিক্যাল(গোলাকার) হেলিওসেন্ট্রিক পৃথিবীর সাথে চরম পার্থক্য দ্বার করাতে সমতলে বিস্তৃত শয্যাক্ষেত্র না বলে সরাসরি 'সমতল পৃথিবী' বলে থাকি। প্রাচীন বিজ্ঞ

মুফাসসীরীনের কেউ কেউ আমাদের ন্যায় এরূপ বলেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পৃথিবীর আকৃতি ও সৃষ্টিগত ব্যাপারে একেবারে সহজ এবং নির্ভুল সত্য শব্দগুলোকেই ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে যমীনকে বিছানা সদৃশ বলেছেন এবং বলেছেন একে তিনি সমতলে বিছিয়েছেন। এবং বিচার দিবসে এই যমীনের উপর বন্ধুরতা সৃষ্টিকারী পর্বতগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবেন, ওইরূপ সমতলতা সৃষ্টি করবেন, যাতে কেউ আড়াল করবার সামান্য কিছুও পাবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। [২:২২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা الذى جعل لكم الارض فراشا-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো এমন শয্যা যার উপর তারা বিচরণ করে, আর তা হলো শয্যা ও অবস্থান ক্ষেত্র।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি الذى جعل لكم الارض فراشا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদের জন্য শয্যা স্বরূপ করেছেন।

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি الذى جعل لكم الارض فراشا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ শয্যা।

আল্লাহ বলেনঃ

وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু

সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।(১৫:১৯)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى
তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।(২০:৫৩)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।(৪৩:১০)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি(৫০:০৭)

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কতইনা সুন্দর বিছানা প্রস্তুতকারী!(৫১:৪৮)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন বিছানা।(৭১:১৯)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
আমি কি করিনি যমীনকে বিছানা (৭৮:৬)

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।(৭৯:৩০)

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর(৯১:৬)

উপরিউক্ত আয়াত সমূহে ব্যবহৃত فِرٰشًا مَدَدْ بِسَاطًا دَحَىٰهَآ শব্দ গুলো দ্বারা বিছানো, বিস্তৃতকরন, ছড়ানো, প্রশস্তকরন, কার্পেট বা বিছানার ন্যায় বিস্তৃত করা বোঝায়। আসমান সৃষ্টির পূর্বের unformed যমীনকে পানির উপর সমতলে কার্পেটের ন্যায় বিছানো হয়। এরপর এর উপর গম্বুজের ন্যায় সাত আসমানকে স্থাপন করা হয়(আসমানের ব্যপারে সামনের পর্বগুলোতে দলিলের ইমারত আসছে ইনশাআল্লাহ)। যেহেতু এই যমীনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান সৃষ্টির পূর্বে করেছেন সুতরাং প্রচলিত মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ভ্রান্ত কথার নূন্যতম গ্রহনযোগ্যতার স্থানটিকেও হারায়। এর দ্বারা বিগব্যাং ও হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থের প্লুরালিস্টিক কস্মোলজি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়। এমতাবস্থায়, সমতল পৃথিবীর ব্যপারটি গোলাকার তত্ত্বের পাশে রেখে তুলনামূলক আলোচনাও করা উচিত নয়, যেহেতু এর পুরো গ্রাউন্ডই ভুয়া। আপনি যদি বিজ্ঞানপন্থী হন, কোনভাবে মানবেন যে, এই কথিত গোল দুনিয়া, বিগব্যাং এর দ্বারা মহাশূন্য সৃষ্টি হবার আগেই অস্তিত্ব ছিল!? কখনোই মানতে চাইবেন না, এজন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে হক্ক ও বাতিলের সমন্বয়ের কথা ভাবেন, কিন্তু কুরআন হাদিসের যে অকাট্য দলিল গুলো সেটার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, সেগুলোকে গোপন করেন! যেটা সত্য, সেটাকে আজ অধিকাংশ মানুষই অবিশ্বাস করে,অথচ এটাই সত্য।

৭৯:৩০ আয়াতের যে শব্দটি দ্বারা নব্যুয়তের দাবিদার এক কাফির যেভাবে দুনিয়াকে উটপাখির ডিম বানিয়েছে সে আয়াতের ব্যাখ্যাতেই আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি(রহঃ) বলেনঃ

and after that He spread out the earth
He made it flat *for it had been created before the heaven but without having been spread out;*

Al-Jalalayn-79:30

Tanwir Al Miqbas এ,

(And after that He spread the earth) even then He spread it on the water ; it is also said: 2,000 years after that He spread it on the water,

_[79:30]_

অর্থাৎ যে আয়াত ধরে আজকের মানুষ অপব্যাখ্যা করে যমীনকে গোল বলছে, সে আয়াতের ব্যাখ্যাতেই প্রাচীন মুফাসসীরগন যমীনকে সমতল বলেছেন। সুতরাং অপব্যাখ্যার প্রকৃতি কতটা

ভয়াবহ তা অনুধাবন করতে পারছেন। দাহাহা সংক্রান্ত আলোচনা গতপর্বেই শেষ হয়েছে।
উপরিউক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির(রহঃ) বলেনঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ـ وَ الاَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَهِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আসমানকে আমি প্রশস্ততা সম্পন্ন করে সৃষ্টিকারী। আর জমীনকে **আমি বিছিয়ে** দিয়েছি এবং আমি কতইনা উত্তমরূপে বিছিয়ে থাকি।" (৫১ ঃ ৪৭-৪৮) এখানে বলা হয়েছেঃ জমীনের, ওকে সমতলকরণের, ওর বিছানোর, ওকে প্রশস্তকরণের, ওর বন্টনের এবং ওর মধ্যকার সৃষ্ট জীবসমূহের শপথ। এর তাফসীরে একে প্রশস্তকরণের উক্তিটিই বেশী প্রসিদ্ধ। ভাষাবিদদের নিকটেও এটাই পরিচিত। জাওহারী (রঃ) বলেন যে, طَحَوْنَهٗ শব্দটি دَحَوْنَهٗ শব্দের মত, যার অর্থ হলো বিস্তৃত করা। অধিকাংশ তাফসীরকারের উক্তি এটাই।

আকাশের উচ্চতা জমীন হতে কিরূপ! যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ـ

অর্থাৎ "তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি, আর তাতে কোন ফাটল নেই?" (৫০ ঃ ৬)

এরপর বলা হচ্ছেঃ আর তারা কি দৃষ্টিপাত করে না পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে আমি ওটাকে স্থাপন করেছি? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে এমনভাবে মাটির বুকে প্রোথিত করে দিয়েছেন, যাতে জমিন নড়াচড়া করতে না পারে। আর পর্বতও যেন অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম না হয়। তারপর পৃথিবীতে যেসব উপকারী কল্যাণকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেদিকেও মানুষের দৃষ্টিপাত করা উচিত। আর জমিনের দিকে তাকালে তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ওটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন!

বলেনঃ 'আমি কি ভূমিকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?' অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টজীবের জন্যে এই ভূমিকে কি সমতল করে বিছিয়ে দিইনি? এই ভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নীরবে পড়ে রয়েছে। আর পাহাড়কে আমি এই ভূমির জন্যে পেরেক বা কীলক করেছি যাতে এটা হেলাদোলা না করতে পারে এবং ওর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত সাওরী (রঃ) এবং আরো বহু তাফসীরকার একথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। আমি মহাসম্প্রসারণকারী। আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, বিনা স্তম্ভে ওকে দাঁড় করে রেখেছি এবং প্রতিষ্ঠিত করেছি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্যে বিছানা বানিয়েছি। আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলা-দোলা না করে । কেননা, যমীন চতুর্দিক হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। আর আমি ওতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ـ

অর্থাৎ “প্রত্যেক জিনিসকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর।”(৫১ ঃ ৪৯)

অতঃপর মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আসমান, যমীন এবং এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার আরো বহু নিদর্শন রয়েছে, এগুলো আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা এবং ওতে করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার। অর্থাৎ যমীনকে আমি স্থির ও মযবূত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করতে পার এবং শুতে ও জাগতে পার। অথচ স্বয়ং এ যমীন পানির উপর রয়েছে, কিন্তু মযবূত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে হেলা-দোলা ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে। এতে রাস্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছে

এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ ও তাঁর উলুহিয়্যাতের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের দিকে টেনে এনেছেন, তিনিই প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত দান করেছেন, তিনিই যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং আকাশকে ছাদ করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ 'আমি আকাশকে নিরাপদ চাঁদোয়া বা ছাদ বানিয়েছি এবং এতদসত্ত্বেও তারা নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আকাশ হতে বারিধারা বর্ষণ করার অর্থ হচ্ছে মেঘমালা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করা এমন সময়ে যখন মানুষ ও পূর্ণ মুখাপেক্ষী থাকে। অতঃপর ঐ পানি থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল উৎপন্ন করা, যা থেকে মানুষ এবং জীবজন্তু উপকৃত হয়। যেমন কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এর বর্ণনা এসেছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন,

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পৃথিবীর আকৃতিগত সমতলতা আরো স্পষ্ট করে প্রকাশ করে বলেনঃ

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?(৮৮:২০)

আরবি سَطَّحَ শব্দটির অর্থ কোন কিছুকে সমতল বিছানো। এর দ্বারা জিওমেট্রিক ফ্ল্যাটনেসকে বোঝানো হয়।

আল-গাশিয়াহ ৮৮:২০:৪

মূল سطح

সুতিহাতের মূল হচ্ছে সাতাহা, অর্থাৎ সমতল।

পূর্ববর্তী আয়াত গুলোতে যমীনকে বিছানোর কথা, বিস্তৃত ও প্রশস্ত করার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন। এবং এ আয়াতে বিস্তৃতকরন, প্রশস্তকরন বিছাবার প্রকৃতির ব্যপারে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

আরবিতে,

পৃথিবী সমতল=الارض المسطح

যেমনটা ট্রান্সলেটরেও দেখছেন।
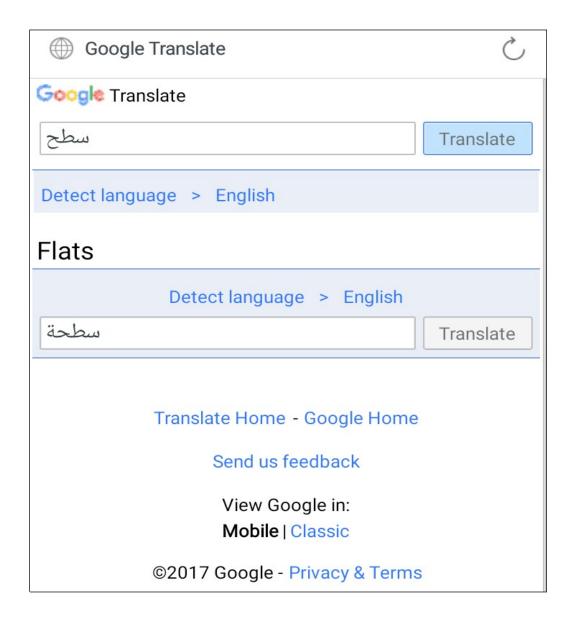
আরব সমতল বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বাসীরা তাদের গ্রুপের নাম দিয়েছে مجتمع الارض المسطحة [ক]। সাধারন আরবিভাষী মুসলিমদের মধ্যে যারা পশ্চিমা কাফির মুশরিকদের আকিদাকে ইসলামাইজ করতে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদেরকে মোটেও ভাল চোখে দেখা হয় না। আমাদের মত অনারব ভাষাভাষীদের মধ্যে ওইরূপ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের মুসলিমদেরকে বেশ আধুনিক, প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাবান হিসেবে দেখা হয়, আরবিভাষীদের মধ্যে ব্যপারটি উলটো। কারন ওরা ভাল করেই জানে কুরআনে কি আছে, ওরা সে ভাষাতেই কথা বলে, এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আরবিভাষীদের মধ্যে যারা ওইরূপ আকিদা রাখে তাদের মধ্যে নড়বড়ে থিওলজিক্যাল বিশ্বাসগত অবস্থান দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদেরকে এগনস্টিক হিসেবে পাওয়া যায়। ওরা যেহেতু পাশ্চাত্যের শিক্ষা দ্বারা ব্রেইনওয়াশড এজন্য কুরআনের উপর বিশ্বাস আনতে পারে না। অর্থাৎ ওদের মধ্যে হক্ব বাতিলের সীমানা আযমদের চেয়ে স্পষ্ট।

অপব্যাখ্যাকারীরা এরূপ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে যে এ আয়াতে আল্লাহ কোন ক্ষুদ্র জমির অংশ, কোন ছোট অঞ্চল বা ভূখণ্ড অথবা দেশকে বুঝিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী এবং এ আয়াতসমূহে কালেক্টিভভাবে গোটা আসমান ও যমীনকে নির্দেশ করে বলা। কিন্তু তাদের (অপ)ব্যাখ্যা অনুযায়ী যেহেতু যমীনের ক্ষুদ্র অংশের কথা বলা হয় সেরূপে আসমান নির্দেশক শব্দের দ্বারাও আসমানের ক্ষুদ্র অংশের কথা বোঝানোর কথা!!!

অপব্যাখ্যাকারীদের উদ্দেশ্য মেইনস্ট্রিম পাশ্চাত্যের আকিদার সাথে মেলানো, এজন্য যদি সুস্পষ্ট বিকৃত কিছুও বানিয়ে ফেলে, তাতেও তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই।

চলুন, এবার দেখা যাক প্রাচীন বরেণ্য মুফাসসীরীনের থেকে কি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সূরা গাশিয়াহর ২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

অনুবাদ :

১৭. তারা কি দৃষ্টিপাত করে না, অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ, উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে দেখা উষ্ট্রের প্রতি, কিরূপে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮. আর আকাশের দিকে, কিরূপে তাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

১৯. আর পর্বতমালার প্রতি, কিরূপে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

২০. আর ভূতলের দিকে কিরূপে তাকে সমতল করা হয়েছে? সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সারকথা, এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কুদরত ও একত্বের প্রতি ঈমান আনাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সর্বপ্রথম উষ্ট্রের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এটা তাদের সাথে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক সম্পৃক্ত। سُطِحَتْ শব্দ দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সমতল। শরিয়তের আলিমগণের মতও এটাই, ভূতত্ত্ববিদদের মতানুরূপ গোলাকার নয়।

কথিত[খ] ইবনে আব্বাস(রাঃ) এর তাফসীরে পাওয়া যায়ঃ

(Allah it is Who hath created seven heavens) one above the other like a dome, (and of the earth the like thereof) seven earths but they are flat. *(The commandment cometh down among them slowly) He says: He sends the angels down from heaven with revelation, Scripture and calamities, (that ye may know) and acknowledge (that Allah is Able to do all things) relating to the dwellers of the heavens and the earths, (and that Allah surroundeth all things in knowledge) and that His knowledge encompasses everything'. And of the surah in which Banning is mentioned, which is all Medinan and consists of 13 verses, 249 words*
and 1,060 letters

[৬৫:১২]

অর্থাৎ যেটা আমরা বলে থাকি, সেটাই বলা হচ্ছে। সাতটি যমীন সমতল একের উপর আরেকটি। আর আসমানগুলো একটির উপর আরেকটি গম্বুজের ন্যায় সাতটি ছাদ।
আর আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি(রঃ) তো ৮৮:২০ এর ব্যাখ্যায় খুবই স্পষ্ট বলে দিলেন, ইল্মুল হায়া'গন যেরূপ বলে থাকেন যে যমীন গোলাকার, ওইরূপ নয়। বরং ইসলামী শরীয়াহ পৃথিবী সমতল। তিনি এও বলেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের(Ahl Al-hay'a) যারা বলে এটি গোলাকার তা নিতান্তই ভুল।

﴿سورة الغاشية﴾

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

﴿٤﴾ ﴿تصلى﴾ بفتح التاء وضمها ﴿ناراً حامية﴾. ﴿٥﴾ ﴿تسقى من عين آنية﴾ شديدة الحرارة. ﴿٦﴾ ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع﴾ هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه. ﴿٧﴾ ﴿لا يسمن ولا يغني من جوع﴾. ﴿٨﴾ ﴿وجوه يومئذ ناعمة﴾ حسنة. ﴿٩﴾ ﴿لسعيها﴾ في الدنيا بالطاعة ﴿راضية﴾ في الآخرة لما رأت ثوابه. ﴿١٠﴾ ﴿في جنة عالية﴾ حساً ومعنى. ﴿١١﴾ ﴿لا يسمع﴾ بالياء والتاء ﴿فيها لاغية﴾ أي نفس ذات لغو: هذيان من الكلام. ﴿١٢﴾ ﴿فيها عين جارية﴾ بالماء بمعنى عيون. ﴿١٣﴾ ﴿فيها سرر مرفوعة﴾ ذاتاً وقدراً وعلاً. ﴿١٤﴾ ﴿وأكواب﴾ أقداح لا عرا لها ﴿موضوعة﴾ على حافات العيون معدة لشربهم. ﴿١٥﴾ ﴿ونمارق﴾ وسائد ﴿مصفوفة﴾ بعضها بجنب بعض يستند إليها. ﴿١٦﴾ ﴿وزرابيُّ﴾ بسط طنافس لها خمل ﴿مبثوثة﴾ مبسوطة.
﴿١٧﴾ ﴿أفلا ينظرون﴾ أي كفار مكة نظر اعتبار ﴿إلى الإبل كيف خُلقت﴾.
﴿١٨﴾ ﴿وإلى السماء كيف رُفعت﴾. ﴿١٩﴾ ﴿وإلى الجبال كيف نُصبت﴾. ﴿٢٠﴾ ﴿وإلى الأرض كيف سُطحت﴾ أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته، وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها، وقوله: سُطحت ظاهر في أن الأرض سطح، وعليه علماء الشرع، لا كرة كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقض ركناً من أركان الشرع. ﴿٢١﴾ ﴿فذكر﴾ هم نعم الله ودلائل توحيده ﴿إنما أنت مذكر﴾.
﴿٢٢﴾ ﴿لست عليهم بمصيطر﴾ وفي قراءة بالسين بدل الصاد، أي بمسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد.
﴿٢٣﴾ ﴿إلا﴾ لكن ﴿من تولى﴾ أعرض عن الإيمان ﴿وكفر﴾ بالقرآن. ﴿٢٤﴾ ﴿فيعذبه الله العذاب الأكبر﴾ عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. ﴿٢٥﴾ ﴿إن إلينا إيابهم﴾ رجوعهم بعد الموت. ﴿٢٦﴾ ﴿ثم إن علينا حسابهم﴾ جزاءهم لا نتركه أبداً.

﴿سورة المدثر﴾

أسباب نزول الآية ١ أخرج الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فلم أر أحداً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرجعت فقلت: فأنزل الله ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾.

أسباب نزول الآية ١-٧ وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر وقال بعضهم: ليس بساحر وقال بعضهم: كاهن وقال بعضهم ليس بكاهن وقال =

(١٧) ﴿والله أنبتكم﴾ خلقكم ﴿من الأرض﴾ إذ خلق أباكم آدم منها ﴿نباتاً﴾. (١٨) ﴿ثم يعيدكم فيها﴾ مقبورين ﴿ويخرجكم﴾ للبعث ﴿إخراجاً﴾. (١٩) ﴿والله جعل لكم الأرض بساطاً﴾ مبسوطة (٢٠) ﴿لتسلكوا منها سبلاً﴾ طرقاً ﴿فجاجاً﴾ واسعة. (٢١) ﴿قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا﴾ أي السفلة والفقراء ﴿من لم يزده ماله وَوُلْدُهُ﴾ وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك، وولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحها، والأول قيل جمع ولد بفتحها كخشب وخشب وقيل بمعناه كبخل وبخل ﴿إلا خساراً﴾ طغياناً وكفراً. (٢٢) ﴿ومكروا﴾ أي الرؤساء ﴿مكراً كبّاراً﴾ عظيماً جداً بأن كذبوا نوحاً وآذوه ومن اتبعه.

ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا۟ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى وَٱتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَـٰلًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ

(٢٣) ﴿وقالوا﴾ للسفلة ﴿لا تذرُنَّ آلهتكم ولا تذرن وداً﴾ بفتح الواو وضمها ﴿ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً﴾ هي أسماء أصنامهم. (٢٤) ﴿وقد أضلوا﴾ بها ﴿كثيراً﴾ من الناس بأن أمروهم بعبادتهم ﴿ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً﴾ عطفاً على قد أضلوا دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. (٢٥) ﴿مما﴾ ما صلة ﴿خطاياهم﴾ وفي قراءة خطيئاتهم بالهمز ﴿أغرقوا﴾ بالطوفان ﴿فأدخلوا ناراً﴾ عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء ﴿فلم يجدوا لهم من دون﴾ أي غير ﴿الله أنصاراً﴾ يمنعون عنهم العذاب. (٢٦) ﴿وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً﴾ أي نازل دار، والمعنى أحداً. (٢٧) ﴿إنك إن تذرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً﴾ من يفجر ويكفر، قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه. (٢٨) ﴿رب اغفر لي ولوالديّ﴾ وكانا مؤمنين ﴿ولمن دخل بيتي﴾ منزلي أو مسجدي ﴿مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات﴾ إلى يوم القيامة ﴿ولا تزد الظالمين إلا تباراً﴾ هلاكاً فأهلكوا.

أسباب نزول الآية ١١ وأخرج عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ قال المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين فنزلت ﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾.

﴿سورة الجمعة﴾

أسباب نزول الآية ١١ أخرج الشيخان عن جابر قال: كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها-

ইবনে জারীর তাবারি(রহঃ) বলেন,

نعمةً مِن اللَّهِ ، وبُلْغةَ الأجلِ[١] .

وقولُه : ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ . يقولُ : وإلى الأرضِ كيف بُسِطَت . يقالُ : جبلٌ مُسَطَّحٌ : إذا كان فى أعلاه استواءٌ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

/ ذكرُ مَن قال ذلك

١٦٦/٣٠

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ : ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ . أى : بُسِطت . يقولُ : أليس الذى خلَق هذا بقادرٍ على أن يخلُقَ ما أراد فى الجنةِ ؟[١]

[١٠٩٦/٢ظ] **القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى** : ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾ ﴾ .

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ ﷺ : ﴿ فَذَكِّرْ ﴾ يا محمدُ عبادى بآياتى ، وعِظْهم بحججى ، وبلِّغْهم رسالتى ، ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ . يقولُ : إنما أرسَلْتُك إليهم مذكِّرًا ؛ لتذكِّرَهم نِعَمى عندَهم ، وتعرِّفَهم اللازمَ لهم ، وتعِظَهم .

وقولُه : ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ . يقولُ : لستَ عليهم بمسلَّطٍ ، ولا أنت بجبارٍ تحمِلُهم على ما تريدُ . يقولُ : كِلْهم إلىَّ ، ودَعْهم وحُكْمى فيهم . يقال : قد تَسيطَرَ فلانٌ على قومِه . إذا تسلَّط عليهم .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

---

(١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦/٣٤٣ إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم .

لكم الأرضَ بساطًا تَسْتَقِرُّون عليها وتَمْتَهِدونها .

وقولُه : ﴿ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ . يقولُ : لتَسلُكوا منها طرقًا شِعابًا[1] متفرِّقةً . والفِجاجُ جمعُ فجٍّ ، وهو الطريقُ .

وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ .

ذكرُ مَن قال ذلك [٢/١٠١١ظ]

حدَّثنا بشرٌ ، قال : ثنا يزيدُ ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ قولَه : ﴿ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ . قال : طُرُقًا وأعلامًا .

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى ، قال : ثنا ابنُ ثورٍ ، عن معمرٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ . قال : طرقًا[2] .

/حدَّثنى علىٌّ ، قال : ثنا أبو صالحٍ ، قال : ثنى معاويةُ ، عن علىٍّ ، عن ابنِ عباسٍ ٩٨/٢٩ قولَه : ﴿ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ . يقولُ : طرقًا مختلفةً[3] .

وقولُه : ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾ . [4]يقولُ تعالى ذكرُه : قال نوحٌ : ربِّ إن قومى عَصَوْنى[4] ، فخالَفوا أمرى ، وردُّوا علىَّ ما دعَوْتُهم إليه من الهدَى والرَّشادِ ، ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴾ . يقولُ : واتَّبَعوا فى معصيتِهم إياى مَن دعاهم إلى ذلك ممن كثُر مالُه وولدُه فلم يَزِدْه كثرةُ مالِه وولدِه إلا خَسارًا وبُعدًا من اللهِ ، وذَهابًا عن مَحَجَّةِ الطريقِ .

واختلَفَت القرأةُ فى قراءةِ قولِه : ﴿ وَوَلَدُهُ ﴾ ؛ فقرَأته عامةُ قرأةِ المدينةِ :

---

(1) فى م : « صعابا » .

(2) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٢/٣١٩ عن معمر به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦/٢٦٩ إلى عبد بن حميد .

(3) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى الإتقان ٢/٥٠ - من طريق أبى صالح به ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٦/٢٦٩ إلى ابن المنذر .

(٤ - ٤) سقط من : م .

ইমাম কুরতুবি তার তাফসিরে বলেনঃ

« أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ » قال أبو السعود : استئناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية ، وماهو مبنى عليه من البعث الذى هم فيه مختلفون، بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره . والهمزة للإنكار والتوبيخ . والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام . وكلمة (كيف) منصوبة بما بعدها ، معلقة لفعل النظر . والجملة فى حيز الجر على أنها بدل اشتمال من (الإبل) أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ، ويستبعدون وقوعه من قدرة الله عز وجل ، فلا ينظرون إلى الإبل التى هى نصب أعينهم يستعملونها كل حين ، إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعاً معدولًا به عن سنن خلقة سائر أنواع الحيوانات ، فى عظم جثتها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة بتأتى مايصدر عنها من الأفاعيل الشاقة، كالنوء بالأوقار الثقيلة وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة. وفى صبرها على الجوع والعطش، حتى أن أظماءها لتبلغ العشر فصاعداً . واكتفائها باليسير ، ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وشجر وغير ذلك ، مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم . وفى انقيادها مع ذلك للإنسان فى الحركة والسكون والبروك والنهوض ، حيث يستعملها فى ذلك كيفما يشاء ، ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير « وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ » التى يشاهدونها كل لحظة بالليل والنهار « كَيْفَ رُفِعَتْ » أى رفعت كواكبها رفعاً سحيق المدى، وأمسك كل منها فى مداره إمساكاً لا يختل سيره ولا يفسد نظامه « وَإِلَى ٱلْجِبَالِ » أى التى ينزلون فى أقطارها « كَيْفَ نُصِبَتْ » أى أقيمت منتصبة لا تبرح مكانها ، حفظاً للأرض من الميدان « وَإِلَى ٱلْأَرْضِ » أى التى يضربون فيها ويتقلبون عليها « كَيْفَ سُطِحَتْ » أى بسطت ومهدت ، حسبما يقتضيه صلاح أمور ما عليها من الخلائق .

قال الزمخشرىّ : والمعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق ، حتى لا ينكروا اقتداره على البعث ، فيسمعوا إنذار الرسول ﷺ ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه .

لطيفة :

ذكر السكاكىّ فى (المفتاح) فى بحث الجامع الخيالىّ ؛ أن جمعه على مجرى الإلف والعادة

তাফসির আতিয়্যাহ তে 88:20 এর ব্যাখ্যায় এসেছে,

"আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল বলেন بساطا অর্থাত বিছানো। যা জমীনকে সমতল বুঝায়, গোলাকার নয়। যদি গোলাকার হত তবে পানি জমিনে লেগে থাকত না। এছাড়াও سبل পথ এবং فجاج অর্থ প্রশস্ত বুঝায় যা সমতল জমীন নির্দেশ করে। (তাফসীর নূহ)

হারুন রাশীদ سطحت কে ط এর উপর তাশদীদ দিয়ে পড়েছেন, এবং এটাও সঠিক নিয়ম, যা আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যায় জমীন سطح /مسطوحة (সমতল)"

وقيل: هو جمع « طبق » ، وهو نعت لـ « سَبْع » ، وقرأ ابن أبي عبلة : [طباقٍ] بالخفض على النعت لـ[سَمَوات] ، وقوله تعالى : (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً) ساغ ذلك لأن القمر من حيث هو في إحداها فهو في الجميع ، ويُروى أن القمر في السماء الدنيا ، وقال عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم : إن الشمس والقمر أقفاؤهما إلى الأرض وإقبال نورهما وارتفاعه في السماء ، وهذا الذي تقتضيه لفظة السراج ، وقيل : إن الشمس في السماء الخامسة ، وقيل : في الرابعة ، وقال عبد الله ابن عمرو : هي في الشتاء في الرابعة ، وفي الصيف في السابعة .

وقوله تعالى : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً) استعارة ، من حيث أخذ آدم عليه السلام من الأرض ثم صار الجميع نَابتاً منه ، وقوله : [نَباتاً] مصدر جار على غير المصدر ، والتقدير : فَنَبَتُّم نباتاً ، و « الإعادة فيها » هي بالدفن فيها الذي هو عُرف البشر ، و « الإخراجُ » هو بالبعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء .

وقوله تعالى : [بِسَاطاً] يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة وغير كُرويّةٍ ، واعتقاد أحد الأمرين غير قادح في الشرع بنفسه اللهم إلاَّ أن يتركب على

= ماؤُها متفرقاً ، والتوَطّف : القُرْب من الأرض مع كثرة الماء ، فالسحابة التي ينزل منها المطر قريبة من الأرض وغزيرة الماء ، وطَبّق الأرض : عمها وشملها كلها ، وتحرّى : تقصد حِراهم وهو الفناء ، ومعنى تَدِر : تعتمد المكان وتثبت فيه .

القول بالكرويَّة نظر فاسدٌ ، وأما اعتقاد كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى ، وهو الذي لا يلحق عنه فساد البَتَّةَ ، واستدل ابن مجاهد على صحة ذلك بماء البحر المحيط بالمعمور فقال : لو كانت الأرض كرويَّة لما استقر الماءُ عليها . و « السُّبُلُ » : الطُّرق ، و « الفجاجُ » : الواسعة .

قوله عزَّ وجلَّ :

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ ﴾

المعنى : فلما لم يطيعوا ويئس نوح عليه السلام من إيمانهم قال نوح : ربِّ إنهم عصوني واتَّبعوا أشرافهم وغُواتهم ، فعبَّر عنهم بأن أموالهم وأولادهم زادتهم خساراً ، أيْ خُسرانا .

وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، ونافع ـ في رواية خارجة عنه ـ : [وَوُلْدُهُ] بضم الواو وسكون اللام ، وهي قراءة ابن الزبير ، والحسن ، والأعرج ، والنخعي ، ومجاهد . وقرأ نافع ، وعاصم ، وابن عامر : [وَوَلَدُهُ] بفتح الواو واللام وهما بمعنى واحد كبُخلْ وبَخَل ، وهي

[خُلِقَتْ] بفتح القاف وضم الخاء ، وقرأ علي بن أبي طالب : [خَلَقْت] بفتح الخاء وسكون القاف ، على فعل المتكلم ، وكذلك (رَفَعْتُ ، و نَصَبْتُ ، وسَطَحْتُ) ، وقرأ أبو حيوة : (رُفِّعَتْ ، وَنُصِّبَتْ ، وَسُطِّحَتْ) بالتشديد فيها . و [نُصِبَتْ] معناه : أُثْبتت قائمة في الهواء لا تنبطح ، وقرأ الجمهور : [سُطِحَتْ] بتخفيف الطاء ، وقرأ هارون الرشيد : [سُطِّحَتْ] بشد الطاء على المبالغة ، وهي قراءة الحسن . وظاهر هذه الآية أن الأَرض سَطْحٌ لا كُرَة ، وهو الذي عليه أهل العلم ، والقول بكريتها – وإن كان لا ينقض ركنا من أركان الشرع – فهو قول لا يُثبته علماءُ الشرع[1] .

ثم أمر الله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بهذه الآيات ونحوها . ثم نفى تعالى أن يكون مسيطراً على الناس ، أي قاهراً مُخْبِراً لهم مع تكبُّر متسلطاً عليهم ، يقال : تسيطر علينا فلان ، وقرأ بعض الناس : [بِمُسَيْطِرٍ] بالسين ، وبعضهم [بمُصَيْطِرٍ] بالصاد ، وقرأ هارون : [بمُسَيْطَر] بفتح الطاء ، وهي لغة تميم ، وليس في كلام العرب

(١) كان هذا في عصره ، أما الآن فلا يُقبل هذا الفهم ، ومعنى الآية لا يتعارض مع الحقائق والواقع ، فالأرض مسطوحة أمام العين فقط ، ولم تتعرض الآية لكرويتها أو انبساطها من أولها إلى آخرها ، والقرآن الكريم يقول في آية أخرى : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) .

সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যে সমতল পৃথিবীর কথা বলি এটা আমাদের মনগড়া কিছু নয়। বরং সুস্পষ্টভাবে দেখছেন, আমাদের সপক্ষে আছে কুরআন-হাদিস, সমগ্র সাহাবীগন এবং হাফেজ ইবনে কাসির(রহঃ), ইমাম আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারি(রহঃ), মুজাহিদ(রহঃ),কাতাদা(রহঃ), ইবনে মুয়াবিয়্যাহ(রহঃ), জালালুদ্দিন সুয়ূতি(রহঃ), ইমাম কুরতুবির(রহঃ) মত প্রাচীন জগৎশ্রেষ্ঠ আলিম ও মুফাসসীর।আমরা ঠিক ১৪০০ বছর আগের সাহাবিদের আকিদাই আবারো পুনরুজ্জীবিত করছি এবং সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে কাফিরদের বিশ্বাস বা আকিদাকে ভ্রান্ত এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করছি। যেখানে আমাদের পাশে স্বয়ং রহমানের সুস্পষ্ট আয়াত গুলো এবং সাহাবা আজমাঈনের বিশ্বাস বা আকিদার বর্ননা আমাদের কাছে আছে, সেখানে তাদের মতের বিপরীতের যেকোন লোকের মতামতই আমাদের কাছে মূল্যহীন এবং সেসব নূন্যতম মূল্যায়ন ও জাস্টিফিকেশানের যোগ্যতা রাখে না,যেহেতু কাফিরদের বিশ্বাস বা আকিদাগুলো আমরা ইসলামের সাথে সমন্বয় করতে পারিনা। যদি অন্তরের রোগ বিহীন কোন আল্লাহ ভীরু ব্যক্তির সম্মুখে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত কুরআন সুন্নাহর দলিল, আসার ও প্রাচীন আলিম-মুফাসসীরীনের ব্যাখ্যা গুলো রাখা হয়, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সাথে এ বিষয়ে দ্বিমত করবেন নাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যমীনকে পানির উপর রেখেছেন,প্রত্যেক যমীনের নিচে পানির সুবিশাল স্তর বা সাগর, এর নিচে আরেকটা যমীন। এভাবে মোট সাতটা। আর সাতটি যমীন একের নিচে আরেকটা দ্বীপের ন্যায়।

> *According to Muhammad b. Sahl b. 'Askar-Isma'il b. 'Abd al-Karim-Wahb, mentioning some of his majesty (as being described as follows): The heavens and the earth and the oceans are in the haykal , and the haykal is in the Footstool. God's feet are upon the Footstool. He carries the Footstool. It became like a sandal on His feet. When Wahb was asked: What is the haykal ? He replied: Something on the heavens' extremities that surrounds the earth and the oceans like ropes that are used to fasten a tent. And when Wahb was asked how earths are (constituted), he replied: **They are seven earths that are flat and islands**. Between each two earths,*

> *there is an ocean . All that is surrounded by the (surrounding) ocean, and the haykal is behind the ocean. (Ibid., pp. 207-208; bold emphasis ours)*

[ইবনে জারির তাবারীর ইতিহাস]

Tanwir al Miqbas এর 88:20 এর ব্যাখ্যায় এসেছে,

(And the earth, how it is spread) ***over water?*** *All these are signs for them*
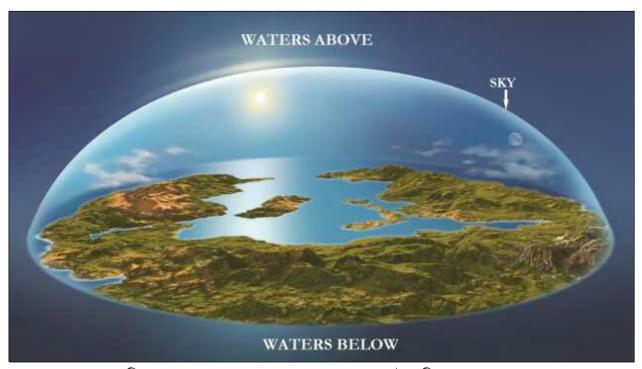
সুতরাং এরপরেও কি আর কোন সংশয় থাকতে পারে? সুস্পষ্ট দলিল দেখছেন, যেখানে আমাদের পৃথিবী এবং অন্য ছয় যমীনকে সরাসরি সমতল এবং আরো স্পষ্ট ভাবে বোঝাবার জন্য দ্বীপসদৃশ বলা হচ্ছে।আমরা জানি, কিছুলোককে যত কিছুই দেখানো হোক না কেন, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না কারন সে আন্তরিকভাবে কাফিরদের মিথ্যা তত্ত্বকে অন্তরে গেঁথে নিয়েছে। আমরা জানি এসমস্ত দলিল তাদেরকে বিচলিত করে, তাদের যদি সুযোগ থাকতো তাহলে কুরআনের আয়াতগুলোকেও কাটছাঁট করে সংযোজন বিয়োজন করে নিত(নাউজুবিল্লাহ), এই কাজটিই করেছিল মুর্তাদ ভন্ড নবী রাশাদ খলিফা। সে কুরআনকে কাটছাঁট করে নিজের মত করে বানিয়ে নিয়েছিল, আজ যারা বিজ্ঞানমনস্ক মুসলিম তারা তারই উদ্ভাবিত মিথ্যা অনুবাদকে গ্রহন এবং প্রচার করছে, কেউ

সজ্ঞানে কেউ বা না জেনেই।

আমাদের এই সমতল দ্বীপ সদৃশ যমীনের নিচের পানির স্তরটি হয়ত ২য় যমীনের ছাদ। হয়ত, আমাদের জমিনের উপরে জমাট ঢেউ ছাদের ন্যায় রয়েছে, আমাদের যমীনের নিচের সমুদ্রের নিম্নভাগটিও হতে পারে ২য় যমীনের জমাট ছাদ। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

এরিক নামের এক বায়োলজির প্রফেসর গবেষণা প্রজেক্টে ছোট সাবমেরিনে সমুদ্রের নিচে গিয়ে সমুদ্রের নিচের মাটিতে আরেকটা হ্রদের মত জমাট পানি আবিষ্কার করেন। তিনি সাবমেরিন নিয়ে বার বার ওটার নিচে যেতে চেষ্টা করেন,যতই চেষ্টা করে ততবারই জমাট পানি ধাক্কা দিয়ে সাবমেরিনকে উপরে পাঠিয়ে দেয়[চ]। এর বিষয়ে আজকের বিজ্ঞানও খুব কম জানে, কিছু ধারনা অনুমান ছাড়া। আজ পর্যন্ত মাটি খুড়েঁ ৭ মাইলের বেশি যেতে সক্ষম হয়নি। ৭ এর নিচে আর যাওয়া যায় না। সমুদ্রের গভীরতম অংশও ৭ মাইলের বেশি না। অথচ অপবিজ্ঞানীরা চেয়ারটেবিলে বসে ম্যাথ আর উপরে বসে কিছু অনুমান নির্ভর সুডো পরীক্ষনের দ্বারা জমিনের নিচের গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে কত কিছুই না বলে! ক্রাস্ট,ম্যান্টেল, আউটার কোর,ইনার কোর..আরো কত কি! অথচ এসব কিছুই unobservable hypothesis । এগুলোকেই শাশ্বত সত্য বলে মানা হয়।

৭টি যমীনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রেখেছেন নূনের পৃষ্ঠদেশে। এ ব্যপারে অসংখ্য হাদিস আছে। পূর্বের পর্বগুলোতেও খানিকটা আলোচনা গত হয়েছে। এরপরেও এ সংক্রান্ত আরও কিছু হাদিস নিচে দেওয়া হলো:

al-Saniyyah fi Ajwibat al-As'ilat al-Mardiyya by Ahmad ibn 'Abd al-Latif al-Bashishi:

> Ibn Abi Hatim transmitted from Ka'b that he was asked what is below this earth and he said "water" and [it was asked] "what is below water?" He said "earth" until he counted seven earths. It was said "what is below the seventh earth?" He said "a rock" and it was said "what is below the rock?" He said "an angel" and it was said "what is below the angel?" He said "a fish whose two sides are hanging from the throne" and it was said "what is below the fish?" and he said "wind and darkness and then knowledge stops." End

□ According to Ibn al-Muthanna-Ibn Abi 'Adi-Shu'bah Sulayman (al-A'mash ?)-Abu Zabyan-Ibn 'Abbas: The first (thing) created by God is the Pen. It proceeded to (write) whatever is going to be. (God) then lifted up the water vapor, and the heavens were created from it. Then He created the fish, and the earth was spread out on its back. The fish moved, with the result that the earth was shaken up. It was steadied by means of the mountains, for the mountains indeed proudly (tower) over the earth. So he said, and he recited: "Nun. By the Pen and what they write."353 I was told the same by Tamim b. al-Muntasir-Ishaq (b. Ytzsuf)-Sharik (b.'Abdallah al-Nakha'i)-al-A'mash-Abu Zabyan or Mujahid354 -Ibn 'Abbas, with the exception, however, that he# said: And the heavens were split off from it (instead of: were created).□

□ According to Ibn Bashshar-Yahya355 -Sufyan-Sulayman (al A'mash ?)-Abu Zabyan-Ibn 'Abbas: The first (thing) created by God is the Pen. God said: Write!, whereupon the Pen asked: What shall I write? God replied: Write what is predestined! He continued. And (the Pen) proceeded to (write) whatever is predestined and going to be from that day on to the Coming of the Hour. Then God created the fish. He lifted up the water vapor, and heaven was split off from it, and the earth was spread out upon the back of the fish. The fish became agitated, and as a result, the earth was shaken up. It was steadied by means of the mountains, he continued, for they proudly (tower) over the the earth. According to Ibn Humayd-Jarir (b. 'Abd al-Hamid)-'Ata' b. al-Sa'ib-Abu al-DOA Muslim b. Subayh-Ibn 'Abbas: The first thing created by God is the Pen. God said to it: Write!, and it wrote whatever is going to be until the Coming of the Hour.

*Then God created the fish upon the water. Then he heaped up the earth upon it.356 *

* ইবনে জারির তাবারির এ হাদিস সংক্রান্ত মন্তব্য: *

* This reportedly is a sound tradition as transmitted on the authority of Ibn 'Abbas and on the authority of others in the sense commented upon and explained and does not contradict anything transmitted by us from him on this subject.*

* Should someone357 ask: What comment on his authority and that of others proves the soundness of what you have transmitted to us in this sense on his authority? he should be referred to what I have been told by Musa b. Harun al-Hamdani and others-Amr b. Hammad-Asbat b. Nasr-al-Suddi-Abu Malik and Abu Salih Ibn 'Abbas. Also (al-Suddi)-Murrah al-Hamdani-Abdallah b. Masud and some (other) companions of the Messenger of God (commenting on): "He is the One Who created for you all that is on earth. Then He stretched out straight toward the heaven and fashioned it into seven heavens."358 God's Throne was upon the water. He had not created anything except what He created before# the water.359 When He wanted to create the creation, He brought forth smoke from the water. The smoke rose above the water and [5o] hovered loftily over it. He therefore called it "heaven. 00 Then He dried out the water, and thus made it one earth. He split it and made it into seven earths on Sunday and Monday. He created the earth upon a (big) fish (hut), that being the fish (nun) mentioned by God in the Qur'an: "Nun. By the Pen."361 The fish was in the water. The water was upon the back of a (small) rock. The rock was upon the back of an angel. The angel was upon a (big) rock. The (big) rock-the one*

mentioned by Lugman3 2 -was in the wind, neither in heaven nor on earth. The fish moved and became agitated . As a result, the earth quaked, whereupon He firmly, anchored the mountains on it, and it was stable. The mountains proudly (tower) over the earth. This is stated in God's word that He made for the earth "firmly anchored (mountains), lest it shake you up."363

Abu Ja'far (al-Tabari) says: The statement of those mentioned by me that God brought forth smoke from the water when He wanted to create the heavens and earth; that the smoke hovered loftily over it, by which is meant that it was high over the water, since everything that is high above another thing is its "heaven"; that He then dried out the water and made it one earth, indicates that God created heaven unfashioned before the earth and then created the earth. If it is as they say, it is not impossible that God stirred up smoke from the water and raised it high over the water, so that it became a heaven for it. Then He dried out the water, and the smoke that hovered loftily over it became an earth. But God did not spread it out and did not decree that it contain the food it provides, nor did He bring forth from it its water and its pasture, until He stretched out straight toward the heaven which was the smoke stirring from the water and rising high above it, and He fashioned it into seven heavens. Then He spread out the earth which was water and dried the water out. Then He split the earth, making it into seven earths, and decreed that it contain the amount of food it provides and "brought forth from it its water and its pasture, and the mountains He anchored firmly," as God says.'" Thus, everything transmitted by us concerning this subject on the authority of Ibn 'Abbas has a sound meaning.

Narrated by Al-Walid Ibn Muslim, narrated by Malik Ibn Ans, narrated by Sumay son of Abu Bakir, narrated by Abu Salih Al-Samaan, narrated by Abu Hurayrah who related that he heard the prophet - peace be upon him – say, "The first thing Allah created was the pen, then He created the 'Nun' which is an inkwell. This is what Allah stated (in sura 68:1) 'Nun and the Pen.' And He said to it, 'Write'. So the pen wrote all that will be until judgment day. **Then Allah created the Nun (the whale) above the waters AND HE PRESSED THE EARTH INTO ITS BACK**. He (Allah) then said to the pen 'Write.' The pen asked 'What shall I write?' Allah replied, 'Write what was and what will be until judgment day; whether deed, reward, consequence and punishment- until judgment day.' Thus the pen wrote what shall be until judgment day. Allah then placed a seal over the pen and it will not talk until judgment day. Then Allah created the mind and said, 'By my Glory, I will establish you in those whom you love and I will take you away from those whom you despise.'"

Mujahid related that 'Nun' **is the whale that is underneath the seventh earth**. He stated that the 'Pen' is what was used to write 'Al-Thikir' (The Remembrance - Quran). Likewise, it was also narrated by Mukatil, Murrah Al-Hamdani, Ata' Al-Kharasani, Al Suddi and Al-Kalbi who all said, "**Nun is the whale upon which all the earths are placed**."

Narrated by Abu Thabyan, narrated by Ibn Abbas who said, "The first thing that Allah created was the Pen which wrote all that shall be. Then water vapor began to rise, out of which the heavens were created. **Then (Allah) created Nun (the whale) and flattened the earth on its back. When the earth began to lean, it was reinforced with mountains, which are on its surface**." Then Ibn Abbas read the verse (Sura 68:1) 'Nun and the Pen.'

Al-Kalbi and Mukatil stated that the name (of the whale) is 'Al-Bahmout.' Al-Rajis said, "Why do I see you all silent and the Lord my God created Al-

Bahmout?"Abu Yakthan and Al-Waqidi stated that the name (of the whale) is ‘Leotha’; Whereas Kab stated that its name is ‘Lo-tho-tha’ or ‘Bil-Ha-motha.’ Kab said, "Satan crept up to the whale, on whom the seven earths are placed, and whispered into its heart saying, ‘Do you realize what is on your back, Oh Lo-tho-tha of beasts and plants and humans and others? If you are annoyed with them, you can throw them all off your back.’ So Lo-tho-tha intended to do what was suggested (by Satan) **but Allah sent the whale a reptile that crawled through into its blowhole and reached its brain. The whale then cried to Allah –may He be glorified and honored – and He gave permission for the reptile to exit (the whale)**." Kab continued and said, "By Allah, the whale stares at the reptile and the reptile stares at the whale, and if the whale intends to do (what Satan suggested) the reptile would return to the place it was before."

Someone might say: If it is as you have described, namely, that God created the earth before the heaven, then what is the meaning of the statement of Ibn ‘Abbas told all of you by Wasil b. ‘Abd al-A‘la al-Asadi- Muhammad b. Fudayl- al-A‘mash- Abu Zabyan- Ibn ‘Abbas: The first thing God created is the Pen. God then said to it: Write!, whereupon the Pen asked: What shall I write, my lord! God replied: Write what is predestined! He continued: And the Pen proceeded to (write) whatever is predestined and gong to be to the Coming of the Hour. God then lifted up the water vapor and split the heavens off from it.**Then God created THE FISH (*nun*), AND THE EARTH WAS SPREAD OUT UPON ITS BACK. The fish became agitated, with the result that the earth was shaken up. It was steadied BY MEANS OF THE MOUNTAINS**, for they indeed proudly (tower) over the earth.
I was told about the same by Wasil - Waki’ - al-A‘mash - Abu Zabyan - Ibn ‘Abbas.According to Ibn al-Muthanna - Ibn Abi ‘Adi - Shu‘bah - Sulayman (al-A‘mash?) - Abu Zabyan - Ibn ‘Abbas: The first (thing) created by God is the Pen. It proceeded to (write) whatever is going to be. (God) then lifted up the

water vapor, and the heavens were created from it. **Then He created the fish, and the earth was spread out on its back. The fish moved, with the result that the earth was shaken up. It was steadied by means of the mountains**, for the mountains indeed proudly (tower) over the earth. So he said, and he recited: "*Nun*. By the Pen and what they write."
I was told the same by Tamim b. al-Muntasir - Ishaq (b. Yusuf) - Sharik (b. ‘Abdallah al-Nakha‘i) - al-A‘mash - Abu Zabyan or Mujahid - Ibn ‘Abbas, with the exception, however, that he said: And the heavens were split off from it (instead of: were created).

According to Ibn Bashshar - Yahya - Sufyan - Sulayman (al-A‘mash?) - Abu Zabyan - Ibn ‘Abbas: The first (thing) created by God is the Pen. God said: Write!, whereupon the Pen asked: What shall I write? God replied: Write what is predestined! He continued. And (the Pen) proceeded to (write) whatever is predestined and going to be from that day on to the Coming of the Hour. **Then God created the fish.** He lifted up the water vapor, and heaven was split off from it, **and the earth was spread out upon the back of the fish. The fish became agitated, and as a result, the earth was shaken up. It was steadied by means of the mountains**, he continued, for they proudly (tower) over the earth.

According to Ibn Humayd - Jarir (b. ‘Abd al-Hamid) - ‘Ata’ b. al-Sa’ib - Abu al-Duha Muslim b. Subayh - Ibn ‘Abbas: The first thing created by God is the Pen. God said to it: Write!, and it wrote whatever is going to be until the Coming of the Hour. **Then God created the fish. Then he heaped up the earth upon it**.

This reportedly IS A SOUND TRADITION AS TRANSMITTED ON THE AUTHORITY OF IBN ‘ABBAS and on the authority of others in the sense

commented upon and explained and does not contradict anything transmitted by us from him on this subject.
Should someone ask: What comment on his authority and that of others proves the soundness of what you have transmitted to us in this sense on his authority? He should be referred to what I have been told by Musa b. Harun al-Hamdani - **'Abdallah b. Mas'ud and some (other) companions of the Messenger of God (commenting on)**: "He is the One Who created for you all that is on earth. Then He stretched out straight toward the heaven and fashioned it into seven heavens." God's throne was upon the water. He had not created anything except what He created before the water. When He wanted to create the creation, He brought forth smoke from the water. The smoke rose above the water and hovered loftily over it. He therefore called it "heaven." Then He dried out the water, and thus made it one earth. **He split it AND MADE IT INTO SEVEN EARTHS on Sunday and Monday. He created the earth UPON A (big) FISH (*hut*), THAT BEING THE FISH (*nun*) MENTIONED BY GOD IN THE QUR'AN**: "*Nun.* By the Pen." **The fish was in the water. The water was UPON THE BACK OF A (small) ROCK. The rock was UPON THE BACK OF AN ANGEL. The angel was UPON A (big) ROCK. The big rock - THE ONE MENTIONED BY LUQMAN - WAS IN THE WIND, neither in heaven nor on the earth. The fish moved and became agitated. As a result, the earth quacked, whereupon He firmly, anchored the mountains on it, and it was stable**. This is stated in God's word that He made for the earth "firmly anchored (mountains), lest it should shake you up."
(*The History of Al-Tabari: General Introduction..)*

It was said that "Nun" refers to A GREAT WHALE that rides on the currents of the waters of the great ocean AND ON ITS BACK IT CARRIES THE SEVEN EARTHS, as was stated by Imam Abu Jafar Ibn Jarir. Narrated by Ibn Bashar, narrated by Yahya, narrated by Sufyan Al-Thuri, narrated by Sulayman Al-Amash, narrated by Abu Thubian, narrated by Ibn Abbas who related, "The

first thing that Allah created was the pen and He said to it ‘Write’. The pen asked, ‘What shall I write?’ Allah said, ‘Write (the) fate (of everything).’ So the pen wrote everything that shall be from that moment until judgment day.
Then Allah created the "Nun" and He caused steam to rise out of which the heavens were created **AND THE EARTH WAS THEN LAID FLAT ON THE NUN’S BACK. Then the Nun became nervous and (as a result) the earth began to sway, but (Allah) fastened (the earth) with mountains lest the earth should move** …

It was narrated by Ibn Jarir, narrated by Ibn Hamid, narrated by Ata’a, narrated by Abu Al-Dahee, narrated by Ibn Abbas who stated, "The first thing my Lord created, may He be Exalted and Glorified, was the pen and He said to it, ‘Write.’ So the pen wrote all that will be until judgment day. Then Allah created the Nun (the whale) above the waters **AND HE PRESSED THE EARTH INTO ITS BACK**.

Al Tabarani narrated the same hadith above **(from the prophet Muhammad)** who narrated from Abu Habib Zaid Al-Mahdi Al Marouzi, narrated by Sa’id Ibn Yaqub Al-Talqani, narrated by Mu’amal Ibn Ismail, narrated by Hamad Ibn Zaid, narrated by Ata’a Ibn Al Sa’ib, narrated by Abu Al Dahee Muslim Ibn Subaih, **narrated by Ibn Abbas who stated that the prophet – may peace and blessing be upon him and his family - said**, "The first things Allah created were the pen and the whale and He said to the pen ‘Write.’ The pen asked, ‘What shall I write?’ Allah replied, ‘Everything that shall be until judgment day.’ Then He said ‘Nun. By the Pen and by what they write.’ So Nun is the whale and al-Qalam is the pen" …

Ibn Abu Nujaih stated that Ibrahim Ibn Abu Bakir was informed by Mujahid who said, "**It was said that Nun is the great whale WHO IS UNDERNEATH THE SEVEN EARTHS**."

Furthermore, Al-Baghawy – may Allah rest his soul - and a group of commentators stated that on the back of this whale **there is a great rock whose thickness is greater than the width of the heavens and the earth and above this rock is A BULL THAT HAS FORTY THOUSAND HORNS. On the body of this bull are placed the seven earths and all that they contain**, and Allah knows best

[History of ibn jarir tabari]

আল্লাহ যেভাবে সাত আসমান নির্মান করেন তদ্রুপ সাত যমীন। আজকের বিজ্ঞান অনুযায়ী একটু চিন্তা করুন, কাউকে যদি এই পৃথিবীর ভূমিতে ঢোকানো হতে থাকে,একপর্যায়ে সে গোল পৃথিবীর অপরদিক দিক দিয়ে ফুড়েঁ মহাশূন্যের শূন্যতার আকাশে চলে যাবে।। কিন্তু হাদিসে রাসূল(সা) বলছেন ,কাউকে চাপ দেওয়া হলে সে সর্বশেষে ৭ম জমিনে গিয়ে পৌছাবে। এক একটা যমিনের লেয়ার শেষ হবার সাথে সাথে অপর জমিন। হাদিস অনুযায়ী আমাদের সমতলে বিছানো পৃথিবীর নিচে পানির অতল সমুদ্ররূপ স্তর।এর নিচেই পরের জমিন। একজমিন থেকে অপর জমিন ৭০০ বা ৫০০ বছরের পথ। আসমান ও যমীনগুলো একের সাথে আরেকটি সংযুক্ত একটি ১৪ তলা বিশিষ্ট অট্টালিকা সদৃশ। সবগুলো পরস্পর সংযুক্ত, যারা পৃথিবীকে গ্রহ বলে জানে,তাদের নিকট প্রশ্ন,এখন কথিত স্যাটেলাইটের সিজিআই ইমেজে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত অন্য কোন গ্রহকে তো দেখা যায় না যেখানে কোন লোককে চাপ দিয়ে সে, সেখানে পৌছাবে বা কোন দড়ি লটকে দিয়ে গর্ত করতে থাকলে সেখানে পৌছাবে। বরং গোলাকৃতির এই কাল্পনিক গ্রহের আশেপাশে শূন্যতা বা ভ্যাকুয়াম ছাড়া কিছুই নাই। পৃথিবীকে নূনের পৃষ্ঠদেশে সমতলে বিছানো হয়েছে। আজকের কথিত স্যাটেলাইট দিয়ে কখনো গোল পৃথিবীর নিম্নদেশে বৃহদাকার সে মৎস্যকে দেখা গিয়েছে? ওরা শতশত আলোকবর্ষ দূরে কি আছে তাও জানে। অর্থাৎ সবদিক দিয়েই হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ থিওরি কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক এবং একদমই বিপরীত মেরুর। অথচ একদল মুসলিমদেরকে দেখবেন এসব বিপরীত তত্ত্বগুলোকে ইসলামের সাথে যতটা পারে সমন্বয় করতে,এরাই ৭ যমীনের ব্যাখ্যায় বলে, এগুলো গোলাকার পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ স্তর, যেমন ক্রাস্ট, ম্যান্টেল,ইনার-আউটার কোর। সমস্যার বিষয় হচ্ছে অপবিজ্ঞানীদের এসব কাল্পনিক তত্ত্ব বার বার পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর ভেতরকার স্বীকৃত স্তরগুলো ৪ অথবা ৫ টি। এরপরেও মডারেট ও মর্ডানিস্টরা সামঞ্জস্যহীন অনুমান নির্ভর ভুয়া তত্ত্বের সাথে আপোষ করে চলতে ৭ জমিনের দলিল ৪ বা ৫ স্তরের মাটির উপর আরোপ করে। মা'আযাল্লাহ!

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ "এগুলো হচ্ছে মেঘমালা। পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে এগুলোকে হাঁকিয়ে নেওয়া হয় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর বান্দাদের নিকট যারা তাঁকে ডাকে না।" তোমরা কি জান, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে এটা কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন,এ হচ্ছে সুউচ্চ জমাট ঢেউ এবং সুরক্ষিত ছাদ। তোমরা কি জান, তোমাদের ও তার মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ পাঁচশ বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি জান যে, তার উপরে কী আছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এভাবে তিনি একে একে সাতটি আসমান পর্যন্ত বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি রয়েছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন, আরশ। তোমরা কি জান যে, তার ও সপ্তম আসমানের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ

বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমাদের নিচে এসব কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, যমীন। তোমরা কি জান যে, তার নিচে কী আছে? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ আরেকটি যমীন। তোমরা কি জান, এ দু'টির মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ সাতশ বছরের পথ। এভাবে তিনি গুনে গুনে সাত যমীনের কথা উল্লেখ করে পরে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের কাউকে নিচের দিকে চাপ দিতে থাকে তাহলে সে সপ্তম যমীন পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। তারপর তিনি নিম্নের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ—তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৫৭ ঃ ৩)

ইমাম তিরমিযী (র) এবং আরও একাধিক আলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে প্রতি দু'যমীনের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্বের উল্লেখ রয়েছে। আবার বর্ণনার শেষে তিনি একটি কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমরা সূরা হাদীদের এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছি। তারপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব শ্রেণীভুক্ত।[১] অপর দিকে ইব্ন জারীর (র) তাঁর তাফসীরে কাতাদা (র) সূত্রে মুরসাল'[২] রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ সনদটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। হাফিজ আবূ বকর, বায্যার ও বায়হাকী (র) আবূযর গিফারী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার সনদ সহীহ নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।[৬৫:১২]

এ আয়াত দ্বারা এটাও বোঝা যায় নিচের যমীনগুলোয় আমাদের এ যমীনের ন্যায় প্রানীজগত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যপারে কৌতূহল জাগ্রত হয়। কিছু দুর্বল হাদিসে এবং আলিমদের বর্ননায় ওই সমস্ত যমীনে জ্বীন ও বিচিত্র প্রানীর কথা এসেছে। কিছু হাদিসে মানুষের মত কওমের বসবাসের ব্যপারেও বর্ননা এসেছে।

১২০০ শতকের কিছু আগের ঘটনা। ইংল্যান্ডের Woolpit গ্রামের কৃষকরা জমি চাষ,খননের সময় দুজন বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পায়। ওরা ছিল ভাইবোন। ছেলেটি তার বোনের চেয়ে বয়সে ছোট ছিল।

তাদের পড়নে ছিল অজানা বস্তু নির্মিত পোশাক এবং উভয়ের গায়ের রঙ সবুজ। তারা অজানা কোন এক ভাষায় কথা বলছিল যা গ্রামবাসী বুঝতে পারছিল না। এরা ছিল ক্ষুধার্ত অথচ কোন কিছুই খাওয়ানো যায় নি। অবশেষে একমাত্র শিমের বীচি খেতে পছন্দ করলো, শিমের বীচি খেয়ে মাসখানেক বেচে থাকলো।

শিশুছেলেটা দুনিয়ার আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং অবশেষে মারা যায়। ওর বোনটি বেচেছিল, ধীরে ধীরে রুটিসহ পার্থিব আহারে অভ্যস্ত হয়ে গেল। সেই সাথে দিন দিন গায়ের সবুজ রঙও পরিবর্তন হয়ে স্বাভাবিক মানুষের মত হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করলো। ভাষা শিখবার পরে তাকে তার অতীতের ঠিকানার ব্যপারে প্রশ্ন করলে বলে, তারা "সেন্ট মার্টিনের যমীনের" অধিবাসী। তাদের জগতে সবার গায়ের রঙ সবুজ। সেখানে কোন সূর্য নেই।

সারাবছর সবসময় একইরকম গোধূলির আলো(Twilight), দুনিয়ায় যেমনটা সূর্যাস্তের পর আর সূর্যোদয়ের আগে হালকা আলো থাকে। তারা দুজন তাদের গবাদিপশুর দেখাশোনা করছিল, এর একটা একটা গুহার ভেতর ঢুকে পড়ে। সেটাকে খুজতে তারা দুজন গুহায় প্রবেশ করে এবং অন্ধকারে পথ হারিয়ে যায়। তারা দিনের পর দিন চলতে থাকে যতক্ষন না দূরের আলো চোখে পরে। এরপরে সূর্যের প্রখর আলোয় উভয় জ্ঞান হারায়। এবং কৃষক গ্রামবাসীরা খননের সময় উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ভীন জগতের বেচে থাকা শিশু মেয়েটা ধীরে ধীরে বড় হয় এমনকি বিয়েও করে বলে শোনা যায়। এই ঘটনাকে অনেক ইতিহাসবিদ নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেও বিফলে গেছেন।অনেক রকমের ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। একদল গবেষক এই ঘটনাকে নিছক বানোয়াট কিচ্ছা বলে উড়িয়ে দিতেও পিছপা হয়নি। আজও পর্যন্ত এটা ব্যাখ্যাতীত ঘটনার তালিকায় আছে। এরা ২য় জমিনের অধিবাসী কিনা আল্লাহু আ'লাম।

মাটির নিচের উন্নত সভ্যতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে আমাজনের আদিবাসী এবং রেড ইন্ডিয়ানরা। এদের অনেকে কিছু সুড়ঙ্গ পথের প্রহরী বলেও প্রচলিত আছে। তারা যমীনের নিচের উন্নত প্রানীদের উপাসনা করে। তাদের ভাষায় ওরা অর্ধেক হিউম্যানয়েড হাফ সার্পেন্ট। অর্থাৎ সোজা কথায় খুব সম্ভবত শয়তান জ্বীন।

দক্ষিন আমেরিকা, মিশর,তিব্বতেও সাবটেরানিয়ান ওয়ার্ল্ডে যাবার সুড়ঙ্গ আছে বলে অনেকের ধারনা। বৌদ্ধদের ভাষায় পৃথিবীর নিচের জগতের নাম আগার্থা/সাম্ভালা। নাৎসি এডলফ হিটলার চরমভাবে এন্টি সেমেটিক এসোটেরিক ধর্মচক্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল,নিজেদেরকে আর্য জাতি ভাবতো। এরকম কিছু তথ্য প্রমানও আছে যে নাৎসি জার্মানিরা উত্তরমেরুতে কথিত আগার্থা বা মাটির নিচের জগতে যাবার রাস্তা পেয়েছিল এমনকি তারা সেখানে প্রবেশও করে [ঙ।। এসমস্ত ফ্যাব্রিকেটেড তথ্য প্রমানের উপর ভর করে স্ফেরিক্যাল আর্থ মডেল ভিত্তিক যে এসোটেরিক ফিলসিফি ভিত্তিক থিওরি গড়ে ওঠে তাকে নাম দেওয়া হয় Hollow Earth Theory। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কাল্পনিক গোল পৃথিবীর দক্ষিন ও উত্তর মেরুতে সুবিশাল এন্ট্র্যান্স আছে ইনার আর্থে যাবার। তাদের শয়তান প্রদত্ত তথ্য ভিত্তিক

স্পেকুলেশন হচ্ছে আটলান্টিয়ান সভ্যতা ধ্বংসের সময় একদল আগার্থায় চলে যায়। লেমুরিয়ান/হাইপারবোরিয়ান /আটলানটিয়ান প্রভৃতি কথিত রুট রেস মূলত শয়তান জ্বীনের পূর্ববর্তী জাতি তথা ইবলিসের বংশধর বৈ কিছু নয়(ওয়া আল্লাহু আ'লাম)। হলো আর্থ থিওরিস্ট এবং তিব্বতিয় বৌদ্ধদের বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে যখন মহান শাসক তথা শেষ অবতার আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন আমাদের এইসব কথিত পূর্বপুরুষরা(শয়তানজ্বীন) মাটির উপর চলে আসবে। তাদেরকে লাইট ওয়ার্কার্স নামেও ডাকা হয়। সাবটেরানিয়ান ওয়ার্ল্ডের সমর্থনে কোন প্রকার সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টস তুলে ধরা থেকে বিরত থাকছি, এ স্বভাবটা বরং (অপ)বিজ্ঞানমনা মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান।

কুরআন হাদিসে আসমানের দুয়ার বন্ধের যে সমস্ত দলিল রয়েছে, ওইরূপ এক যমীনের সাথে অন্য যমীনের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ কিনা সে ব্যপারে কোন রূপ ইঙ্গিত কোথাও পাই নি। এরূপ অসম্ভব না যে যমীনগুলোর প্রবেশ পথ রয়েছে, সেখানকার কাফির জ্বীনদের সাথে আমাদের যমীনের কাফিররাও একত্রে কাজ করাটাও অসম্ভব নয়।।বরং এরিয়া ৫১ সহ কাফিরদের বিচিত্র রহস্যময় প্রতিষ্ঠান আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে সম্পৃক্ততার টেস্টিমোনি পাওয়া যায়[ঘ]। হলিউড এ বিষয়টাকেও ছাড়েনি। ডিজনির মোয়ানা অ্যানিমেশন মুভিটি ছিল পুরোপুরি সমতল পৃথিবীর ধারনা কেন্দ্রিক। ইজিপশিয়ান প্রাচীন জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির ধারনা অনুযায়ী আকাশের প্রকৃতি Maui ক্যারেক্টারটির পেটে ট্যাটো অঙ্কিত দেখানো হয়েছে। এ্যানিমেটেড এ ফিল্মের এক পর্যায়ে মাউই এবং মোয়ানাকে আমাদের যমীনের নিচের যমীনটিতে যাওয়া দেখায়।তারা বাস্তবতার সাথে মিল রেখে ২য় যমীনের উপরে সমুদ্রের পানির ছাদকে রেখেছে! দেখুনঃ

https://m.youtube.com/watch?v=E19n0bLAbDw

একইভাবে ২০০৮ সালের Journey to the Center of the Earth ফিল্মেও যমীনের নিচের জগৎকে কাহিনীর মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। সেখানকার সূর্যহীন জগতে প্রানীদের মধ্যে বায়োলুমিনেসেন্সকে দেখানো হয়, যেমনটা অবতার ফিল্মের ঘোড়া এবং গাছপালা-উদ্ভিদ,প্রানীদের মধ্যে দেখিয়েছে। স্বল্প আলোতে বাস্তবেও নিচের জমিনগুলোয় ওরকম কিনা, আল্লাহই ভাল জানেন। তবে গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের মাছের মধ্যে বায়োলুমিনেসেন্টের বৈশিষ্ট্যটা অনেক বেশি পাওয়া যায়।

যাহোক, এই ফিল্মের শেষের দিকে দেখায় ট্রেভর শীনকে আরেক অদ্ভুত যমীন নিয়ে লেখা একটি বই হাতে দিয়ে যাবার প্রস্তাব করে। বইটির নাম Atlantis: The Antediluvian World ,লেখক

Ignatius L. Donnelly। এই ফিল্মের নামে আরো একটা ফিল্ম তৈরি হয়েছে একই কাহিনী নিয়ে, বৈসাদৃশ্য হচ্ছে এটায় নিচের যমীনে বসবাসকারী রেড ইন্ডিয়ানদেরকে দেখানো হয়েছে।

নিচের যমীনগুলোর বাসিন্দাদের ব্যাপারে হাদিসে কি আছে?

তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "যদি আমি এ আয়াতের তাফসীর তোমাদের সামনে বর্ণনা করি তবে তোমরা তা স্বীকার করবে না এবং তোমাদের স্বীকার না করা হবে তোমাদের ওটাকে মিথ্যা মনে করা।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কোন একজন লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস

করলে তিনি বলেনঃ "আমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমি যা কিছু তোমাকে বলবো তা তুমি অস্বীকার করবে না?" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, প্রত্যেক যমীনে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মত এবং এই যমীনের মাখলূকের মত মাখলূক রয়েছে। হযরত ইবনে মুসান্না (রঃ) বর্ণিত রিওয়াইয়াতে এসেছে যে, প্রত্যেক আসমানে (হযরত ইবরাহীম আঃ -এর মত) হযরত ইবরাহীম (আঃ) রয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর 'কিতাবুল আসমা ওয়াসসিফাত' নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "সপ্ত যমীনের প্রত্যেকটিতে তোমাদের নবীর মত নবী রয়েছেন, আদম (আঃ)-এর মত আদম রয়েছেন, নূহ্ (আঃ)-এর মত নূহ্ রয়েছেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর মত ইবরাহীম রয়েছেন এবং ঈসা (আঃ)-এর মত ঈসা রয়েছেন।" অতঃপর ইমাম বায়হাকী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আর একটি রিওয়াইয়াত আনয়ন করে বলেন যে, এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্তু এটা অতি বিরল। এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন আবুয যুহা। ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর জানা মতে ঐ বর্ণনাকারীর অনুসরণ কেউই করেন না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এছাড়া হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি(রহঃ) যমীনের মাখলুক সংক্রান্ত এ হাদিসগুলোকে

জ্যোতির্বিদদের ভ্রান্ত অনুমান নির্ভর বিশ্বাসকে খন্ডন করতে ব্যবহার করেন।

এ হাদিসটিকে নিজের মনগড়া কোনরূপ ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়, কেননা নিজের সীমাবদ্ধ খেয়াল দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গেলে এমন সব প্রশ্ন তৈরি হবে যা মনে বিচিত্র সংশয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।
অপর একটি বিস্ময়কর হাদিস:

> *Kaab al-Ahbar said: When God wished to create the dry land, He commanded the wind to churn up the waters. When they had become turbulent and foamy, wave swelled and gave off vapor. Then God commanded the foam to solidify, and it became dry. In to days He created the dry land on the face of the waters, as He hath said: Say, do ye indeed disbelieve in him who created the earth in two days? (41:9).* ***Then He commanded these waves to be still, and they formed the mountains, which He used as pegs to hold down the earth, as He hath said****: And we placed stable mountains on the earth lest it should move with them (21:31).* ***Were it not for the mountains, the earth would not have been stable enough for its inhabitants. The veins of these mountains are connected with the veins of Mount Qaf, which is the range that surrounds the earth.***
>
> ***Then God created the seven seas****. The first is called Baytush* ***and surrounds the earth from behind Mount Qaf****. Behind it is a sea called Asamm, behind which is a sea called Qaynas, behind which is a sea called Sakin, behind which is a sea called Mughallib, behind which is a sea called Muannis, behind which is a sea called Baki, which is the last.* ***These are the seven seas, and each of them surrounds the sea before it****. The rest of the seas, in which are creatures whose number only God knows,* ***are like gulfs to these seven****. God created sustenance for all these creatures on the fourth day, as He hath said: And he provided therein the food of the*

creatures designed to be the inhabitants thereof, in four days; equally, for those who ask (41:10).

There are seven earths. *The first is called Ramaka, beneath which is the Barren Wind, which can be bridled by no fewer than seventy thousand angels. With this wind God destroyed the people of Ad.* ***The inhabitants of Ramaka are a nation called Muwashshim****, upon whom is everlasting torment and divine retribution. The second earth is called Khalada, wherein are the implements of torture for the inhabitants of Hell.* ***There dwells a nation called Tamis****, whose food is their own flesh and whose drink is their own blood. The third earth is called Arqa,* ***wherein dwell mulelike eagles with spearlike tails. On each tail are three hundred and sixty poisonous quills. Were even one quill placed on the face of the earth, the entire universe would pass away.The inhabitants thereof are a nation called Qays, who eat dirt and drink mothers' milk****. The fourth earth is called Haraba*, ***wherein dwell the snakes of Hell, which are as large as mountains. Each snake has fangs like tall palm trees, and if they were to strike the hugest mountain with their fangs it would be leveled to the ground. The inhabitants of this earth are a nation called Jilla, and they have no eyes, hands or feet but have wings like bats and die only of old age****. The fifth earth is called Maltham,* ***wherein stones of sulphur hang around the necks of infidels. When the fire is kindled the fuel is placed on their breasts, and the flames leap up onto their faces, as He hath said****: The fire whose fuel is men and stones (2:24), and Fire shall cover their faces (14:50).* ***The inhabitants are a nation called Hajla, who are numerous and who eat each other****. The sixth earth is called Sijjin. Here are the registers of the people of Hell, and their works are vile, as He hath said: Verily the register of the actions of*

the wicked is surely Sijjin(83:7). ***Herein dwells a nation called Qatat, who are shaped like birds and worship God truly****. The seventh earth is called Ajiba* ***and is the habitation of Iblis. There dwells a nation called Khasum, who are BLACK and short, with claws like lions.*** *It is they who will be given dominion over Gog and Magog, who will be destroyed by them.”*

“ And the earth was tossed about with its inhabitants like a ship, so God sent down an angel of extreme magnitude and strength ***and ordered him to slip beneath the earth and bear it up on his shoulders. He stretched forth one of his hands to the East and the other to the West and took hold of the earth from end to end. However, there was no foothold for him, so God created from an emerald a square rock, in the middle of which were seven thousand holes****. In each hole was a sea, the description of which is known only to God.* ***And He commanded the rock to settle beneath the angel's feet****. The rock, however, had no support,* ***so God created a great bull with forty thousand heads, eyes, ears, nostrils, mouths, tongues and legs and commanded it to bear the rock on its back and on its horns. The name of the bull is al-Rayyan****. As the bull had no place to rest its feet,* ***God created a huge fish, upon whom no one may gaze at because it is so enormous and has so many eyes. It is even said that if all the seas were placed on one of its gills, they would be like a mustard seed in the desert. This fish God commanded to be a foothold for the bull, and it was done. The name of this fish is Behemoth. Then He made its resting place the waters, beneath which is the air, and beneath the air is the Darkness, which is for all the earths****. There, beneath the Darkness, the knowledge of created things ends.”*

(Muhammad ibn 'Abd Allah al-Kisa'i, Tales of the Prophets-Qisas al-anbiya, trans. Wheeler M. Thackston Jr. [Great Books of the Islamic World, Inc., Distributed by Kazi Publications; Chicago, IL 1997], pp. 8-10)

এই হাদিসের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায়। এতে পরিষ্কার বর্ননা আছে যে আল্লাহ জাল্লা জালুল্লাহ কিভাবে পানির অতল সমুদ্রের উপর পৃথিবীকে সমতলে বিছিয়েছেন, কিরূপে স্তরে স্তরে সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন। যদিও হাদিসগুলোর মান অত্যন্ত দুর্বল, এগুলো কুরআন সুন্নাহর সমস্ত বর্ননার সাথে সংগতিপূর্ন। এগুলো আমাদেরকে অদেখা জগতের ব্যপারে অতিরিক্ত তথ্য দেয় ,যা কাফিরদের কুফরি তত্ত্বের চেয়ে সহস্রগুন উত্তম।

যমীনের ব্যপারে বিচিত্র অপব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। উপরেই উল্লেখ করেছি, কিছু লোক যমীন বা আর্দ বলতে কোন মহাদেশ বা ভূখন্ডকে বোঝায় বলে প্রমান করতে চেষ্টা করে। এর দ্বারা তারা গোটা দুনিয়ার সমতলতাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। এরকম চেষ্টা প্রাচীন যুগ থেকেই শুরু যেদিন থেকে বিশেষ করে গ্রীক স্ফেরিক্যাল আর্থভিত্তিক কস্মোলজি আরবে প্রবেশ করে। ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ এদের অপব্যাখ্যা এবং কুরআন হাদিসের সরল সাধারণ অর্থের বিপরীতে যাওয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

> পক্ষান্তরে طوقه من سبع أرضين এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, এর দ্বারা সাতটি মহাদেশ (اقليم) বুঝানো হয়েছে। তা এ আয়াত ও সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়া এটা দলীল-প্রমাণ ব্যতীত হাদীস ও আয়াতকে সাধারণ অর্থের বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করার নামান্তর। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

বস্তুত, এরকমটা আজ খুব প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ বাচিয়ে রাখলে অবশ্যই এটা নিয়ে অনেক কিছুই বলতেন,কারন ফিতনা আগের চেয়ে আজ বহুগুন বেশি , কেননা তাকে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আগ্রাসন এবং কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী বিষয়গুলো নিয়ে অনেকবার বলতে দেখা গেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পর্বতকে স্থাপন করেন, সমতল বিছানা সদৃশ যমীনের উপর পেরেক হিসেবে। এই কীলক সদৃশ পর্বতগুলো পানির উপর সৃষ্ট যমীনকে স্থির নিশ্চল করে রাখে(সামনে বিস্তারিত দলিলভিত্তিক আলোচনা আসছে, বিইযনিল্লাহ),এর দরুন যমীন কোন একদিকে হেলে পড়ে না। কিয়ামতের দিন এদেরকে ধ্বংস করে বিক্ষিপ্ত ধূলার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়া হবে। পৃথিবী প্রচন্ডভাবে কাঁপবে। আল্লাহ পাহাড়-পর্বত ধ্বংসের মাধ্যমে যমীনকে উন্মুক্ত

মসৃন সমতল প্রান্তরে রূপান্তর করবেন। পর্বতের জন্য যে সমতল জমিনের উপর বক্রতা উঁচুনিচু ছিল সেটা আর থাকবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অতএব, আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা পহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।
অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন।তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না[২০:১০৫-১০৭]

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উম্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।(১৮:৪৭)

আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় নবীকে (সঃ) বলছেনঃ তোমাকে জনগণ জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলি বাকী থাকবে কি না? তুমি উত্তরে তাদেরকে বলে দাওঃ আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ওগুলি চলছে, ফিরছে বলে মনে হবে এবং শেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল

ময়দানে। قاع শব্দের অর্থ হলো মসৃণ সমতল ময়দান এবং صفصف শব্দকে ওরই গুরুত্বের জন্যে আনা হয়েছে। আবার 'صفصف' এর অর্থ বর্ধন হীন যমীনও হয়। কিন্তু প্রথম অর্থটি উৎকৃষ্টতর। আর দ্বিতীয় অর্থটিও অপরিহার্য। না যমীনে কোন উপত্যকা থাকবে, না কোন টিলা থাকবে, না থাকবে, উঁচু-নীচু। এই ভীতিপ্রদ অবস্থার সাথে সাথেই এক শব্দকারী শব্দ করবে। সমস্ত সৃষ্টজীব ঐ শব্দের পিছনে ছুটবে। দৌড়তে দৌড়তে হুকুম অনুযায়ী একদিকে চলতে থাকবে। এদিক ওদিকও হবে না এবং বক্র পথেও চলবে না। হায়! দুনিয়ায় যদি এই ব্যবহার ও চলন থাকতো এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা হতো! কিন্তু সেই দিন এই ব্যবহার ও চালচলন কোন কাজে আসবে না।সেই দিন তো মানুষ আল্লাহ তাআ'লার হুকুম খুবই মান্যকারী হয়ে যাবে এবং হুকুমের সাথে সাথেই তা পালন করবে হাশরের মাঠ হবে অন্ধকার জায়গা। আকাশকে জড়িয়ে নেয়া হবে। নক্ষত্ররাজি ঝরে ঝরে পড়ে যাবে এবং সূর্য চন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সেই দিন যে সব বিস্ময়কর বড় বড় কাজ সংঘটিত হবে, তিনি সেগুলি বর্ণনা করছেন। সেই দিন আকাশ ফেটে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে যদিও তোমরা একে জমাটবদ্ধ দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু ঐ দিন তা মেঘমালার মত দ্রুতবেগে চলতে থাকবে এবং ধূনো তুলোর মত হয়ে যাবে। যমীন সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। তাতে কোন উঁচু-নীচু থাকবে না। এই যমীনে না থাকবে কোন বাড়ীঘর, না থাকবে কোন ছাউনি। কোন আড়াল ছাড়াই সমস্ত সৃষ্টজীব মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে হয়ে যাবে। কেউই তাঁর থেকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। কোথাও কোন আশ্রয়স্থল ও মাথা লুকানোর জায়গা থাকবে না। কোন গাছ-পালা, পাথর ও তৃণ-লতা দেখা

সূরাঃ কাহ্ফ ১৮ ৫২

যাবে না।

এ আয়াত গুলো দ্বারাও প্রতীয়মান হয় পৃথিবীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সমতলে বিছিয়েছিলেন, অতঃপর যমীনের উপর বক্রতা বা বন্ধুরতা সৃষ্টিকারী পর্বত পাহাড়কে চূর্ণ করে যমীনকে পরিপূর্ণ সমতল প্রান্তরে পরিনত করবেন।

আজ আপনারা কুরআন সুন্নাহ,মুফাসসীরীনের থেকে একদম সুস্পষ্ট দলিলগুলো পাঠ করেছেন। শুধু উপরোল্লিখিত এ দলিলগুলোই নয়, কুরআন হাদিসের সমস্ত এস্ট্রোনোমিকাল ডেস্ক্রিপশান(আসমান,চাঁদ সূর্য,দিন-রাত্রি,নক্ষত্র প্রভৃতি) সমতল পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার সাথে হার্মোনি তৈরি করে কোনরূপ সাংঘর্ষিকতা ছাড়াই। ওইসকল দলিল গুলো মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিক্যাল মডেলের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। আমরা পূর্বে থেকেই বলে আসছি, যে সমস্ত আলিম ও দাঈ পৃথিবীকে নানান যুক্তি তর্কের দ্বারা কাফির জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারনার সাথে মিলিয়ে কুরআন সুন্নাহর সরল বর্ননার বিপরীতে গিয়ে মত ব্যক্ত করেছেন,ফতওয়া বা ইজমা তৈরি করেছেন ,তাদের সাথে আমরা কোনরূপ বিদ্বেষ পোষন করিনা। যদি কেউ এরূপ(বিদ্বেষভাব পোষণ) করে, তবে সে অবশ্যই ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের কর্মকাণ্ড থেকে আমরা একদমই মুক্ত। আমরা অবগত আছি ইবনে তাইমিয়া(রহ) সহ আজ পর্যন্ত আরো অজস্র আলিম কুরআন সুন্নাহর

সুস্পষ্ট দলিল ছাড়াই যমীনের আকৃতিগত বিপরীত ধারনাগত মতামত প্রকাশ করে গিয়েছেন। আপনি শুনলে অবাক হবেন ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এও জোড়ালো ভাবে বলেছেন, তার সময়ের ম্যাপ অনুযায়ী কাল্পনিক গ্লোব মডেলের উলটো দিকে কোন মানুষ বাস করে না। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে যা বলছে তার সাথে শাইখের কথা মেলালে তার উক্তিটি আজকের গোল যমীনের মডেল অনুযায়ী ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে,এক শ্রেনীর কাফিররা তো এটা নিয়ে হাসি তামাশাও করে। এজন্য কোন আলিমের কথাকে ত্রুটির উর্ধ্বে ভাবলে ভুল হবার আশংকা থাকে। একমাত্র কুরআনকেই ত্রুটির উর্ধ্বে পাবেন। আমাদের উচিৎ কুরআন সুন্নাহ এবং সাহাবীদের আকিদার অনুসরণ করা। নতুন কিছুর নয়। যমীন সমতল নাকি গোলাকার প্রশ্নে **শায়খ আমরু আব্দুল লতিফকে** প্রশ্ন করা হয়,উত্তরে তিনি বলেনঃ

"ভাই মুহাম্মদের 'পৃথিবী গোলাকার নাকি সমতল' এ প্রশ্নের উওরে আমি বলতে চাই, প্রাচীন উলামাগন বলেছেন যমীন সমতল। **"তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?"(৮৮:১৭-২০)** *এবং এরকমই সূরা শামসে বলা হয়েছেঃ*

"শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর
শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর,"[সূরা শামসঃ৫-৬]

***বিস্তৃত** করেছেন,**সমান,সমতল** করেছেন। এ বিশ্বাসের উপরেই ছিলেন সালাফ এর উলামাগন। তাদের মধ্যে কেউ এ ফতওয়াও দিয়েছেন, যে বলে পৃথিবী গোলাকার তাহলে তা কুফরি হবে। এজন্য প্রথমেই বলেছি মানুষ তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে যা তার জন্য মানানসই, যা তার লাভে আসে। কি দলিল আছে গোলাকৃতি পৃথিবীর ব্যাপারে? ভূগোল শিক্ষায় আপনাকে শেখাবে, পাহাড়ের চূড়া থেকে কিংবা সাগরের উপর জাহাজের উপর থেকে দূরে তাকিয়ে, অথবা অবাস্তব কথিত স্যাটেলাইট থেকে দেখিয়ে বোঝাবে যে পৃথিবী গোলাকার!? এবং এটা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম, আর সালাফদের তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন? একে কি অগ্রহনযোগ্য করে দেয় না? এটাই কি মুসলিমদের বোধসম্পন্ন জ্ঞান? এবং এর উক্তি হলো স্বয়ং আল্লাহর বানী। পৃথিবীকে আমাদের রব সমতল বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তা সুস্পষ্ট।"*

- **শায়খ আমরু আব্দুল লতিফ**

দেখুনঃ

https://youtu.be/i2LK3HrgYy4

আজ একদল লোকেদের দেখবেন, যারা এরকম প্রশ্ন করে যে, 'ইবনে তাইমিয়া, ত্বকী উসমানী, সালিহ আল মুনাজ্জিদ... এরা তো পৃথিবীকে গ্লোব বলেছেন, তারা কি ফাসিক নাকি কাফির,তারা কি কুফরি আকিদা রাখতেন, তারা কি কুফরি শিক্ষা দিয়েছেন, তারা কি কম বুঝেছিলেন...?' আমরা এরূপ প্রশ্নকারীদেরকে সোজাভাষায় ফিতনাবাজ ও মূর্খ বলি এবং এদেরকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি।

> byat za
> তাহলে শাইখ আব্দুল্লাহ আল ফকীহ(হা:), মুহাম্মাদ মিতওয়াল্লী আল শারওয়ী(রাহ:), মুফতি তকী উসমানী (হা:) এরা সবাই কুফরী শিক্ষা দিচ্ছে?? তাওযীহুল কুরআন খুলেন, আশ শারাওয়ীর miracle of quran পড়েন, আল ফকীহ-এর islamweb এর ফাতওয়া পড়ে আসেন।
> 1 · Wow · Delete · 58 minutes ago

যেসকল আলিম কুরআন সুন্নাহ ছেড়ে নিজ মতামত ও কুরআনের শব্দের দূরবর্তী অর্থের যুক্তিমূলক ব্যবহারের দ্বারা উলটো পথে হেটেছেন, তারা হয়ত পরিবর্তনশীল যুগের(তৎকালীন আধুনিক) ধ্যানধারণার সাথে সমন্বয় সাধন এবং তাল মেলানোর জন্য এরকমটা করেছেন, অথবা শুধুই অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবচেতনভাবে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কেউ হয়ত দাওয়াতের স্বার্থে বা পরিস্থিতির চাপে এরকম করেছেন অথবা এ কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজম কিরূপ ভয়াবহ কুফরি আকিদার জন্মদানকারী সে ব্যপারে যথেষ্ট তথ্য পায়নি যেমনটা আজ আমরা ইন্টারনেট এবং অপবৈজ্ঞানিক বইপত্রের কল্যানে পাচ্ছি। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।
ব্যক্তিগতভাবে,তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল গুলোকে এতটা গুরুতর পর্যায়ের দেখিনা যে তাদেরকে তাকফির করতে হবে, বা নাম ধরে ধরে ফাসেক বা অন্য কিছু বলতে হবে, কিছুকিছু ক্ষেত্রে তাদের ভুলগুলোকেও আমি সমর্থন করি!

আমরা শুধু কুরআন হাদিস,সাহাবী ও তাফসির বিশারদগনের কথাগুলোকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরছি এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ করব, যার ভাল লাগবে সে সাহাবীদের বিশ্বাসকে গ্রহন করবে, যার ভাল লাগবে না সে সবকিছু জেনেবুঝেও কাফিরদের বিশ্বাস তথা দর্শনকে আরো ভালভাবে আঁকড়ে ধরবে। বস্তুত, (তাকদীর অনুযায়ী) যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে,সে সেদিকেই ধাবিত হবে।

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/01/documentary-article-series_16.html

বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?:

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

টিকাঃ

[ক] https://m.facebook.com/groups/190773661428877

[খ] তাফসিরে ইবনে আব্বাস এর গ্রহনযোগ্যতার মাত্রা দুর্বলতার ব্যপারে অবগত হবার পরেও পূর্বোল্লিখিত একটি কারনে সেখান থেকে কিছু রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে।

[গ]

http://universeinsideyou.net/inner-earth/

https://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/green-children-woolpit-12th-century-legend-visitors-another-world-002347?

https://www.ancient-code.com/the-forbidden-land-of-agartha-the-secrets-of-the-inner-earth/?

https://esoterx.com/2016/07/10/going-green-the-subterranean-kingdom-of-saint-martins-land/?

[ঘ]
https://m.youtube.com/watch?v=aztFGGaD8w8
https://m.youtube.com/watch?v=QL86Da0qu6A
https://m.youtube.com/watch?v=dvPetkrUg7M

[ঙ]
https://www.gaia.com/article/hollow-earth-theory-is-the-subterranean-civilization-of-agartha-real

https://gizmodo.com/earths-underworld-is-real-and-scientists-just-mapped-it-1819677313

[চ]
https://m.youtube.com/watch?v=NEVW_9EVjFE
https://m.youtube.com/watch?v=cJcpWIYUslY

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

[যমীনের প্রান্তসীমা-মানচিত্রের বাইরের অদেখা জগৎ]

পর্ব-৪

জমিনের প্রান্তসীমা নিয়ে অনেক কৌতূহল। অনেকেই প্রশ্ন করেন জমিনের প্রান্তভাগে কই(?), সেখান থেকে পানি পড়ে যায় না কেন। এ বিষয়টি নিয়েই হলিউড অনেকবার ব্যাঙ্গ করে ফিল্ম

তৈরি করেছে[৭]। মেইনস্ট্রিম পপুলার এফই মডেল অনুযায়ী জমিনের প্রান্তভাগে চারদিকে সুউচ্চ বরফের প্রাচীর আছে। জমিনের প্রান্তভাগকে কেন্দ্র করে আরো কয়েকটা মডেল তৈরি হয়েছে। যেমন পন্ড আর্থ হাইপোথেসিস, ইনফিনিট প্লেইন ইত্যাদি। পপুলার ম্যাপ(এ্যাযিমুথ্যাল একুইডিস্ট্যান্ট প্রজেকশন) অনুযায়ী সাউথ পোলই সারা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। আমরা পূর্ববর্তী আর্টিকেলগুলোয় দেখিয়েছি এটা ত্রুটিপূর্ণ মডেল।
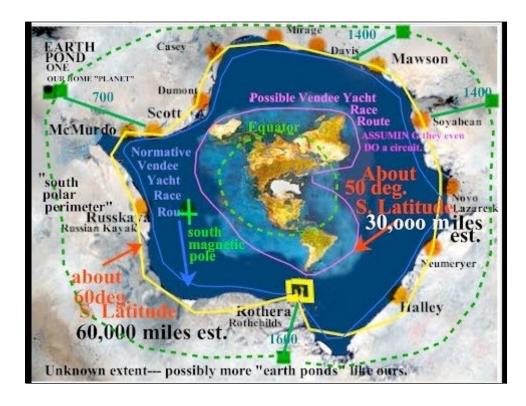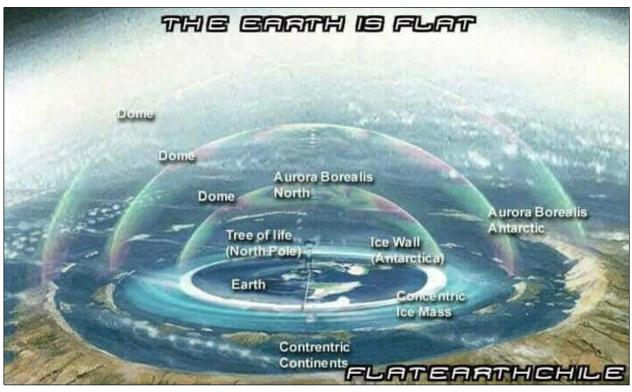
১৯৪৭ সালে অপারেশন হাইজাম্পে এডমিরাল রিচার্ড বার্ড মেরু অঞ্চল থেকে ফিরে এসে বলেন[৮], সেখানে তিনি সুবিশাল বিস্তীর্ণ ভূমি দেখতে পান। তিনি যতদূর দেখেছেন সেটা নাকি

প্রায় আরেকটি আমেরিকার সমান। অন্যান্য বিমানের সাথে তার বিমানটি রওনা করলেও হঠাৎ করে রাডার থেকে হারিয়ে যায়।

Admiral Richard E Byrd discussing his polar exploration of the Antarctic in front of the Azimuthal Equidistant map of the Flat Earth.
The irony is..There is NO Antarctica on this map.

এডমিরাল বার্ড বরফ ঢাকা এলাকা পেরিয়ে নতুন বিস্তৃত ভূমি,জঙ্গল দেখতে পান। সেখান থেকে সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তাপমাত্রা প্রায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস,অর্থাৎ মেরু অঞ্চলের শীতের প্রকোপ নেই। নিচে হাতির ন্যায় কিছু প্রানী তার চোখে পড়ে পরে প্লেনের এ্যালটিটিউড কমিয়ে দেখেন সেগুলো ম্যামথের(অতিকায় হস্তিবিশেষ) দল।
এরপরে আরো সামনে সুবিশাল 'সবুজ' রঙের পাহাড়ের সারি দেখতে পান। এরপরে হঠাৎ তিনি কিছু ডিস্ক এর মত আকৃতির এয়ারক্রাফটদের দেখতে পান, যারা তার সাথে চলছে। অর্থাৎ তিনি কথিত এলিয়েনদের[৯] কবলে পড়েন। এরমধ্যে সে তার বিমানের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেন। তারা সুবিশাল উন্নত শহরে প্রবেশ করে। তিনি ওদের মধ্যে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যবহার দেখেন। অবতরন করানোর পরে তাকে স্বর্ণকেশী একজন লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। উনি তাদের নেতা। তাকে নর্ডিক-জার্মাইক উচ্চারণে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাকে বলা হয় তারা অনেক বছর যাবৎ মানবজাতিকে অবজার্ভ করছে।
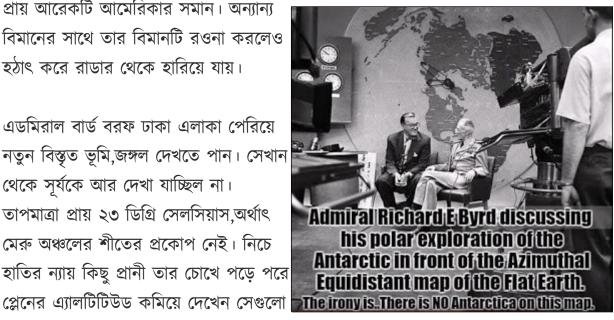
তারা পারমানবিক বোমার ব্যবহার দেখে শঙ্কিত। এবং কিছু করার প্রয়োজনীয়তার কথা জানায়। বার্ড তার সাথেই কেন সাক্ষাৎ করছে জিজ্ঞেসা করলে তারা বলে এখানে শুধু তাকেই পছন্দ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বার্ড ছিলেন একজন ফ্রিম্যাসন। অতএব কথিত এলিয়েন(শয়তানদের) পছন্দের হওয়াটাই স্বাভাবিক। এরপরে, আলাপন শেষে বার্ডকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি বিমানসহ সুস্থভাবে ফিরে আসে। এদিকে বেজ থেকে রেস্কিউ মিশন পরিচালনা শুরু হয়, কারন অপারেশন হাই জাম্পে অনেকেই হারিয়ে যায়। বার্ড যখন সতীর্থদের তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে, তারা তাকে এ বিষয়টি গোপন রাখতে বলে। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত ডায়েরীতে এসব ঘটনা লিখে যান[2]। ১৯৯৬ সালে ডায়েরীটা প্রকাশিত হয়।

ঠিক একইভাবে তাকে এন্টার্কটিকায় অভিযানে প্রেরন করা হয়। তিনি জমিনের নিচের জগতে প্রবেশের কথা লেখেন। তার এই অভিজ্ঞতার বর্ননা 'হলো আর্থ থিওরির' সুবিশাল দলিলে পরিনত হয়। প্যাগান মিস্টিকরা একে আগার্থা, আগার্থি,সাম্বালা ইত্যাদি নাম দিয়েছে। উল্লেখ্য, কিছু হাদিসে নিচের জমিনগুলোয় জ্বীন জাতির বসবাসের বর্ননা পাওয়া যায়।বার্ডের এই অভিযান সবচেয়ে জনপ্রিয় সমতল জমিনের মডেলটির বিরুদ্ধে যায়। কেন না AE(Azimuthal Equidistant projection) অনুযায়ী নর্থপোল পৃথিবীর মাঝে অবস্থিত। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত গ্লোবিউলার আর্থ মডেলকেও ভুল প্রমান করে।

এটা সত্য যে এন্টার্কটিকায় এন্টার্কটিক ট্রিইটি নামের সামরিক সংগঠনটি অবস্থান করছে।
অনুমতি বিনা সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ গেলে গ্রেফতার হবার অনেক রিপোর্ট রয়েছে। তাছাড়া সেটা নোফ্লাইং জোনের আওতাভুক্ত। মেইনস্ট্রিম এফইমডেল পন্থীরা বলে এন্টার্কটিক ট্রিইটি আরো অনেক স্থলভাগের অস্তিত্ব ম্যাপ থেকে আড়াল করে রেখেছে। এটা বিশ্বকে অনেক ছোট এবং সীমাবদ্ধ বলে প্রচার করার কাজে সাহায্য করছে।
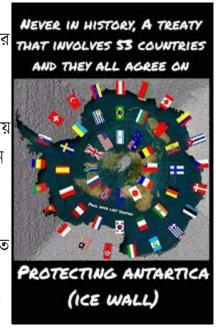
নিচের চিত্রের মত প্রাচীন বৌদ্ধ মুশরিকদের থেকে সহস্র বছরের পুরোনো একটা ম্যাপ পাওয়া যায় যেটা সাতটি মহাদেশের বাইরেও আরো অনেকগুলো মহাদেশ মানচিত্রেদেখা যায়।

Was This World Map Made Ten Centuries Ago?
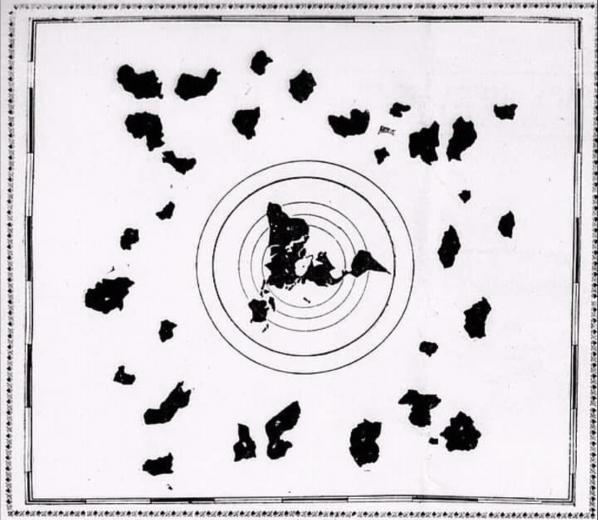
Stranger almost than the "Manuscript found in a Copper Cylinder" is the copy of a map which came across seas to Honolulu from a Buddhist Temple in the mountains of central Japan. It is a map of the world made 1000 years ago. Dr. Kobayashi, the well-known Japanese physician and surgeon of Honolulu, has received a copy of the map, which he believes to have been made by Chinese priests ten centuries ago.

The map is drawn on the principle of the Mercator Projection showing the North Pole as the center of a circle in which are the continents of North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia.

"The map was found by my brother in a Japanese temple in the mountains of Japan," said Dr. Kobayashi. "It has been hidden from the Japanese government in modern times just as it was in ancient times, for in olden days such a map would have been destroyed by the authorities. According to a letter the original map was brought from China by a Buddhist priest and concealed in this temple.

"Ten years ago my brother was a consumptive. Although I was a physician he did not wish to be treated with medicines. He decided to go into the mountains and attempt a cure by himself. For ten years he has remained there and used his will power to effect a cure. Today he is a well man. During his stay there he found this map. He evolved from it a theory of the flatness of the earth, despite all modern facts showing it to be a sphere. This theory has been his one aim in life. He is an artist and in order to demonstrate his theory he made beautiful drawings, picturesque and attractive to the eye, in which mechanical, astronomical and engineering methods are shown.

"My brother goes back to the days of Columbus and Amerigo Vespucci who, he says, sailed for a new country believing that by sailing directly in one general direction they would ultimately come to the place.

"We moderns know that a vessel sailing from a port and going continually in a general easterly manner will arrive at the same place. The vessel, of course, goes around the globe. My brother's theory is that one sails about a vast plane as one would sail around the edges of a bowl."

The illustrations accompanying the map are beautiful examples of Japanese art. No more attractive book of geography has ever been compiled. It is a mass of cherry blossoms, Fujiyamas, beautiful blue seas dotted with the sails of junks and sampans. There are landscapes and seascapes and bizarre pictures of Japanese women, designed along old-time styles. But in every sheet of such pictures the engineering lines are brought out in a way that does not mar the picture. With the text matter explaining each page, the geography should be easily understood.

Dr. Kobayashi now has all the original sheets, scores of them, and these he will return to Japan to his brother, who intends to have them put in the hands of publishers. It will be one of the most novel publications of the period.

The original map of which a copy drawn by Dr. Kobayashi's brother, and of which the accompanying cut is a tracing, is worm-eaten and barely holds together. The above map with all the continents and even the Hawaiian Islands shown, was evidently not made by the priests who traced the original lines.

বৌদ্ধ,হিন্দু,তাও ইত্যাদি প্যাগান দর্শনপন্থীরা সাধারনত শয়তানের কাছে থেকেই এসব তথ্য পায় যা সত্যমিথ্যা মিশ্রিত অথবা অধিকাংশ সময়েই পুরোপুরিভাবে মিথ্যা। এরকম আরো প্রমানহীন ম্যাপ রয়েছে। সেসবে সূর্য চন্দ্রকে একাধিক পাওয়া যায়, তাছাড়া এর কক্ষপথটিরও কুরআন হাদিসে কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। নিচের এই ছবিটির ব্যাপারে একটা সত্য তথ্য হচ্ছে এটাকে ফেসবুক থেকে দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে রাখে। কেউই এডিট না করে সরাসরি আপলোড করতে পারতো না।
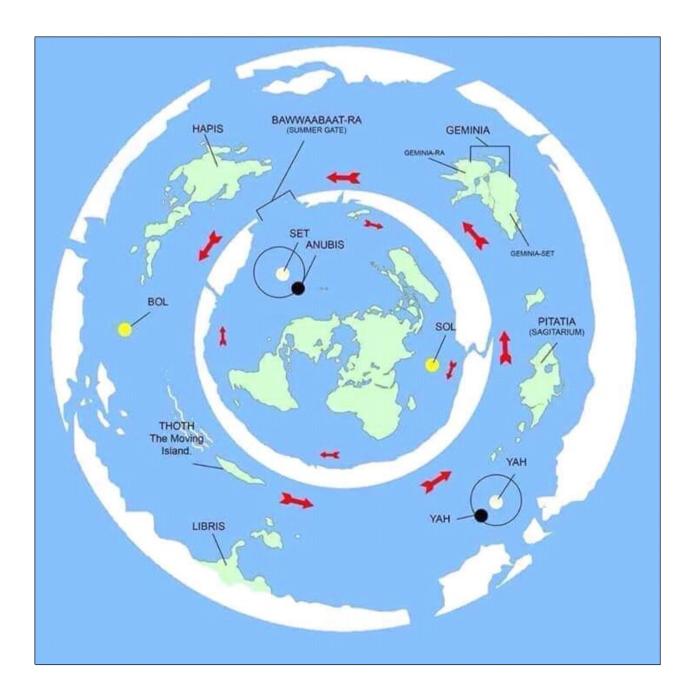
ছয় মহাদেশ এর বাহিরে আরো অনেক ল্যান্ড ম্যাস আড়াল করে রাখার এই অভিযোগ আজকে

অনেক বেশি আলোচিত। হয়ত এটা একদম অসত্য নয়। কেননা বাদশাহ যুলকারনাঈন উদয়াচল,অস্তাচলে পৌছেছিলেন। সেখানে তিনি অদ্ভুত কিছু মনুষ্য জাতির সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। এমনকি ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছেও পৌছেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কালামে মাজীদে ইরশাদ করেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

فَأَتْبَعَ سَبَبًا

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ

إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

"তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুনঃ আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম।

অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব। অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। আবার তিনি এক পথ ধরলেন। অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন।

তিনি বললেনঃ আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে ও সক্ষম হল না। যুলকারনাইন বললেনঃ এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব।"[সূরা কাহফঃ৮৩-৯৯]

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসিরে বলা হয়েছেঃ

حَمِئَةٍ শব্দ حَمْأَةٌ হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মসৃণ কাদা মাটি। কুরআন কারীমের–

إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ- (১৫ঃ ২৮)

(নিশ্চয় আমি মানুষকে খনখনে মাটি দ্বারা যা পচা কাদা হতে তৈরী করে সৃষ্টি করেছি) এই আয়াতের তাফসীরে এটা গত হয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই অর্থ শুনে হযরত নাফে' (রঃ) শুনেন যে, হযরত কা'ব আহবার (রঃ) জিজ্ঞাসার সুরে বলেছিলেনঃ "আপনারা আমার চেয়ে কুরআন বেশী জানেন। কিন্তু আমি তো কিতাবে পাচ্ছি যে, ওটা কালো বর্ণের মাটিতে ডুবে যায়?" একটি কিরআতে فِيْ عَيْنٍ حَامِيَةٍ রয়েছে। অর্থাৎ সূর্য গরম জলাশয়ে অস্তমিত হয়। এই দু'টি কিরআত প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং দু'টোই সঠিক। সুতরাং যে কোন একটি পড়া যাবে এবং এ দুটোর অর্থেও কোন বৈপরীত্ব নেই। কেননা, সূর্য নিকটে থাকার কারণে পানি গরম ও কালো হয় এবং তথাকার মাটি কালো বর্ণের হওয়ার কারণেঐ পানির কাদা ঐ বর্ণেরই হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে বলেনঃ "আল্লাহর উত্তেজনাপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে (অস্তমিত হচ্ছে), যদি আল্লাহর হুকুমে এর উত্তেজনা কমে না যেতো। তবে এটা যমীনের সমস্ত কিছু দগ্ধ করে ফেলতো। [১]

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) সূরায়ে কাহ্ফের এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি عَيْنٍ حَامِيَةٍ পাঠ করনে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমরা তো حَمِئَةٍ পড়ে থাকি।" একথা শুনে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কিরূপ পড়েন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আপনি যেভাবে পড়লেন আমিও সেই ভাবে পড়ে থাকি।" তখন

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। হতে পারে যে, এটা আবদুল্লাহ ইবনু আমরের (রঃ) নিজস্ব কথা। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমাদের ঘরেই কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয়েছে।" হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে হযরত কা'বকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "তাওরাতে আপনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থান কোথায় পেয়ে থাকেন?" উত্তরে হযরত কাব' (রাঃ) বলেনঃ এ ব্যাপারে আহলুল আরাবিয়্যাহকে জিজ্ঞেস করুন। এ বিষয়ে তাঁরাই ভাল জ্ঞান রাখেন। আমি তাওরাতে পাই যে, সূর্য মাটি ও কাদার মধ্যে অস্তমিত হয়।" ঐ সময় তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা পশ্চিম দিকে ইশারা করেন। [১] এসব ঘটনা শুনে ইবনু

তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা পশ্চিম দিকে ইশারা করেন।[১] এসব ঘটনা শুনে ইবনু হা'যির (রঃ) বলেনঃ আমি ঐ সময় বিদ্যমান থাকলে হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় তুব্বা'র নিম্নের দু'টি ছন্দ পাঠ করতাম যা তিনি যুলকারনাইনের আলোচনায় বলেছিলেনঃ

بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِيْ ۞ أَسْبَابَ أَمْرٍ مِنْ حَكِيْمٍ مُرْشِدٍ

فَرَأٰى مُغِيْبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوْبِهَا ۞ فِيْ عَيْنٍ ذِيْ خُلُبٍ وَثَاطٍ حَرْمَدٍ

অর্থাৎ "তিনি মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছে যান। কেননা, বিজ্ঞানময় ও পথ প্রদর্শক (আল্লাহ) তাঁকে সর্বপ্রকারের আসবাব ও সরঞ্জাম প্রদান করেছিলেন। তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় দেখতে পান যে, ওটা কালো বর্ণের কাদা মাটিতে অস্তমিত হচ্ছে।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "خُلُب" এর অর্থ কি?" উত্তরে বলা হয়ঃ "মাটি।" তিনি প্রশ্ন করেনঃ ثَاط কি?" জবাবে বলা হয়ঃ "কাদা।" তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ حَرْمَد কি?" উত্তর আসে "কালো।" তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) একটি লোককে বা তাঁর গোলামকে বলেনঃ "এই লোকটি যা বলছে তা লিখে নাও।"

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করেন। যখন তিনি وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ এইরূপ পাঠ করেন তখন হযরত কা'ব (রাঃ) বলে ওঠেনঃ "যাঁর হাতে কা'বের (রাঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তাওরাতে এরূপই রয়েছে। একমাত্র হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়া আর কাউকেও আমি এরূপভাবে পড়তে শুনি নাই। তাওরাতেও এটাই রয়েছে যে, সূর্য কালো বর্ণের কাদায় অস্তমিত হয়।

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৮:৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন, **"অবশেষে তিনি(যুলকারনাঈন) যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।"**
কাব্বালিস্টিক বর্ননার পৃথিবীর গ্লোবিউলার মডেলে সূর্যের উদয়াচল অস্তাচলের চিন্তা একদমই অর্থহীন।বরং সে অনুযায়ী সূর্য ৯৩ মিলিয়ন দূরে অবস্থান করছে যার চারদিকে দুনিয়া ঘুরপাক খায়!

একটি বিষয় হলো পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্বের হিসাবটি বিভিন্ন যুগে পরিবর্তন হয়েছে। এর দ্বারা প্রমান হয় হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি অনুমান নির্ভর প্রমানহীন ধারনা বৈ কিছু নয়। অতএব, সত্য হচ্ছে সূর্য সত্যিই জমিনের কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যায়[১], যেমনটা কুরআনেই আছে। ইবনে কাসির রহঃ বিশ্বাস করতেন সূর্য চতুর্থ আসমানে। এজন্য তার তাফসিরে গেলে সামান্য আপত্তি পেতে পারেন। কিন্তু তিনি তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে কুরআনের বর্ননানুযায়ী প্রথম আসমানে থাকবার সম্ভাবনাও উল্লেখ করেন। তাছাড়া সাহাবীদের কথা গুলো চতুর্থ আসমানে সূর্যের অবস্থানের মতামতের বিরুদ্ধে যায়। তারা স্পষ্টভাবে সূর্যের কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্তগমনের কথা বর্ননা করেছেন। আর এটা সমতল জমিন ছাড়া অসম্ভব।
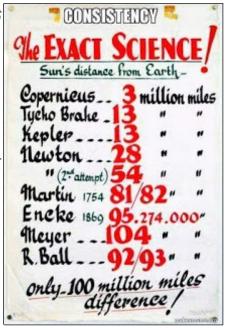
অথচ আজকের অপবিজ্ঞান[১১] এবং অপবিদ্যা, যাদুশাস্ত্রের ভ্রান্ত মেটাফিজিক্স দ্বারা উম্মাহ এতটাই প্রভাবিত যে সেসবই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, এমনকি সেসবকে কুরআন সুন্নাহ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। মা'আযাল্লাহ!নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন,আশা করি বুঝতে বাকি রইবে না যে ,এই পরিবর্তনশীল স্ফেরিক্যাল গ্লোব মডেলটি মূর্খ ছাড়া আর কারও বিশ্বাস করার কথা না। এটা কাফিরদের তামাশা আর ট্রোল ছাড়া কিছু না। ওদের গোলাকার পৃথিবী প্রতি বছর রূপ বদলায়।

অস্তাচলের নিকটে অবস্থানকারী সম্প্রদায়ের ব্যপারে ইবনে কাসির(রহ.) অসাধারণ কিছু আনেন যার অস্তিত্ব প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর ম্যাপ ও মডেলে অনুপস্থিত।

সূরাঃ কাহ্ফ ১৮ ৯৪ পারাঃ ১৬

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ

অর্থাৎ যুলকারনাইন তথায় একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পান। সেখানে একটি বড় শহর ছিল যার ছিল বারো হাজার দরজা। সেখানে কোন গোলমাল ও শোরগোল না হলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তথাকার লোকদের সূর্য অস্ত যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়াও মোটেই বিস্ময়কর নয়। সেখানে যুলকারনাইন একটি বড় সম্প্রদায়কে বসবাস করতে দেখতে পান। আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপরও তাঁকে বিজয় দান করেন। এখন এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। তিনি আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ "যারা এখনও কুফরী ও শিরকের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দেবো, হত্যা ও ধ্বংস দ্বারা অথবা তামার পাত্রকে কঠিনভাবে গরম করে তাদেরকে ওর উপর নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা গলে যাবে। কিংবা সেনাবাহিনীর হাতে তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অতঃপর যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামতের দিনও প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকার্যাবলী সম্পাদন করবে তাদের জন্যে প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।"

১৮:৯০,৯১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, **"অবশেষে তিনি(যুলকারনাইন) যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি"**

প্রকৃত ঘটনা যে এমনই সেটা আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু আফসোস, আজকের মর্ডানিস্ট মুসলিমরা তা বিশ্বাস করে না। আজ এরা কাফিরদের মনগড়া ও যাদুশাস্ত্রের কুফরি কথা সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আজ ওরা বিশ্বাস করে না জমিন সমতল এবং আসমান জমিনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ, যাদেরকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির

রহিমাহুল্লাহর তাফসিরে কিছু অদ্ভুত মনুষ্যজাতির বর্ননা এসেছে যারা সূর্যের উদয়াচলে বাস করে। এদের শারীরিক গড়নের অস্বাভাবিকতার বর্ননা শুনে অনেকের কাছেই কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হবে। আপনি এখনি গুগলে Ostrich people[১২] লিখে সার্চ দিন। এরা এখনো বসবাস করে।পা তিন আংগুল বিশিষ্ট উটপাখির মত। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাসের অনেক জায়গায় কুকুরের মাথাবিশিষ্ট মানুষের বর্ননা পাওয়া যায় যাদেরকে Cynocephaly [১৩] বলা হয়। এছাড়া পিগমি বিশ্বের সবচেয়ে খর্বকায় জাতি। এসব আল্লাহরই বৈচিত্রময় সৃষ্টি। সুতরাং নিচের বর্ননা খুব বেশি অস্বাভাবিক লাগার কথা না।

কাজ চালিয়ে যান। সাথে সাথে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তনও বিস্তৃত হয়। সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে, একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর মত ছিল। না তারা ঘরবাড়ী তৈরী করে, না তথায় কোন গাছপালা রয়েছে, না রৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের দেহের রঙ ছিল লাল এবং তারা বেঁটে আকৃতির লোক ছিল। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল মাছ। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে নেমে যেতো এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো। এটা হযরত হাসানের (রাঃ) উক্তি। হযরত কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতো না। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে চলে যেতো এবং সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের দূরবর্তী ক্ষেত খামারের দিকে ছড়িয়ে পড়তো। সালমার (রঃ) উক্তি এই যে, তাদের কান ছিল বড় বড়। একটা কান দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতো আর একটি বিছিয়ে দিতো। কাতাদা (রঃ) বলেন, তারা ছিল অসভ্য ও বর্বর। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, সেখানে কখনো কোন ঘরবাড়ী এবং প্রাচীর নির্মিত হয় নাই। সূর্যোদয়ের সময় ঐ লোকগুলি পানিতে নেমে যেতো। সেখানে কোন পাহাড় পর্বতও নেই। অতীতে কোন এক সময় তাদের কাছে এক সেনাবাহিনী আগমন করে। তারা তথাকার লোকদেরকে বলেঃ "দেখো, তোমরা সূর্যোদয়ের সময় বাইরে চলে যেয়ো না।" তারা বললোঃ "না, এটা হতে পারে না, আমরা বরং রাতে রাতেই এখান থেকে

চলে যাবো।" তখন ঐ সেনাবাহিনী তাদেরকে বললোঃ "আচ্ছা বলতো, এই চক্চকে হাড়গুলির ঢেরীটা কিরূপ?" উত্তরে তারা বললোঃ "পূর্বে এখানে এক সেনাবাহিনী এসেছিল। সূর্যোদয়ের সময় তারা এখানেই অবস্থান করেছিল। ফলে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল। এগুলি তাদেরই অস্থি।" একথা শোনা মাত্রই এই সেনাবাহিনী সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

আজকের কথিত বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে বলা হয় স্ফেরিক্যাল(গোলাকৃতি) পৃথিবীর সর্বত্রই আজ হাতের মুঠোয়। গোটা পৃথিবীর ম্যাপ দেখানো হয়। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ টাঙানো হয়। ওদের দেখানো 'আংশিক' ম্যাপে উদয়াচল, অস্তাচলের অস্তিত্ব নেই। ইয়াজুজ ওয়া মাজুজদের দেশটাকেও পাওয়া যায় না, এজন্য কখনো ইহুদীদেরকে কখনো খ্রিষ্টানদেরকে,কখনো মোঙ্গলদেরকে ইয়াজুজ মাজুজ বানিয়ে ফেলা হয়। আর এডমিরাল বার্ডের দেখা আর্কটিকের ওপারে আমেরিকার চেয়েও বড় স্থলভাগ এবং সবুজ পর্বতসারি?!যেখানে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলেরই ম্যাপ নেই সেখানে ওটার প্রশ্ন করা অমূলক। সূরা তালাক্বের শেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসির বিস্ময়কর এক হাদিস উল্লেখ করেনঃ

একটি মুরসাল এবং অত্যন্ত মুনকার হাদীস ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের সমাবেশে আগমন করেন। তিনি দেখেন যে, তাঁরা কোন এক বিষয়ের চিন্তায় চুপচাপ বসে রয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যাপার কি?" উত্তরে তাঁরা বলেনঃ "আমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করছি।" তিনি তখন বলেনঃ "বেশ বেশ! খুব ভাল কথা। আল্লাহর মাখলূক সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করবে। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করবে না। জেনে রেখো যে, এই পশ্চিম দিকে একটি সাদা যমীন রয়েছে। ওর শুভ্রতা ওর নূর বা জ্যোতি অথবা বলেনঃ ওর নূর বা জ্যোতি হলো ওর শুভ্রতা। সূর্যের রাস্তা হলো চল্লিশ দিনের। সেখানে আল্লাহর এক মাখলূক রয়েছে যারা চোখের পলক ফেলার সমান সময়টুকুতেও কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেনি।" তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করেনঃ "তাহলে শয়তান তাদের হতে কোথায় রয়েছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "শয়তানকে যে সৃষ্টি করা হয়েছে কি না এটাও তাদের জানা নেই।" তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "তারাও কি মানুষ?" জবাবে তিনি বলেনঃ "না। হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাদের কিছুই জানা নেই।"

সূরা ঃ তালাক এর তাফসীর সমাপ্ত

এবার বলুন পশ্চিমের ওই শুভ্র স্থলভাগের ম্যাপটি কি প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত স্ফেরিক্যাল আর্থের দেখানো সীমাবদ্ধ ম্যাপ অনুযায়ী কোথাও রয়েছে যেখানে সূর্যের পথ চল্লিশ দিনের? এটা প্রমান করে আমাদের চেনাজানা প্রচলিত ম্যাপের বাইরে উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব,পশ্চিমে আরো অনেক কিছুই আছে যার অনেককিছুই আল্লাহ যুলকারনাঈনকে দেখিয়েছিলেন।

জনপ্রিয় এ্যাযিমুথাল একুয়িডিস্ট্যান্ট ম্যাপ অনুযায়ী চারদিকে বরফের সুউচ্চ দেওয়াল দিয়ে পৃথিবী ঘেরা। তাদের ম্যাপ অনুযায়ী জমিনের প্রান্তসীমার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। জমিনের প্রান্তভাগের বিষয়টিকে বিদ্রুপ করে অনেক ছবি ভিডিও অনলাইনে রয়েছে। আগে একটা সময়ে গুগলে সার্চ দিলে নিচের ছবির মত অনেক বিদ্রুপাত্মক ছবি আসতো।
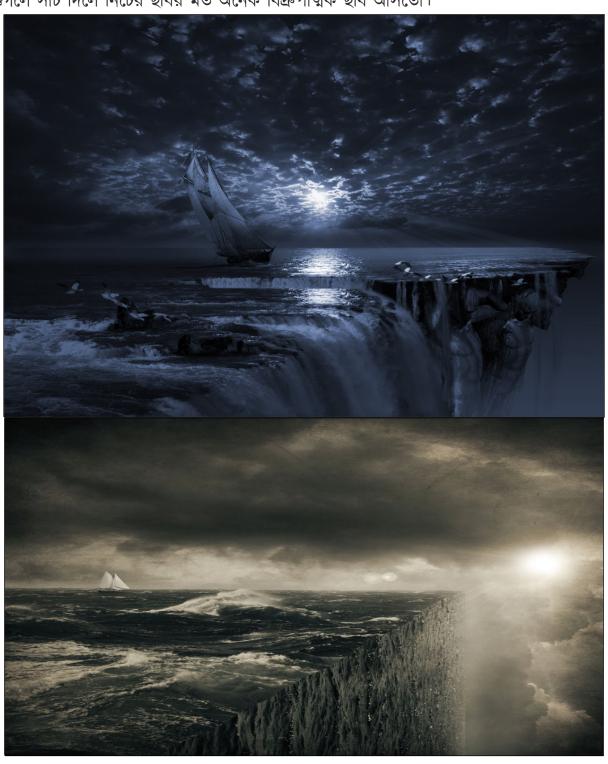
আমেরিকার ৪২% জনসংখ্যা ক্রিয়েশনিজমে বিশ্বাসের পাশাপাশি এখন সমতল পৃথিবীতেও বিশ্বাস করা শুরু করেছে। এজন্য এখন সার্চ দিলে বিদ্রুপাত্মক ছবির জায়গায় নিচের ছবির মত আল বিরুনীর AE Model এর ছবি আসে।

মুসলিম মাত্রই প্রত্যেকেরই উচিত অদেখা জগতের ব্যপারে কুরআন ও হাদিসের উপর নির্ভর করা। হাদিসে এ ব্যপারে সুস্পষ্ট তথ্য রয়েছে। জমিনের প্রান্তসীমা ক্বাফ নামক সবুজ পাহাড়ের সারি দ্বারা বেষ্টিত। আসমান ওর উপরেই মিলিত হয়েছে। সুতরাং জ্বীন ও মানুষের মধ্যে কেউই জমিনের প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারে না আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারি(রহ.) এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

"Allah created the mountain Qaf all around the Earth. It is called stake of the Earth, asit is said in the Quran, 'And the mountains as pegs?' This world is in the middle of the mountain of Qaf as the finger is in the middle of the ring. No man can reach there, for he needs to spend four months in the darkness, In this mountain there is no sun, no moon no stars and it is so blue that the azure colour of the sky is the brightness of the mountain Qaf that reflects on the sky, and it appears this colour, If this was not so, the sky would not be blue. All the mountains that are seen in this world are from the mountain Qaf. ..."[8]

ইবনে আব্বাস(রাঃ) এর কথিত[৬] তাফসীরে সূরা ক্বাফের প্রথম আয়াতের ব্যখ্যায় বলা হয়ঃ

[50:1]

And from his narration on the authority of Ibn 'Abbas that he said in the interpretation of Allah's saying (Qaf.): '(Qaf.) He says: it is an azure mountain overlooking this world, and the colour of the sky takes from it; Allah swore by it, (By the glorious Qur'an) and He swore by the glorious, noble Qur'an,

ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে সর্বত্র সমতল জমিনের সপক্ষে অবস্থান করলেও ক্বাফ পর্বতের বিষয়টিতে আসা হাদিসের মতনে তার সন্দেহ তৈরি হয়। এ ব্যপারের বর্ননাটি তার জ্ঞান ও বিবেক বিরোধী মনে হয়, এজন্য তার পূর্ববর্তী আলিমগন এ ব্যপারে আসা এ হাদিস ও ব্যাখ্যাকে গ্রহন করলেও তিনি সন্দেহ করেছেন। আমার কাছে এ হাদিস ও ব্যাখ্যাটিকে বর্তমান সময়ে সমতল জমিনের পক্ষে বলা কাফিরদের বরফের বেষ্টনীর ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য,যৌক্তিক এবং নির্ভরযোগ্য মনে হয়। পূর্ববর্তী অসংখ্য আলিম,মুফাসসীরীন এর সপক্ষে বলেছেন।
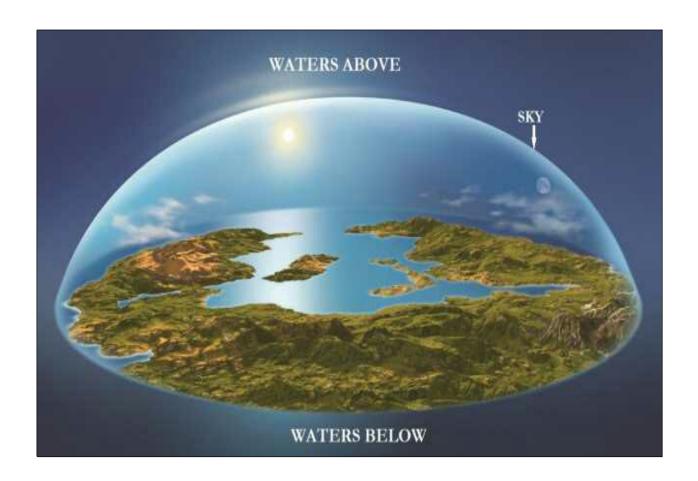
ইবনে আবি আল দুনিয়া এবং আবু আল শাইখ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ননা করেনঃ
"Allah has created a mountain called Qaf which surrounds the world, and whose roots stem from the rock on which the earth rests. Whenever Allah wants to shake a town He orders that mountain to shake the root that belongs to that town. That is why earthquakes occur in some places exclusively of others."

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা থেকে ইবনে মুনাযির, আবু আল শাইখ, আজহামা,আল হাকিম, ইবনে মারদুআহ প্রত্যেকেই সূরাতুল ক্বাফের প্রথম(৫০:১) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ
"It is a mountain of emerald surrounding the world, on which rest the two sides of the sky."

ইমাম সুয়ুতি(রহঃ) al-Durr al-Manthur এ বলেন মুজাহিদ(রঃ) থেকে আব্দুর রাজ্জাক বর্ননা করেন যে, “Qaf is a mountain surrounding the world.”

ইমাম বাগাভী(র) তার তাফসির মা'আলিম আল তানজিলে ইকরিমা ও যাহহাক (রঃ) থেকে বর্ননা করেন,
“Qaf is a mountain of green emerald surrounding the world the way a wall surrounds a garden. The sky’s sides rest over it, hence its blue color.”[৫]

অর্থাৎ, যেভাবে দেওয়াল বাগানকে চারদিকে ঘিরে রাখে, তেমনি ক্বাফ নামের সবুজ পর্বতসারি পৃথিবীর প্রান্তভাগকে ঘিরে রেখেছে। গম্বুজাকৃতির আসমানের দুই প্রান্তভাগ এর উপরিভাগে স্পর্শ করেছে। সুতরাং এই enclosed system থেকে বের হবার পথ নেই।
এত কিছু দেখবার পরেও আজকের মুসলিমরা অদেখা সৃষ্টির ব্যাপারে কাফিরদের চিন্তাধারার ইত্তেবা করে। ওরা এ বিষয়গুলোকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। জিওসেন্ট্রিক বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে বিদ্রুপ করতে ভোলে না কিন্তু এদিকে শয়তানের আবৃত্ত শাস্ত্র[১০] নিঃসৃত অপবিদ্যায় নির্ভর করতে মোটেও লজ্জাবোধ করে না। এদের কতক আবার অনলাইনে বাহ্যত অনেক দ্বীনদার। কিন্তু এমন সব কথাও বলে ফেলে যেটা রাসূল(সাঃ) ও সাহাবীদের পর্যন্তও গড়ায়। বস্তুত, এই প্রবণতা মু'তাযিলা ও নিকৃষ্টতম মুরজিয়াদের মাঝেই পাওয়া যায়।
ওয়া আল্লাহু আ’লাম

রেফা:
[১]
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=334896810300851&id=282165055574027
[২]
https://m.youtube.com/watch?v=UXBIVWRIpAo
[৩]
https://m.youtube.com/watch?v=czW0iRJuH1A

[৪]
http://archive.worldhistoria.com/where-is-the-mountain-of-qaf_topic7458.html
[৫]
https://eshaykh.com/history/mount-qaf/
[৬]
https://callingtoallah.wordpress.com/2017/03/27/তাফসীরে-ইবনে-আব্বাস-ও-এর-ত/
https://shottanneshi.wordpress.com/2015/08/21/tafsir-ibn-abbas/
[৭]
https://youtu.be/9jnseSHhEWQ
[৮]
https://youtu.be/-mJXI0eAuwM?fbclid
[৯]
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=565805280543335&id=282165055574027
[১০]
https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730.107374182
8.282165055574027/472996026490928/
[১১]
https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730/53261617
0528913
[১২]
https://en.wikipedia.org/wiki/Vadoma
[১৩]
https://en.wikipedia.org/wiki/Cynocephaly
https://www.historicmysteries.com/dog-headed-men/

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব
[পাহাড় ও পর্বত]

পর্ব-৫

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পাহাড়কে যমীনের উপর সৃষ্টি করেছেন পেরেক রূপে। কোন কাগজ বা তক্তাকে পেরেক দ্বারা আটকে দেওয়া হলে যেরূপে সেটা স্থিরভাবে থাকে, কোন দিকে হেলে পড়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করে, তেমনি পাহাড় পর্বত আমাদের সমতল পৃথিবীকে কোন দিকে হেলে পড়াকে প্রতিরোধ করে।

তারপর দু'দিনে দুখান থেকে আকাশসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুখান হলো, পানি থেকে উত্থিত সে বাষ্প যা পানি তরঙ্গায়িত হওয়ার সময় উপরে উঠেছিল, যে পানি মহান কুদরতের দ্বারা যমীনের থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যেমন আবূ মালিক, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى وَإِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। পানির আগে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তারপর যখন তিনি মাখলূক সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন তখন পানি থেকে ধোঁয়া আকারে বাষ্প বের করেন। ফলে তা পানির উপরে উঠে যায়। এই ওঠাকে আরবীতে سماء বলা হয়ে থাকে। তাই এ উপরে ওঠার কারণেই আকাশকে سماء বলে নামকরণ করা হয়।

তারপর পানি শুকিয়ে একটি যমীনে রূপান্তরিত করেন। তারপর তা পৃথক পৃথক করে দু'দিনে (রবি ও সোমবার দিন) সাত যমীনে পরিণত করেন। পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা একটি মাছের উপর সৃষ্টি করেন। এ সেই نُوْنٌ যার কথা আল্লাহ তা'আলা نُوْنَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ . আয়াতে উল্লেখ করেছেন। (৬৮ ঃ ১) মাছ হলো পানিতে আর পানি হলো সিফাতের উপর আর সিফাত হলো এক ফেরেশতার পিঠের উপর, ফেরেশতা হলেন একখণ্ড পাথরের উপর আর পাথর হলো মহাশূন্যে । এ সেই পাথর যার কথা লুকমান (আ) উল্লেখ করেছেন, যা আকাশেও নয় পৃথিবীতেও নয়। মাছটি নড়ে উঠলে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার উপর দৃঢ়ভাবে পর্বতমালা প্রোথিত করে দেন, ফলে তা স্থির হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলবার দিন পাহাড়-পর্বত ও তাঁর উপকারিতা, বুধবার দিন গাছপালা, পানি, শহর-বন্দর এবং আবাদ ও বিনাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা আকাশকে পৃথক পৃথক করেছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এ দু'দিনে তিনি সাত আকাশে পরিণত করেন। উল্লেখ্য যে, জুমআর দিনকে জুমআ বলে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এ দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধানের প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক আকাশে ফেরেশতা, পাহাড়-পর্বত, সাগরমালা, তুষার পর্বত ও এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নয়। তারপর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা

Contents

সুশোভিত করে তাকে সুষমামণ্ডিত ও শয়তানের কবল থেকে সুরক্ষিত বানিয়েছেন। তারপর ইচ্ছা মত সৃষ্টি পর্ব শেষ করে তিনি আরশের প্রতি মনোসংযোগ করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا
وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা
এবং পর্বতমালাকে পেরেক?[সূরা নাবাঃ ৬-৭]

31 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়।[২১:৩১]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।[সূরা লোকমান:১০]

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির(রহঃ) বলেন,

বলেনঃ 'আমি কি ভূমিকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি?' অর্থাৎ আমি সমস্ত সৃষ্টজীবের জন্যে এই ভূমিকে কি সমতল করে বিছিয়ে দিইনি? এই ভাবে যে, ওটা তোমাদের সামনে বিনীত ও অনুগত রয়েছে। নড়াচড়া না করে নীরবে পড়ে রয়েছে। আর পাহাড়কে আমি এই ভূমির জন্যে পেরেক বা কীলক করেছি যাতে এটা হেলাদোলা না করতে পারে এবং ওর উপর বসবাসকারীরা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে না পড়ে।

وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 15

এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও[16:15]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।[হা মীম সিজদাহ -১০]

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন [আন নাযিয়াত ৩২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক তাফসীরকার এ রকমই বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি পছন্দ করেছেন। পাহাড়সমূহকে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। তিনি বিজ্ঞানময় এবং অভ্রান্ত ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়ালু ও পরম করুণাময়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) **বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ** তা'আলা যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে শুরু করে। **সুতরাং তিনি** তখন পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনের বুকে স্থাপন করে দেন। ফলে **যমীন স্থির** ও নিশ্চল হয়ে যায়। এতে ফেরেশতামণ্ডলী খুবই বিস্মিত হন। তাঁরা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের অপেক্ষাও অধিক শক্ত অন্য কিছু আছে কি?" তিনি উত্তরে বলেন! হ্যাঁ আছে। তা হলো লোহা।" ফেরেশতাগণ পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "লোহা অপেক্ষাও কঠিনতর কিছু আছে কি?" আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে। তা হলো আগুন।" ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করেনঃ "আগুন অপেক্ষাও বেশী কঠিন কিছু কি আছে?" আল্লাহ তা'আলা উত্তর দেনঃ "হ্যাঁ আছে। তা হলো পানি।" তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করেন "পানির চেয়েও বেশী কঠিন কিছু আছে কি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "হ্যাঁ, আছে। তা হচ্ছে বাতাস।" তাঁরা আবারও প্রশ্ন করেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষাও অধিক কঠিন কিছু কি আছে?" তিনি জবাব দেনঃ "হ্যাঁ আছে। সে হলো ঐ আদম সন্তান যে তার ডান হাতে যা খরচ (দান) করে বাম হাত তা জানতে পারে না।"[১]

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ যখন যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা কাঁপতে থাকে এবং বলতে থাকেঃ 'আপনি আমার উপর আদম (আঃ)-কে এবং তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করলেন যারা আমার উপর তাদের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করবে এবং আমার উপরে অবস্থান করে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে?' তখন আল্লাহ তা'আলা পাহাড় স্থাপন করে যমীনকে স্থির ও নিশ্চল করে দেন। তোমরা বহু সংখ্যক পাহাড় পর্বত দেখতে পাচ্ছ। আরো বহু পাহাড় তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। পর্বতরাজি স্থাপনের পর যমীনের স্থির হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনিই ছিল যেমন উট যবেহ করার পর ওর গোশত কাঁপতে থাকে এবং কিছুক্ষণ কম্পনের পর স্থির হয়ে যায়।"[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বলেনঃ

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী(Fixed abode) করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে(পৃথিবীকে) স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না

[আন নামল ৬১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি যমীনকে স্থির ও বাসোপযোগী করেছেন যাতে মানুষ তাতে আরামে বসবাস করতে পারে এবং এই বিস্তৃত বিছানার উপর শান্তি লাভ করে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন স্থির ও বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ।" (৪০ ঃ ৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন যা দেশে দেশে পৌঁছে যমীনকে উর্বর করে দিচ্ছে, যার দ্বারা এতে বাগ-বাগিচা উদ্গত হয় এবং ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

মহান আল্লাহ্ যমীনকে দৃঢ় করার জন্যে ওর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন নড়া-চড়া ও হেলা-দোলা না করে।

[Tafsir ibn kather 27:61]

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ এই বিছানাসদৃশ সমতল পৃথিবীকে সুস্পষ্টভাবে স্থির বলছেন। এটা বস্তুত তার কথা নয়, বরং স্বয়ং রহমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কথা।

পর্বতসমূহ সমতল যমীনের উপর উঁচুনিচু অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিয়ামতের দিন এসকল পর্বতগুলোকে ধ্বংস করে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়া হবে, যমীন এতে প্রবলভাবে প্রকম্পিত[৯৯:১] হবে। পাহাড়পর্বতগুলোকে ধূলিসাৎ করে এই বন্ধুরতা দূর করে যমীনকে সমতল উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিনত করা হবে। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

03

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে,[তাকভীরঃ৩]

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا 20

এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে[নাবা-২০]

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا 47

যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। [১৮:৪৭]

৩য় পর্বের শেষভাগে এ সংক্রান্ত আলোচনা গত হয়েছে। ৪র্থ পর্বে ক্বাফ পাহাড়ের ব্যপারে আলোচনাও গত হয়েছে।

বস্তুত, পাহাড় পর্বত পৃথিবীর নিশ্চলতা, স্থবিরতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত দলিল গুলো এর প্রমান। এসকল দলিল দ্বারা এও প্রমান হয় যে এই পৃথিবী সমতলে বিছানো যমীন বিশেষ যাকে স্থিত রাখার জন্য পর্বতগুলোকে প্রোথিত হয়েছে।

একলোক Geology বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি বিজ্ঞান উদ্ভুত (অপ)বিদ্যা এবং কুরআনের জ্ঞানের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা লক্ষ্য করেন। কুরআনে বলা হচ্ছে পাহাড় পর্বত সমূহ যমীনকে স্থির রাখে, আর বিজ্ঞান বলছে টেকটনিক প্লেট গুলো ঘুরছে। তিনি islamqa.info তে প্রশ্ন করেছেনঃ

does the Quran and sunnahever say or mention that mountains are inmoving or unshakable? Because I study geology and we know mountains move with the movement of tectonic plates but it is very small and unnoticed by humans. Also if Quran and sunnah never say this why do so many mufaseereen and scholars say this?

উত্তরে শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিঃ) অপবিজ্ঞান এবং কুরআন সুন্নাহর মধ্যে আপোষ করে জবাব দেন।পড়ুনঃ

https://islamqa.info/en/answers/223428/allah-created-the-mountains-stable-to-stabilise-the-earth-and-prevent-it-from-moving-and-shaking

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

-গম্বুজাকৃতির আসমান-

সুউচ্চ জমাট ঢেউ ও সুরক্ষিত মজবুত ছাদ

পর্ব-৬

THE
FIRMAMENT
VAULTED DOME OF THE EARTH
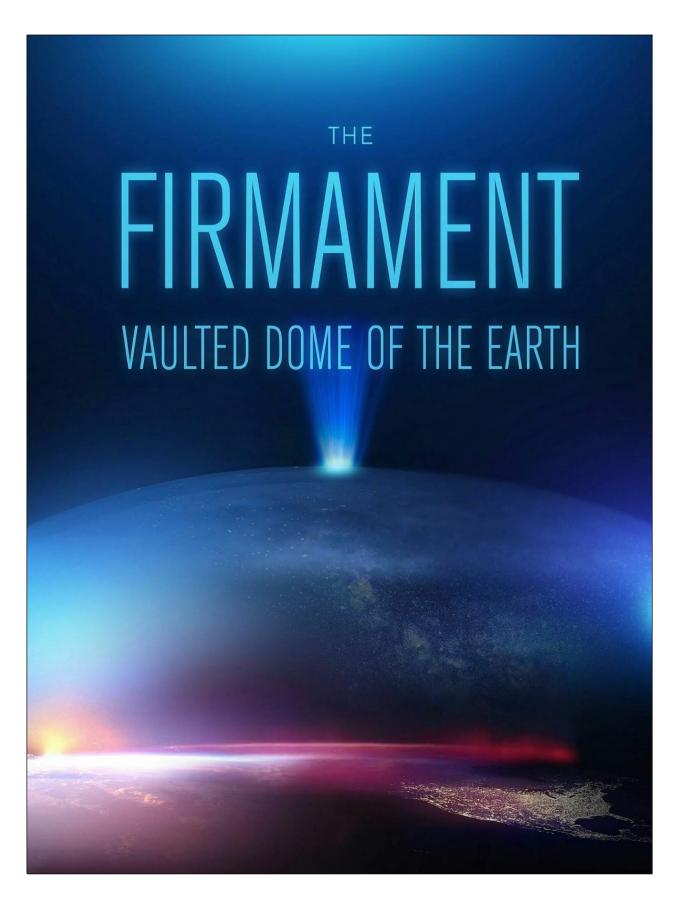
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পৃথিবীর উপর স্তম্ভবিহীন ছাদ হিসেবে আসমানকে সৃষ্টি করেছেন। আসমানের সংখ্যা ৭ টি। একটি অপরের উপর। অর্থাৎ মোট সাতটি স্তর। আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেনঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।[সূরা বাকারা ২৯]

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ[নাবা ১২]

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ "এগুলো হচ্ছে মেঘমালা। পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে এগুলোকে হাঁকিয়ে নেওয়া হয় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর বান্দাদের নিকট যারা তাঁকে ডাকে না।" তোমরা কি জান, তোমাদের উর্ধ্বদেশে এটা কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন,এ হচ্ছে সুউচ্চ জমাট ঢেউ এবং সুরক্ষিত ছাদ। তোমরা কি জান, তোমাদের ও তার মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ পাঁচশ বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি জান যে, তার উপরে কী আছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এভাবে তিনি একে একে সাতটি আসমান পর্যন্ত বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি রয়েছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন, আরশ। তোমরা কি জান যে, তার ও সপ্তম আসমানের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ

Contents

বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমাদের নিচে এসব কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, যমীন। তোমরা কি জান যে, তার নিচে কী আছে? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ আরেকটি যমীন। তোমরা কি জান, এ দু'টির মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ সাতশ বছরের পথ। এভাবে তিনি গুনে গুনে সাত যমীনের কথা উল্লেখ করে পরে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের কাউকে নিচের দিকে চাপ দিতে থাকে তাহলে সে সপ্তম যমীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। তারপর তিনি নিম্নের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ—তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৫৭ ঃ ৩)

ইমাম তিরমিযী (র) এবং আরও একাধিক আলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে প্রতি দু'যমীনের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্বের উল্লেখ রয়েছে। আবার বর্ণনার শেষে তিনি একটি কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমরা সূরা হাদীদের এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছি। তারপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব শ্রেণীভুক্ত।[১] অপর দিকে ইব্ন জারীর (র) তাঁর তাফসীরে কাতাদা (র) সূত্রে মুরসাল'[২] রূপে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ সনদটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। হাফিজ আবূ বকর, বায্যার ও বায়হাকী (র) আবূযর গিফারী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার সনদ সহীহ নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আরশের বর্ণনায় উল্লেখিত পাহাড়ী মেষ সংক্রান্ত হাদীসটি সপ্তম আসমান থেকে আরশের উচ্চতার ব্যাপারে এ হাদীস এবং এর অনুরূপ আরো কয়েকটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীসে এও আছে যে, দু' আকাশের মধ্যকার দূরত্ব হলো পাঁচশ বছর এবং তার স্থূলতাও পাঁচশ বছর।

. . তার প্রমাণ পার্বত্য ছাগল اعوال। সংক্রান্ত হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) .থেকে আহনাফ সূত্রে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইব্ন উমায়রার হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اتدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة خمسمأة عام ومن كل سماء إلى سماء خمسمأة سنة وكثف كل سماء خمسمأة سنة .

অর্থাৎ– তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ব্যবধান কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ উভয়ের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্ব এবং এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশ বছর আর প্রত্যেক আকাশের স্থূলত্ব হলো পাঁচশ বছর।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ ও তিরিমিযী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, 'এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিকটবর্তী আকাশে আদম (আ)-কে পান, তখন জিবরাঈল (আ) তাঁকে বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আ)। ফলে তিনি তাঁকে সালাম করেন এবং তিনি সালামের জবাব দেন ও বলেন, مرحبا واهلايابني نعم الإبن انت (মারহাবা স্বাগতম হে আমার পুত্র, আপনি কতই না উত্তম পুত্র!) আনাস (রা) এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরোহণ ও এর কথা উল্লেখ করেন, তা আকাশসমূহের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের প্রমাণ বহন করে। আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও বলেছেন ঃ

Contents

ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا.

অর্থাৎ– 'তারপর সে (বোরাক) আমাদেরকে নিয়ে উপরে আরোহণ করে। এমনকি আমরা দ্বিতীয় আকাশে এসে উপনীত হই। তিনি (জিবরাঈল) দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইনি কে? এ হাদীস আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উপরিউক্ত হাদিসে ৫০০ বছরের দূরত্বের কথা উল্লেখ থাকলেও অপর এক হাদিসে ৭১, ৭২ বা ৭৩ বছরের দূরত্বের কথা বলা হয়েছে।

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني، عن سماك، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمرت به سحابة فنظر إليها فقال " ما تسمون هذه " . قالوا السحاب . قال " والمزن " . قالوا والمزن . قال " والعنان " . قال أبو بكر قالوا والعنان . قال " كم ترون بينكم وبين السماء " . قالوا لا ندري . قال " فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك " . حتى عد سبع سماوات " ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى ".

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
আমি বাতহা নামক স্থানে একদল লোকের সাথে ছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাদের সাথে ছিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ তাকে অতিক্রম করে। তিনি মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা এটাকে কী নামে অভিহিত করো? তারা বলেন, মেঘ। তিনি বলেন, এবং মুয্‌ন। তারা বলেন, মুয্‌নও বটে। তিনি বলেন, আনানও। আবু বাক্‌র (রাঃ) বলেন, তারা সবাই বললেন, আনানও বটে। তিনি বলেন, তোমাদের ও আস'মানের মাঝে তোমরা কত দূরত্ব মনে করো? তারা বলেন, আমরা অবগত নই। তিনি বলেন, তোমাদের ও আসমা'নের মাঝে ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এক আসমান থেকে তার ঊর্ধ্বের আস'মানের দূরত্বও তদ্রূপ। এভাবে তিনি সাত আস'মানের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আকাশের উপর একটি সমুদ্র আছে যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার ব্যবধান (গভীরতা) দু' আস'মানের মধ্যকার দুরত্বের সমান। তার উপর রয়েছেন আটজন ফেরেশ্‌তা, যাদের পায়ের পাতা ও হাঁটুর মধ্যকার ব্যবধান দু' আসমা'নের মধ্যকার দুরত্বের সমান। তাদের পিঠের উপরে আল্লাহ্‌র আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নিচের ব্যবধান (উচ্চতা) দু' আসমা'নের মধ্যকার দুরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ্‌। [১৯১]

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৯৩

আসমানের এই দূরত্বের ইউনিট কি অথবা কোন মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে বলা সে ব্যপারে কোন সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন গতিতে উর্দ্ধোলোক গমনের গতির হিসাবে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়কাল ধরা হয়েছে, এসব ব্যপারে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন।

Al-Hasan narrated that:

Abu Hurairah said: "Once when the Prophet of Allah was sitting with his Companions, a cloud came above them, so the Prophet of Allah said: 'Do you know what this is?' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'These are the clouds that are to drench the earth, which Allah [Blessed and Most High] dispatches to people who are not grateful to Him, nor supplicate to Him.' Then he said: 'Do you know what is above you?' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'Indeed it is a preserved canopy of the firmament whose surge is restrained.' Then he said: 'Do you know how much is between you and between it?' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'Between you and it [is the distance] of five-hundred year.' Then he said: 'Do you know what is above that.' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'Verily, above that are two Heavens, between the two of them there is a distance of five-hundred years' – until he enumerated seven Heavens – 'What is between each of the two Heavens is what is between the heavens and the earth.' Then he said: 'Do you know what is above that?' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'Verily, above that is the Throne between it and the heavens is a distance [like] what is between two of the heavens.' Then he said: 'Do you know what is under you?' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'Indeed it is the earth.' Then he said: 'Do you know what is under that?' They said: 'Allah and His Messenger know better.' He said: 'Verily, below it is another earth, between the two of which is a distance of five-hundred years.' Until he enumerated seven earths: 'Between every two earths is a distance of five-hundred years.' Then he said: 'By the One in Whose Hand is the soul of Muhammad! If you were to send [a man] down with a rope to the lowest earth, then he would descend upon Allah.' Then he recited: He is Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir Al-Batin, and He has knowledge over all things."

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَغَيْرُ، وَاحِدٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا " . فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " هَذَا الْعَنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الأَرْضِ يَسُوقُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْكُرُونَهُ وَلاَ يَدْعُونَهُ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهَا الأَرْضُ " . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّ تَحْتَهَا الأَرْضَ الأُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرَضِينَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ رَجُلاً بِحَبْلٍ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللَّهِ " . ثُمَّ قَرَأَ (هو الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ وَيُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالُوا إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ . عِلْمُ اللَّهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ فِي كِتَابِهِ .

Grade: **Da'if** (Darussalam)

English reference : Vol. 5, Book 44, Hadith 3298
Arabic reference : Book 47, Hadith 3611

Narrated Al-Abbas ibn AbdulMuttalib: I was sitting in al-Batha with a company among whom the Apostle of Allah (peace be upon him) was sitting, when a cloud passed above them. The Apostle of Allah (peace be upon him) looked at it and said: What do you call this?

They said: Sahab.

He said: And muzn? They said: And muzn. He said: And anan? They said: And anan. AbuDawud said: I am not quite confident about the word anan. He asked: Do you know the distance between Heaven and Earth? They replied: We do not know. He then said: The distance between them is seventy-one, seventy-two, or seventy-three years. The heaven which is above it is at a similar distance (going on till he counted seven heavens). Above the seventh heaven there is a sea, the distance between whose surface and bottom is like that between one heaven and the next. Above that there are eight mountain goats the distance between whose hoofs and haunches is like the distance between one heaven and the next. Then Allah, the Blessed and the Exalted, is above that.

Sunan Abu Dawud 2:475

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই সাত আসমানকে পৃথিবী সৃষ্টির পর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু’দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার

খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।
অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা

[হা-মীম সিজদাহ 9-12]

এ বিষয়ে আমরা প্রথম ও ২য় পর্বে বিশদ আলোচনা করেছি, যার জন্য পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এ বিষয়টি একদম সাংঘর্ষিক। কাফিরদের কথিত বিজ্ঞান অনুযায়ী বিগব্যাং এর অনেক পরে মহাশূন্য সৃষ্টির কোটি কোটি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর পর পৃথিবী সৃষ্টি হয়। এই দলিলই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মিথ্যাচার এবং আল্লাহ প্রদত্ত হক্ক ইল্মের মাঝে পার্থক্য দ্বার করিয়ে দেয়। কাফিরদের কথা মহাশূন্য নামক আকাশ সৃষ্টি হয় সবার আগে, আর আল্লাহ বলেন, আকাশ সৃষ্টি হয় দুনিয়া সৃষ্টির পরে। এখানেই স্পষ্ট হয় উভয় পরস্পর সাংঘর্ষিক বৈপরীত্যপূর্ন স্বতন্ত্র সৃষ্টিতত্ত্ব।

২০১২ সাল, ক্রো৭৭৭ চ্যানেলের এডমিন তার ক্যামেরায় চাদের উপর অদ্ভুত তরঙ্গের প্রবহমানতা প্রত্যক্ষ করেন।।তিনিই সর্বপ্রথম বিষয়টি নিয়ে হইচই ফেলেন। প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে তার ক্যামেরার ত্রুটি মনে করা হলেও অন্যান্য ক্যামেরাতেও একই ফলাফলের জন্য সে ধারনা পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বের হাজারো শার্প আইড লোকেরা একই ফেনোমেনা তাদের ক্যামেরাতে লক্ষ্য করেন। একে নাম দেওয়া হয় 'Lunar Wave'[১]। বিষয়টি এরূপ যে, চাদকে জুম করে স্থিরভাবে লক্ষ্য করলে একরকমের ঢেউয়ের প্রবহমানতাকে দেখা যায়। সেসব ঢেউ চাদের উপরে আড়াআড়িভাবে বহমান।দেখলে মনে হবে, সেখানে পানির একটি স্তরের উপরে চাদের অবস্থান। সেই লিকুইডের তরঙ্গের জন্য এবং চাদের মৃদুমন্দ শীতল আলোয় জমিনে দাঁড়িয়েই লুনার সার্ফেসে তরঙ্গ বইতে দেখা যায়। ঢেউ গুলো চাদের সার্কুলার স্ফেরয়েড আকৃতিকে বেষ্টন করে হচ্ছে না, অর্থাৎ এই সুক্ষ্ম ঢেউ গুলো বক্র নয়। বরং হোরাইজন্টাল। সুতরাং পুরো আকাশ জুড়েই এরূপ হচ্ছে, যা প্রখর দিবালোকে দর্শনযোগ্য নয়।
এই ফেনোমেনাকে কেন্দ্র করে 'হলোগ্রাম সান-মুন'সহ অনেকগুলো উদ্ভট এবং হাস্যকর কন্সপাইরেসি থিওরিও গজিয়েছিল। যাহোক, সেদিকে যাচ্ছিনা।

এ ব্যাপারে মেইনস্ট্রিম সাইন্স কমিউনিটি থেকে কোন রেস্পন্স নেই। অধিকাংশই এর অস্তিত্বেরই স্বীকৃতি দিতে চায় না।

শুধু এটাই না, রাতের আকাশে চাদকে জুম লেন্সড ক্যামেরা দ্বারা জুম করলে চাদকে মনে হয় যেন একটি পানির স্তরের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। একইভাবে কথিত গ্রহ ও তারকারাজিদেরকে যখন ক্যামেরায় ও টেলিস্কোপে জুম করা হয়, দেখে মনে হয় যেন সেসব পানির স্তরের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। সমুদ্রের পানির নিচে গিয়ে সূর্যকে যেভাবে কাঁপতে দেখা যায় ঠিক সেরকম। কথিত গ্রহের ব্যাপারে যেসব কথা শেখানো হয় সেসব সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়[১]। এ বিষয়গুলো এতটুকুন ধারনা দেয় যে, হয়ত আমাদেরকে আকাশ বলতে যা শেখানো হয়(ইনফিনিট ভ্যাকুয়াম স্পেস/মহাশূন্য) তা সত্য নয়। হয়ত আমাদের মাথার উপর সুবিশাল পানির স্তর আছে। এবং আকাশ আদৌ মহাশূন্য নয়, বরং সুরক্ষিত জমাট তরঙ্গায়িত মজবুত ছাদ। তারকারাজি, সেই পানির তরঙ্গে সন্তরনশীল।
এবার আসুন আসমানের ব্যপারে কুরআন সুন্নাহ কি বলে?

ইমাম আহমদ(র) বর্ননা করেন যে,আবু হুরায়রা(রাঃ) বলেন, "একদিন আমরা রাসূল(সাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে তিনি বললেনঃতোমরা কি জান এগুলো কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূল(সঃ)ই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "এগুলো হচ্ছে মেঘমালা।পৃথিবীর দিক-দিগন্তপ থেকে এগুলোকে হাকিয়ে নেওয়া হয় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর বান্দাদের নিকট যারা তাকে ডাকে না। " তোমরা কি জান তোমাদের উর্ দ্ধদেশে এটা কি? " আমরা বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূল(সঃ) অধিকতর জ্ঞাত। এটি হচ্ছে সুউচ্চ জমাট ঢেউ,এবং সুরক্ষিত ছাদ.... "
**ইমাম তিরমিযী(রঃ) সহ একাধিক আলিম এ হাদিসটি বর্ননা করেছেন।*
(আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা,প্রথম খন্ড পৃঃ৭২-৭৩ দ্রষ্টব্য)

আকাশ সম্পর্কে এক হক্বপন্থী আলিমের অসাধারণ বক্তব্য-
"অনেক বিজ্ঞানীরা বলে, আকাশ বলতে কি (?) মহাশূন্য,মহাশূন্য শূন্যের শূন্য। এই আসমান বলতে অন্য কিছু নাই। কিন্তু কুরআন কি বলছে শুনুন। কুরআন বলছেঃ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (আন নাবাঃ১২)
-আমি তোমাদের মাথার উপরে সাতটা কঠিন আসমানের স্তর রেখেছি।
সূরা মুলকের ৩নং আয়াতে আছেঃ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

ও সূরা নূহের ১৫ নং আয়াতে আছে, أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا -
তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন।
সাত আসমান, শুধু সাত আসমান আছে তা(ই) না, সাত আসমান কি কি দিয়ে তৈরি সেইগুলো পর্যন্ত তাফসীরের কিতাবে আছে। প্রত্যেকটা আসমান আল্লাহ কি দিয়ে তৈরি করেছেন, আল্লাহু আকবর। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) হাদিসে সবগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছেন। প্রথম আসমান সম্পর্কে দুই রকম রেওয়ায়ত আছে। আল্লাহর রাসূল(সঃ) বলছেন, প্রথম আসমানটা মওজুন মাগফুফুন। প্রথম আসমানটা হচ্ছে মওজুন মাগফুফুন,পানি দিয়ে তৈরি। পানি।। এজন্য পানি যখন দূরের থেকে দেখা যায় তখন কি দেখা যায়? নীল দেখা যায়। আমরা যখন প্লেনে চড়ি,সাগরের উপর দিয়ে যখন প্লেনগুলো যায়,নিচে কি দেখা যায়? নীল (রঙ) দেখা যায়। নীল আকাশের মতই দেখা যায়। এজন্য প্রথম আসমান পানি দিয়ে তৈরি, বরফ হতে পারে। আরেক রেওয়ায়ত আসছে, 'মিন জুজাজাতিন', কাচের তৈরি।
প্রথম আসমানটা? কাচের তৈরি। এই প্রথম আসমান পর্যন্ত গিয়ে আল্লাহর রাসূল(সা) থামলেন।"[২]

-শাইখুল হাদিস মুফতি জসীমউদ্দিন রাহমানি(হাফিঃ)

[উল্লেখ্য,শায়খ জসীমউদ্দিন রহমানি (হাফি) এর সাথে আর্টিকেলটির মূল বক্তব্য ও ননরিলিজিয়াস কোন ডকুমেন্ট এর ব্যপারে বিশ্বাসগত সংশ্লিষ্টতা নাও থাকতে পারে]

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখছেন বলা হচ্ছে আকাশ বলতে সীমাহীন শূন্যতা নয় বরং এক সমুন্নত তরঙ্গায়িত পানি/কাচের ছাদকে বোঝায়। আর লুনার ওয়েভ ফেনোমেনন এ সকল ইসলাম ভিত্তিক অদৃশ্যজগতের তথ্যকে সত্যায়ন করতঃ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।
দুর্বল বর্ননার হাদিসগুলোতে আসমানের যে তরঙ্গ বা উর্মিমালার বর্ননা পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে আমরা রিয়েলিটিতেই স্পষ্টভাবে ক্যামেরার ফ্রেমে দেখছি।
হেনেসী কমার্শিয়ালে চমৎকার ভিডিওটির লিংক না দিলেই নয়,যেখানে আসমানকে পানিপূর্ন ছাদ হিসেবে দেখানো হয়েছে যা মেইনস্ট্রিম কস্মোলজি ও সাইন্টিফিক তথ্যের সম্পূর্ন বিপরীত। দেখুনঃ
https://m.youtube.com/watch?v=30xqqjosCLQ

কাফেররা কুফরি করতেই পছন্দ করে। এজন্য তারা ভিডিও কমার্শিয়ালটির ০.৪৬ সেকেন্ডে

দেখিয়েছে যে আকাশভেদ করে অন্যত্র বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।
অথচ **আল্লাহ বলেন,**
"হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না"(৫৫:৩৩)
[আয়াতটি কিয়ামত পরবর্তী বিচার দিবসকে নির্দেশ করে, যার জন্য সন্দেহবাদী মোডারেট ইসলামিস্টরা বলে,' এরূপ এনক্লোজড ব্যবস্থাপনা বিচার দিবসের জন্য শুধু প্রযোজ্য' , এজন্য তারা আউটার স্পেস-হেলিওসেন্ট্রিক বিলিফকে ইসলাম দ্বারা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বিজ্ঞানকে ঠিক রাখতে গিয়ে বস্তুত ভ্রান্তির জালে আটকা পড়ছেন।
যেহেতু **আল্লাহ বলেন,"**
সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে"(২১:১০৪)। অর্থাৎ কিয়ামতে সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বিচার দিবসে তিনি আবারো একইভাবে প্রথমবারের ন্যায় সৃষ্টি করবেন। যেহেতু সূরা আর রহমানের ৩৩ নং আয়াতে বিচার দিবসে পালিয়ে আসমান,যমীন ভেদ করে যাবার পথ নেই বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন,এবং এখানে সূরা ২১ এর ১০৪ নং আয়াতে পুনরায় কিয়ামত পূর্বের ন্যায় একইভাবে সৃষ্টি করবেন বলেছেন, সেহেতু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কিয়ামতপূর্বেও আসমানজমিন এনক্লোজড ছিল যার একই পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে বিচারদিবসে। অতএব বুঝতেই পারছেন, মোডারেট ইসলামিস্টরা মিথ্যাকে শুদ্ধ করতে গিয়ে আরো বড় গলদ করে বসছে!(আসমানের দরজা যে বন্ধ, তা নিয়ে সামনে বিস্তারিত আসছে)]

আমরা ইতোপূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে আসমান পানি বা স্ফটিকের ছাদ। নিচের আয়াতে চাঁদ সূর্যের ব্যপারে সাতার কাটার বিষয়টি পুরো ব্যাপারটির তথ্যশিকলকে আরো শক্তিশালী করে।
আল্লাহ বলেনঃ
"সূর্যের পক্ষে সম্ভব না চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে"(৩৬:৪০)

এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক যে, চাঁদ সূর্য পানিপূর্ন আসমানে সন্তরনরত। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস রয়েছে,যা পরবর্তী পর্ব গুলোয় নিয়ে আসা হবে, ইনশাআল্লাহ।
এরূপ ধারনা করা হচ্ছে যে গোটা পৃথিবী-আসমানকে পানি ঘিরে রেখেছে[৩]। পূর্বোল্লিখিত পর্বে দেওয়া অনেক কুরআন সুন্নাহর দলিল এ কথাই বলে।

জনৈক প্রফেসর সাবমেরিনে করে সমুদ্রপৃষ্ঠে গিয়ে এক অদ্ভুত আন্ডারওয়াটার লেকের সন্ধ্যান পেয়েছেন, যা ভেদ করে নিচে যাওয়া যায় না।। উলটো সাবমেরিনকে ধাক্কা দিয়ে উপরের দিকে ঠেলে দেয়[৪]।
খুব সম্ভবত আসমানও ঠিক একই ভাবে জমাট পানির প্রাচীর স্বরূপ অর্থাৎ হাদিসে উল্লিখিত 'জমাট ঢেউ/তরঙ্গ'।

তারকারাজির মিটিমিটি প্রজ্বালনও বলে দেয়, আসমান পানি দ্বারা পরিপূর্ণ। ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আর্টিকেল প্রকাশ করেছি এ বিষয়ে যে, নক্ষত্ররাজির মধ্যে গ্রহ বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব নেই। বরং সবই আসমানে গাঁথা বাতিস্বরূপ(তাফসির ইবনে কাসিরেও এরূপ এসেছে যে, আসমানের গায়ে নক্ষত্রসমূহ গাঁথা)।

অন্ধকার রাত্রে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। জমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। পানি এবং খাদ্যদ্রব্যও তিনি বের করেছেন। সূরা হা-মীম সাজদায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকাশের পূর্বেই জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে যমীনের বিস্তৃতিকরণ আকাশ সৃষ্টির পরে ঘটেছে। এখানে এটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ক্লোজআপ ফুটেজেও সবগুলোকে প্রবল কম্পনের সাথে মিটিমিটি জ্বলতে দেখা যায়, যেমনি আমরা খালি চোখেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। কখনো পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? সূর্য ওই অবস্থায় ঐরূপ দেখতে যেমনটি তারকাদের দেখা যায়। অর্থাৎ অবশ্যই একটা পানির স্তরের নিচে থেকে আলোকে যেমনি দেখায় তারকারা ঐরূপ[৫]।

ক'দিন আগে নিচে প্রদত্ত লিংকের ফুটেজটি দেখে বিস্মিত হই। একটি রকেট আসমান পানে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আকাশে প্রবল ঢেউ সৃষ্টিপূর্বক থেমে যায় অথবা রকেটটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভিডিওটি দেখলে এরূপ মনে হবে যেন রকেটটি লিকুইড কোন স্তরে আছড়ে পড়েছে।
রিপল গুলোকে গভীরভাবে দেখলে বুঝবেন এটাকে বিস্ফোরন পরবর্তী শকওয়েভ বলা যায় না। কারন একটি বিস্ফোরণ পরবর্তী শকওয়েভ প্রধানত একটি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু ভিডিওটিতে রকেটটির বিস্ফোরন পরবর্তীতে উদ্ভূত রিপল বা তরঙ্গ/ঢেউ শকওয়েভ থেকে একদম

ভিন্ন। বরং এই ঢেউ একদম পানির ন্যায়। তবে অত্যন্ত ঘন লিকুইডের। পানিতে কিছুর পতনে যেমনি একাধিক রিপল তৈরি হয়।যেন সত্যিই পানিতে ভারী কিছু আছড়ে পড়েছে। হাত থেকে ছোট পাথর কনা স্থির জলাশয়ে ফেললে এরকম একাধিক রিপল ইফেক্ট তৈরি হয়। তবে আসমানের এই পানির সার্ফেসটেনশন অত্যন্ত শক্তিশালী অনেকটা দুর্ভেদ্য। আল্লাহু আ'লাম, হয়ত রকেটটি পানির তৈরি মজবুত সুউচ্চ ছাদেই আছড়ে পড়ে।[৬]

গত কয়েক বছর আগে একটি হাই অলটিটিউড হিলিয়াম বেলুনে ক্যামেরা লাগিয়ে উপরে পাঠানো হয়েছিল। সেটা হঠাৎ যেন শক্ত কিছুতে সশব্দে ধাক্কা খেয়ে ক্র্যাচিং এর শব্দ করছে। দেখে মনে হয় কিছু একটা এটাকে আর উপরে যেতে দিচ্ছে না।যেন ক্যামেরাসমেত বেলুন ইনভিজিবল কোন শিল্ডে বারবার ঘর্ষিত হচ্ছে।[৭]

এছাড়া, অপেশাদার বেসামরিক রকেট স্পেস এক্স সংগঠনটি একটি ড্রোন রকেট আসমান পানে সোজাসুজি প্রেরন করে। আপনারা জানেন যে রকেট গুলো ২০ মাইল পার হতে না হতেই নাক বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে হোরাইজন্টালভাবে যেতে শুরু করে। অর্থাৎ কোন রকেটই সোজাসুজিভাবে আসমানে পাঠানো হয়না। স্পেস এক্সের এই রকেটটি ৭৩ মাইল পর্যন্ত উচুতে গিয়ে পৌছায়, এবং সলিড কোন কিছুতে সশব্দে আঘাত হেনে উর্দ্ধমুখী গতি শূন্যতে গিয়ে যমীনে ফিরে আসে[৮]।

এর পূর্বে ৭২ মাইলের উচ্চতায়ও কোন বিমান, বেলুন বা অন্যকিছু পৌছায়নি, উইকিপিডিয়ার হাইয়েস্ট এলিভেশন রেকর্ডের ডেটা অনুযায়ী। অর্থাৎ সেদিক দিয়ে বলা যায়, এই ড্রোন রকেট বিগত রেকর্ডসমূহ ভাঙ্গে। এই রকেট যাতে ধাক্কা খায়, সেটা আসমান কিনা, আল্লাহই ভাল জানেন। অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য লাগবে, কেননা হাদিসে ৫০০ বছর বা ৭৩ বছরের পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের বক্তব্য এরূপ যে, কোন জিনিস সর্ব নিম্ন গতিতেও যদি সঞ্চালিত হয়, তবে সেটা ৫০০ বছর সময়ের অনেক পূর্বেই ৭৩ মাইলে গিয়ে পৌছবে। একটা বিষয় হচ্ছে, আসমান গম্বুজাকৃতির বা উল্টানো কনকেইভ শেইপড। এর কার্ভাচার আছে, সমতল যমীনের সব স্থান থেকেই আসমান একই দূরত্বে হবে না। যমীনের প্রান্তসীমার দিকে বা আসমানের শেষ সীমার দিকে যমীন থেকে এর দূরত্ব খুব কম হবে। আবার মাঝের দিকে আসমানের উচ্চতা বা দূরত্ব অনেক বেশি হবে।

Tanwir al Miqbas এর 50:41 আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে,

(And listen on) O Muhammad, so that you can hear the description of it; it is also said that this means: strive, O Muhammad, for the day when the angel

blows the Trumpet (the day when the crier crieth from a near place) close to heaven, from the dome of Jerusalem, which is the closest spot on earth to heaven by about 12 miles; and it is also said this means: from a close distance from which they can hear from beneath their feet.

অর্থাৎ জেরুজালেম থেকে আসমান সর্বাধিক নিকটতম, যার দূরত্ব যমীনের উপরে ১২ মাইল! [ওয়া আল্লাহু আ'লাম]। এর দ্বারা পৃথিবীর ম্যাপের ব্যপারে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়, এসবের সুস্পষ্ট উত্তর আল্লাহই ভাল জানেন। এর দ্বারা একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ৭৩ মাইল উপরেই এ্যামেচার দ্রোন রকেটের ধাক্কা লাগার বস্তু আসমান হতেই পারে। ১২ মাইলের তুলনায় ৭৩ মাইল অনেক বেশি। আমরা জানিনা ৭৩ বছরের পথ অথবা ৫০০ বছরের পথ কিসের ভিত্তিতে। এসবের ব্যপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

উপোরোল্লিখিত শাইখের বর্নিত হাদিসে
দু রকম বর্ননা পাওয়া যাচ্ছে। ১. আসমান পানির তৈরি, ২.কাচের তৈরি। এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে আসমানের প্রথম আবরনটি স্ফটিক কাচ জাতীয় কিছু দ্বারা নির্মিত,এবং উপরে পানি দ্বারা পূর্ন। যেমনটা কাফেররা বিদ্রুপ করে দেখিয়েছে সিম্পসন কার্টুনে[৯]।

অতএব দেখা যাচ্ছে হাদিস গুলোর মধ্যে সাংঘর্ষিকতা নেই, জ্ঞানগতসীমাবদ্ধতার জন্যই আমরা আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছুতে কন্ট্রাডিকশন খুজে পাই। বরং প্রতিটি হাদিস একটু আধটু অতিরিক্ত তথ্য দেয়।
এবার রিয়েলিটিতে আসুন। স্কাই স্টোনের নাম শুনেছেন? নীল বর্ণের রহস্যময় অদ্ভুত পাথর। এর নাম দেওয়া হয়েছে আসমানী পাথর বা স্কাই স্টোন।
আফ্রিকার একটি দেশে এর সর্বপ্রথম দেখা মেলে। কিছু গবেষক এটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে গবেষনায়। তারা এ পাথর বা স্ফটিক বিশ্লেষনে ৭৭% অক্সিজেন পান! ৭৭ সংখ্যাটা ইন্টারেস্টিং বিশেষ কারনে। যাহোক, অন্য একটি অজানা পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে যা দুনিয়াতে কখনো পাওয়া যায় নি। গবেষকরা ওই পদার্থের ব্যপারে কিছুই জানেন না।[১০]

এসব অদ্ভুত তথ্য গলাধঃকরণের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা অন্যখানে।
আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের মাথায় 'আউটার স্পেস,ইনফিনিট এভার এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স এবং মহাশূন্য- আসমান মানেই শূন্য' ইত্যাদি এমনভাবে মস্তিষ্কে জায়গা করে নিয়েছে যে, এর

বিকল্প অন্য কিছু আমরা ভাবতেও অক্ষম। আমরা আজ এতটাই চিন্তাশক্তিহীন ব্রেইনওয়াশড যে কল্পনাই করতে পারি না আসমান ছাদের ন্যায় কিছু। এরূপ ব্রেইনওয়াশিং এর ক্রেডিট পাবার যোগ্য হলিউড আর টিভি। কেন সেটা ভাল করেই জানেন। বই পত্র যতটা না মনে দাগ কাটতে পারে, তার চেয়েও গভীর দাগ কাটে, মুভি আর ভিডিও। ওরা যা দেখায় তার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমান নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান প্রতিপালক তার প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাবে স্পষ্টভাবে বলেনঃوَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

এবং[শপথ] সমুন্নত ছাদের,(আত তুরঃ৫)

আল্লাহ বলেনঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২১:৩২]

সুতরাং,এটা স্পষ্ট যে আসমান অবশ্যই "শূন্য", "বায়ূমন্ডলের স্তর" বা এ জাতীয় কিছু নয়, বরং এটা সুবিশাল মজবুত ছাদ।

প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত অপবিজ্ঞান আমাদেরকে আকাশ বলতে উন্মুক্ত-অসীম ভ্যাকুয়াম স্পেসকে বোঝায় যার বিস্তার শুরু হয়েছে 'বিগব্যাঙ' নামের যাদুশাস্ত্রের অনুসারী, তথা কাব্বালিস্টদের স্ক্রিপচার(জোহার)থেকে নেওয়া কাল্পনিক কুফরভিত্তিক ঘটনা থেকে। এ বিজ্ঞানের ভাষায় আসমান বলতে আদৌ নিরেট কিছুকে বোঝায় না। বরং তাদের ভাষায় 'মহাশূন্যের' অসীম শূন্যতাই আসমান।।এ ব্যপারে পাঠকরা উত্তম জানেন।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা স্পষ্টভাবে একে যমীনের উপর ছাদ বলেছেন। এটা আদৌ শূন্য/স্পেস জাতীয় কিছু নয় বরং সলিড মজবুত ছাদ। বাস্তবিক পর্যবেক্ষনেও এটাই সত্য বলে দেখা যায়, যে ফেনোমেননগুলো উপরেই উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ বলেনঃ **"যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে..."**[2.22]

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২১:৩২]

। তিনি আসমানকে যমীনের উপর ছাদরূপে বানিয়ে রেখেছেন। যেমন-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি আকাশকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছি এবং আমি প্রশস্ত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী।" (৫১ঃ ৪৭)

আর এক জায়গায় বলেছেনঃ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا

অর্থাৎ "শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তার।" (৯১ঃ ৫) আরো বলেনঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ -

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ "তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই?" (৫০ঃ ৬)

قبة বলা হয় ছাদ ও তাঁবু খাড়া করাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলামের 'বেনা' বা ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে।" যেমন পাঁচটি স্তম্ভের উপর কোন ছাদ বা তাঁবু দাঁড়িয়ে থাকে।

অতঃপর এই যে আকাশ, যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটা সুউচ্চ ও নির্মল।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আকাশ কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হচ্ছে তরঙ্গ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।" [১]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আসমান ও যমীনে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যে গুলি মানুষের চোখের সামনে বিদ্যমান, অথচ তারা সেগুলি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" অর্থাৎ তারা মোটেই চিন্তা গবেষণা করে না যে, কত প্রশস্ত, সুউচ্চ ও বিরাট এই আকাশ তাদের মাথার উপর বিনা স্তম্ভে আল্লাহ তাআ'লা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। অতঃপর ওকে সুন্দর সুন্দর তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। ওগুলির কিছু কিছু স্থির আছে এবং কিছু কিছু চলমান রয়েছে। সূর্যের কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। যখন ওটা বিদ্যমান থাকে তখন দিন হয় এবং যখন ওটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন রাত্রি হয়। এই সূর্য শুধু মাত্র একদিন ও রাতে সারা আকাশকে প্রদক্ষিণ করে। ওর চলন ও তীব্রতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর সৃষ্ট এই ফিজিক্যাল ডোম ফার্মামেন্ট(গম্বুজাকৃতির আকাশ) এর ফিজিক্যালিটির ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকে না যখন আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে(৮১:১১)

প্রিকোপার্নিকান কস্মোলজি অনুযায়ী বাস্তব আকাশ কোন শূন্য/অসীম কিছু নয় বরং তা ত্রুটি(ফাটল/ছিদ্র)হীন সলিড স্তম্ভবিহীন ভেঙ্গেপড়বার যোগ্য মজবুত ছাদ।
আল্লাহ বলেন-
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ। [সূরা নাবাঃ১২]

আল্লাহ বলেনঃ
"তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা সাবা ৯)

রহমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এখানে আকাশের খন্ডাংশের পতনের কথা এনে আরো ভালভাবে ক্ল্যারিফাই করেছেন। বস্তুত আসমান ছাদ বিশেষ, যদিও মোডারেট ও মর্ডানিস্ট মুসলিমরা কাফিরদের সাথে গলা মিলিয়ে উল্টোটা বলতেই পছন্দ করে। আল্লাহ যা বলেছেন, সেটা আধুনিক (অপ)বিজ্ঞানের সাথে অতিমাত্রায় সাংঘর্ষিক এবং একদমই বিপরীত। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আপনার আশপাশের ফাকাস্থান বা শূন্যস্থান আপনার উপর ভেঙে পড়তে পারে!!? আপনি কি বিশ্বাস করেন, ভ্যাকুয়াম স্পেস বা কথিত মহাশূন্যের শূন্যস্থান ভেঙ্গে পড়ার মত অবান্তর কথা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলতে পারেন?! বরং সত্য হচ্ছে কাফিররা সম্পূর্ন বিপরীত ও অসত্য কস্মোলজি ও কস্মোজেনেসিসের কথা মানুষকে শেখায় যা আজ মুসলিমরাও আকড়ে ধরেছে, আফসোস!
আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির(রহঃ) বলেনঃ

তিনি তো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন! এরূপ অবাধ্য বান্দা কিন্তু এরূপ শাস্তিরই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর অভ্যাস। তিনি মানুষকে অবকাশ দিচ্ছেন মাত্র। যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, আছে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যোগ্যতা আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ

সৃষ্টিতে সন্দেহ পোষণ করতেই পারে না যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে। আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্যে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি প্রথমবার হাড়-গোশত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেগুলো সড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর আবার ঐগুলোকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম হবেন না? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى

অর্থাৎ "যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই (তিনি সক্ষম)।"(৩৬ ঃ ৮১)

আল্লাহ আসমানের ভঙ্গুরতার ব্যাপারে আরো বলেনঃ

আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।(সূরা শূরা ০৫)

একমাত্র আকাশ হিসেবে সলিড সিলিংই ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হতে পারে,শূন্য অসীম ভ্যাকুয়াম স্পেস নয়।ইবনে কাসির রহঃ বলেনঃ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যমীন ও আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁরই দাস এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর সামনে সবাই বিনীত ও বাধ্য। তিনি সমুন্নত, মহান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অবস্থা এই যে, আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাঁদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং মর্তবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ বলেনঃ

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا 90

হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে।[১৯:৯০]

আল্লাহ বলেনঃ

অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।(সূরা বনী ইসরাইলঃ৯২)

ইমাম ইবনে কাসির(রহঃ) এ আয়াতের ব্যখ্যায় বলেনঃ

সামূদ সম্প্রদায় তাদের নবীকে যে উত্তর দিয়েছিল ঐ উত্তরই এই লোকগুলোও তাদের নবীকে দিলো। তারাও নবী (আঃ)-কে বললোঃ "তোমাকে কেউ যাদু করেছে। তোমার জ্ঞান ঠিক নেই। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আর আমাদের তো বিশ্বাস যে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেননি। আচ্ছা, তুমি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকো তবে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও দেখি? আসমানী শাস্তি আমাদের উপর নিয়ে এসো।"

যেমন কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলঃ "আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত না তুমি আরবের এই বালুকাময় ভূমিতে নদী প্রবাহিত করবে।" এমনকি তারা এ কথাও বলেছিলঃ "অথবা তুমি আকাশের একটা খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ করবে যেমন তুমি ধারণা করছো অথবা আল্লাহ কিংবা ফেরেশতাদেরকে সরাসরি আমাদের সামনে নিয়ে আসবে।" অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ "তারা বলেছিল–হে আল্লাহ! যদি এটা তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ হতে একটা টুকরা আমাদের উপর নিক্ষেপ কর।" অনুরূপভাবে ঐ কাফির অজ্ঞ লোকেরা বলেছিলঃ "তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।" নবী (আঃ) উত্তরে বলেনঃ তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তা ভালরূপে অবগত আছেন।

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও(শু'আরাঃ ১৮৭)

বিজ্ঞানপন্থী মোডারেট/মর্ডানিস্ট ফিতনাবাজরা এত শক্তিশালী কুরআনিক দলিল পেয়ে বলবে, ' হ্যা আমরা স্বীকার করি আসমান সলিড, কিন্তু উহা এখনো কেউ দেখেনি, বিজ্ঞানও আবিষ্কার করেনি, কারন ওটা ধরাছোঁয়ার সবার বাইরে।' ওরা হাদিসের দলিলও দেবে এই বলে যে আসমান ৫০০ বছরের পথ দূরে অবস্থিত,সেটা ধরাছোঁয়ার বাহিরে আছে দেখা তো দূরের কথা।কিন্তু আল্লাহ রহমানের আয়াতগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে, ভূমিতে দাড়িয়েই যে কারও দ্বারা উপরিস্থিত আসমানকে দেখা সম্ভব। অর্থাৎ আমরা মাথার উপরে নীল যে আকাশকে দেখি। যা কুরআন সুন্নাহর বর্ণনানুযায়ী নিরেট এবং মজবুত। এর সাথে ইবনে কাসীর(রঃ) এবং ইবনে জারীর তাবারী(রঃ)

সহ সাহাবীগনও(রাযি.) একমত পোষন করেন। যদিও মোডারেটরা এটা মানতে চায় না।

মোডারেট ভন্ডরা যেহেতু বিজ্ঞানকে বাচানোর জন্য বলে যে এই ভঙ্গুর আসমান আমাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে এবং বিজ্ঞানীরাও এখনো আবিষ্কার করেনি, তাদের সেক্ষেত্রে জবাব কি হবে (?)যখন আল্লাহ বলছেন,তিনি আসমানকে স্থির রাখেন পৃথিবীর উপর যেন তার আদেশব্যতিত পতিত না হয়! অর্থাৎ আকাশ যেন শুধু জমিন বা বিস্তৃত শয্যাক্ষেত্রের উপরেই ছাদের ন্যায় রয়েছে।অর্থাৎ সম্পূর্ন পৃথিবীকেন্দ্রিক(জিওসেন্ট্রিক)।

আল্লাহ বলেনঃ

"..তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্টে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান" (সূরা হাজ্জ্ব ৬৫)

মানুষের প্রতি করুনাশীল সৃষ্টিকর্তা দুনিয়ার ছাদকে স্থির অবস্থায় রাখেন যেন তা পৃথিবীর উপরে ভেঙ্গে না পড়ে, একবার এটা হেলিওসেন্ট্রিক মেইনস্ট্রিম কস্মোলজির সাথে মিলিয়ে ভাবার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পূর্ন ভিন্ন আসমানের কথা বলেছেন, যা কাফিরদের গড়া মেইনস্ট্রিম কস্মোলজির বিপরীত । মেইনস্ট্রিম পার্স্পেক্টিভ থেকে এটা কিভাবে চিন্তা করা যায়? ধরুন কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের সুবিশাল আকাশকে বালির কনার সদৃশ পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়ে!! এরূপ বর্ননা একদমই মেইনস্ট্রিম এস্ট্রোনমির ক্ষেত্রে নিতান্তই হাস্যকর। নিশ্চয়ই এটা অকাট্য দলিল যে আকাশ সলীড/নিরেট জমিনের উপর ছাদবিশেষ। আল্লাহ বলেন, তিনি আসমানকে জমিনের উপর স্থির রাখেন। যদি এরূপ চিন্তা করেন যে আল্লাহ আমাদের আশপাশের ফাকা-শূন্যস্থান এবং ভ্যাকুয়াম আউটার স্পেসকে স্থির রাখেন যেন তা মানুষের উপর পতিত না হয়, তবে সেটা মেইনস্ট্রিম শয়তানি কস্মোলজিক্যাল থিওরির সাথেই সাংঘর্ষিক এবং অযৌক্তিক!
ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন। ওটা যমীনের উপর পড়ে যাচ্ছে না। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আসমান যমীনের উপর পড়ে যাবে এবং যমীনের অধিবাসী সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এটা তাঁর পরম করুণার পরিচায়ক,

মেইনস্টিম মিথ্যা এস্ট্রোনোমিকাল আইডিয়ার সাথে কুরআনের নিচের আয়াতটি কিভাবে কম্বাইন করে প্রচার করবেন?

তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে এটা তো পুঞ্জীভুত মেঘ।(সূরা আত তূর ৪৪)

মোডারেটরা ও মর্ডানিস্টরা যেহেতু কুফফারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মেইনস্ট্রিম মহাকাশ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী,এবং যেহেতু তারা কুফফারদের বলা আকাশ ও কুরআনে বর্নিত আকাশের মধ্যে সমন্বয় করে দাবি করে যে, সলিড আসমান হয়ত আছে তবে তা ধরা ছোয়া ও দৃষ্টিসীমার বাইরে, সেহেতু উপরের আয়াতের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করলে, কিভাবে তূলনামূলকভাবে বালির কণার চেয়েও ক্ষুদ্র এবং মহাশূন্যে ভেসে বেরানো দুনিয়ার উপরে মিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের সুবিশাল আকাশের খণ্ডাংশ ভেঙ্গে পড়ে অথচ কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই কাফেররা ইহা দেখে বলে পুঞ্জিভূত মেঘ!/? ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের ঔদ্ধত্য, জিদ ও হঠধর্মীতে এতো বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবে না। তারা যদি দেখতে পায় যে, আকাশের কোন টুকরা শাস্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর শাস্তির সত্যতা স্বীকার করবে না। বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, যা পানি বর্ষাবার জন্যে আসছে।

সুতরাং সত্য হচ্ছে ভঙ্গুর আসমান, যা জমিনের উপরে দৃষ্টিসীমার মাঝেই স্তম্ভ ছাড়াই আল্লাহর আদেশে বিদ্যমান, যাকে আমরা মেঘমুক্ত আকাশে নীলবর্নের দেখতে পাই। আর এটা যে আমাদের **দৃষ্টিসীমার ভেতরেই**,সেটা আল্লাহই স্বয়ং বলেছেনঃ

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি?"[সূরা মুলকঃ৩]

আয়াতের ব্যখ্যায় ইবনে কাসির (রহঃ) বলেনঃ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর নীচ করে সৃষ্টি করেছেন, একটির উপর অপরটিকে। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় উক্তি এই যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি পর্যন্ত দূরত্ব রয়েছে। সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে। মি'রাজের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। বরং তুমি দেখবে যে, ওটা সমান রয়েছে। না তাতে আছে কোন হের-ফের, না কোন গরমিল। আবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখো তো, কোথাও কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ হয় তবে বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ বারবার দৃষ্টি ফিরালেও তুমি আকাশে কোন প্রকারের ত্রুটি দেখতে পাবে না এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে।

অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু চলাফেরা করে এবং কতকগুলো স্থির থাকে।

১. অন্য জায়গায় এই রিওয়াইয়াতটিই হযরত কাতাদাহ (রঃ)-এর নিজের উক্তি বলে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ.... (১৩:২)

আল্লাহ তাআ'লা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা স্তম্ভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন।

আকাশকে তিনি যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন! শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেউ রাখে না। দুনিয়ার আকাশ সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দুরত্ব হচ্ছে পাঁচ শ' বছরের পথ। সবদিকেই ওটা এতোটা উঁচু। ওর পুরু ও ঘনত্বও পাঁচ শ' বছরের ব্যবধানে আছে। আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাঁচ শ' বছরের পথ। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচ শ' বছরের পথের দূরত্বে অবস্থিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ

অর্থাৎ "আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীনও রয়েছে।" (৬৫ঃ ১২)

হাদীস শরীফে রয়েছে যে, সাতটি আকাশ এবং ওগুলির মাঝে যা কিছু রয়েছে সেগুলি কুরসীর তুলনায় এইরূপ যেইরূপ কোন প্রশস্ত ও বিরাট ময়দানে কোন একটা বৃত্ত। আর কুরসী আরশের তুলনায় তদ্রুপ। আরশের পরিমাপ মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের বর্ণনা রয়েছে যে, আরশ হতে যমীনের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।

আল্লাহ বলেন:

"তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই"[সূরা ক্বাফ ৬]

ইবনে কাসির(রহঃ) বলেনঃ

এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ওর চেয়েও নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেনঃ তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখো, ওর নির্মাণ কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং লক্ষ্য কর যে, ওর কোন জায়গায় কোন ছিদ্র বা ফাটল নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

اَلَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَاتَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ـ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِیْرٌ ـ

অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?" অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৬৭ ঃ ৩-৪)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলা-দোলা না করে । কেননা, যমীন চতুর্দিক হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে।

তাছাড়া, Tanwir Al Miqbas এ আল আকসা থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব উল্লেখ আছে মাত্র ১২ মাইল(যমীনের সবচেয়ে নিকতম), এতে প্রমান হয় আসমান আমাদের দৃষ্টিসীমার মাঝেই রয়েছে। আমরা সেই ত্রুটিহীন নীল আসমানি মজবুত ছাদকেই খালি চোখে দেখি।

আকাশের কোন অংশ ভেঙ্গে পড়ার আয়াত জিওসেন্ট্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমান করে। আকাশের physical solidness এর প্রমান মেলে কিয়ামত সংক্রান্ত আয়াতেঃ

আল্লাহ বলেনঃ

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْرًا

সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।(সূরা তূর ৯)

ভূমিকম্পের ন্যায় আকাশের প্রকম্পন নিরেট আকাশের অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

আল্লাহ বলেনঃ
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে(সূরা মুরসালাতঃ৯)

আল্লাহ এখনকার নিশ্ছিদ্র ও ত্রুটিহীন আবদ্ধ আকাশকে কিয়ামতের সময়ে বিপরীতরূপ করবেন। যারা আজ কাফিরদের বৈপরীত্যপূর্ন আকিদাকে সত্য বলে অর্থাৎ যারা আকাশের নিরেট অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারা সে সময় উপস্থিত থাকলে সত্যিই বিস্মিত হবে।
জানি না, সে অবস্থায় তারা কোন লজিক দিত!

আল্লাহ বলেনঃ
"এবং আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে।"
[সুরা হাককাহ্, আয়াত ১৬]

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন ওটা লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ করবে;"[সুরা রহমান, আয়াত ৩৭]

"সেদিন আকাশ হবে গলিত রুপার মত,"[সুরা মাআরিজ, আয়াত ০৮]

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে'(২১:১০৪)

আকাশ নিরেট ম্যাটেরিয়াল সলিড ছাদ বিশেষ যা অবশেষে কাগজের ন্যায় গুটিয়ে নেওয়া হবে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমান! অথচ ওরা এরপরেও মিথ্যাকে সত্য প্রমান করতে বিতর্ক করতে থাকবে।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, এটা কিয়ামতের দিন হবে। তিনি বলেনঃ আমি আকাশকে গুটিয়ে নেবো। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

অর্থাৎ "তারা আল্লাহর সেইরূপ মর্যাদা দেয় নাই যেইরূপ তাঁর মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন তাঁর মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশ সমূহ তাঁর দক্ষিণ হস্তে গুটানো থাকবে, তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।" (৩৯ঃ ৬৭)

হযরত ইবনু ওমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত যমীনকে স্বীয় মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করবে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে হবে।" [১]

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা সপ্ত আকাশ ও ওগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলুক এবং সপ্ত যমীন ও ওগুলির মধ্যস্থিত সবকিছু স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গুটিয়ে নিবেন, ওগুলি তাঁর হাতে শরিষার দানার মত থাকবে।" [২]

سِجِلّ দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাব। বলা হয়েছে যে, এখানে سِجِل দ্বারা ঐ ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যাঁর নিকট দিয়ে কারো ইসতিগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা উপরে ওঠার সময় তিনি বলেনঃ "এটাকে জ্যোতিরূপে লিপিবদ্ধ কর।" এই ফেরেশতা আমল নামার কাজের উপর নিযুক্ত রয়েছেন। যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনি তার কিতাব (আমলনামা) অন্যান্য কিতাবগুলির সাথে গুটিয়ে নিয়ে কিয়ামতের দিনের জন্যে রেখে দেন। একথাও বলা হয়েছে যে, এই নাম হচ্ছে ঐ সাহাবীর যিনি রাসূলুল্লাহর (সঃ) ওয়াহী লেখক ছিলেন। কিন্তু এই রিওয়াইয়াতটি প্রমাণিত নয়। হাদীসের অধিকাংশ হা'ফিয এটাকে মাওযূ' বা বানোনা কথা বলেছেন। বিশেষ করে আমাদের উসতাদ আল হা'ফিযুল কাবীর আবুল হাজ্জাজ মুয্যী (রঃ) এটাকে মাওযূ' বলেছেন। আমি এই হাদীসকে একটি পৃথক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনু জারীরও (রঃ) এই হাদীসের উপর খুবই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বহুভাবে এটাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সিজ্জ্ল নামের কোন সাহাবীই নেই। রাসূলুল্লাহর (সঃ) সমস্ত ওয়াহী লেখকের নাম সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হয়ে রয়েছে। তাঁদের কারো নামই সিজ্জ্ল নেই। বাস্তবিকই ইমাম সাহেব খুব সঠিক কথাই বলেছেন। এ হাদীসটি অস্বীকৃত হওয়ার এটা একটি বড় কারণ। এমন কি এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, যিনি এই সা হাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তিনি এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই তা করেছেন। যখন এই হাদীসই প্রমাণিত নয় তখন উল্লিখিত নামও সম্পূর্ণরূপে

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ভুল প্রমাণিত হলো। সঠিক কথা এটাই যে, سِجِلّ দ্বারা সাহীফা'কেই বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাস্সিরেরও এটাই উক্তি। এর আভিধানিক অর্থও এটাই। সুতরাং অর্থ হলোঃ সেই দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। لَام এখানে عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ এখানেও لَام এসেছে عَلٰى এর অর্থে। অভিধানে এর আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। প্রথমে সৃষ্টি করার উপর আমি যখন সক্ষম ছিলাম তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আমি আরো বেশী সক্ষম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আর প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি এটা পালন করবই।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান। ভাষণে তিনি বলেনঃ "তোমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার সামনে উলঙ্গ পায়ে ও উলঙ্গ দেহে এবং খৎনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য, আমি তা পালন করবই'।"[১] সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।

এক হাদিসে এসেছেঃ

حدثنا مسدد، سمع يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني منصور، وسليمان، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله، أن يهوديا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت

نواجذه ثم قرأ {وما قدروا الله حق قدره}. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
যে, এক ইয়াহূদী নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ ক্বিয়ামাতের দিনে আসমানগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর, গাছগুলোকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং বাকী সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের ওপর তুলে বলবেন, বাদশাহ্ একমাত্র আমিই। এতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি দেয়নি।
ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন, এ বর্ণনায় একটু যোগ করেছেন ফুদায়ল ইব্নু আয়ায... আবিদাহ (রহঃ) সূত্রে 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে যে, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিস্মিত হয়ে তার সমর্থনে হেসে দিলেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯০৯)

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭৪১৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আল্লাহ এখানে কাগজের সাথে তুলনা করে গুটিয়ে নেওয়ার বিষয়টি দ্বারা সুস্পষ্ট করলেন এর ফিজিক্যাল সলিড এক্সিস্টেন্সের ব্যপারটি। তাহলে কি 'সজ্ঞানে' কাব্বালার অনুসরণকারী আজকের মুসলিমরা বলতে চায় ওদের বিশ্বস্ত কাফিরদের বলা অস্তিত্বহীন সীমাহীন 'শূন্যের শূন্য মহাশূন্য'কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কাগজের ন্যায় ভাঁজ করবেন!(?) নাকি বায়ুরস্তরকে ভাঁজ করবেন!? কত বড় উদ্ভট বিকৃত ধারনা! মনে রাখবেন ওরা তারা, যারা বিগব্যাং এর মত কুফরি(কাব্বালিস্টিক- tzim tzum) কস্মোজেনেসিসকেও ইসলামাইজড করে! ওরা এবার বলতে শুরু করবে যে আল্লাহর এসকল বর্ননা গুলো রূপক! অর্থাৎ আর যাই হোক কাব্বালিস্টিক এস্ট্রোলজিক্যাল কস্মোলজিকে ছাড়বে না। আমরা যতদিন আকাশকে গম্বুজাকৃতির ছাদ বলেছি,

ততদিন ওদেরকে চরম বিরুদ্ধাচারন করতে দেখেছেন। ওদের লেখক গুরুজনেরাও রহমানের আয়াত ব্যবহার করে এতদিন কাফেরদের সাথে তাল মিলিয়ে ইনফিনিট এম্পটি স্পেসকে প্রমানের চেষ্টা করেছে, ওরা বলেছে উহা এটমোস্ফিয়ার, সলিড ফিজিক্যাল আসমান বা ছাদ কখনোই নয়। প্রমানস্বরূপ এই লিংকে গিয়ে দেখুন, নাস্তিক মুর্তাদরা যখন কাফেরদের নৌকায়(allegory) ওঠা মুসলিমদের প্রশ্ন করে, 'তোমরা এই নৌকায় কেন?' এর উত্তরে কত সুন্দরভাবে কাব্বালিস্টিক কস্মোলজি অবলম্বনের যুক্তি দেয় দেখুনঃ http://islamicnewblogad
dress.blogspot.com/2016/12/meaning-sky-as-tentdome-in-quran.html

কিন্তু এখন সুর হালকা পালটেছে, কারন কাফেরদের সুরে চলতে হবে যে...!

পশ্চিমা কাফিরদের মধ্যে জিওসেন্ট্রিক মডেলে বিশ্বাসীদের মধ্যে এই কথা প্রচলিত আছে যে, অপারেশন হাই জাম্পের পরে, বিশ্বের অর্থ-রাজনৈতিক ও মতাদর্শ নিয়ন্ত্রণকারী কাফিররা যখন নিশ্চিত হয়েছে যে উপরে মজবুত ছাদ বিদ্যমান, তখন ওরা আকাশে নিউক্স ফাটিয়ে আকাশ ভাঙার চেষ্টাও চালায়। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও সত্য। এই অপারেশনের কোড নেমঃ Operation Fishbowl। এতে ওরা ব্যর্থ হয়। কিন্তু কল্পনা এবং কম্পিউটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এই ভুয়া কস্মোলজির প্রোপাগান্ডা অব্যাহত রেখেছে কস্মোলজিক্যাল মিস্টিসিজমে ডুবিয়ে রাখার জন্য। চন্দ্র অভিযান সহ অনেক নাটক জনগনকে হজম করানো হয়েছে। ওরা এখন না স্বীকার করে পারছে না উপরের আচ্ছাদনের বাধাকে। একে নাম দিয়েছে ভ্যান এ্যালেন বেল্ট।

কি আর করা বলুন! কাব্বালিস্টিক কস্মোলজিতে বিশ্বাসী নবধারার মুসলিমগনের অদেখা জগতের ব্যাপারে কাফিরদের উপর অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা থেকে তো বেরোনো যাবে না। কাফের মুশরিকরা যা বলে সেগুলোকে যেকোনভাবেই ইসলামীকরন করতেই হবে। তাই না?! করেছেনও। একাজে নিয়োজিত নতুন ধারার মুসলিম ভাইবোনদের গুরুরা একাজে পিছিয়ে থাকেন না। গিয়ে দেখে আসুন, এতদিন এদেরকে দেখেছেন যে ২:২২ নং এর বর্ননায় আসা গম্বুজাকৃতি ছাদকে স্বীকারই করতে চাইত না। এমনকি সাহাবীদের(রাঃ) ব্যাখ্যার রেফারেন্স দিলেও অস্বীকার করত, অথচ আজ কাফেরদের ভ্যান এল্যেন বেল্টের বর্ননাকে সংগতিপূর্ণ করতে ডোম কন্সেপ্টকে এডমিট করে। কিন্তু 'খিচুড়ি কন্সেপ্ট' রেখেই। পড়ুনঃ
https://www.islamweb.net/en/article/193468/the-well-guarded-sky-a-miracle-of-the-quran
এখন বলতেছে,ভ্যান এলেন বেল্টই গম্বুজাকৃতির ছাদ যা স্পেসের বিভিন্ন বস্তু প্রবেশে বাধা দেয়! আচ্ছা, স্ফেরিক্যাল পৃথিবীর চারপাশে তাহলে কয়টা গম্বুজাকৃতি ছাদ আছে যা স্ফেরিক্যাল শেপকে

বেষ্টন করে?! এ প্রশ্ন এ জন্যই আসছে কেননা, গোলাকার বলকে একটি মাত্র গম্বুজাকৃতির বেষ্টনী দ্বারা চারদিক দিয়ে বেষ্টন করা সম্ভব না।

The Well-Guarded Sky – A Miracle of the Quran
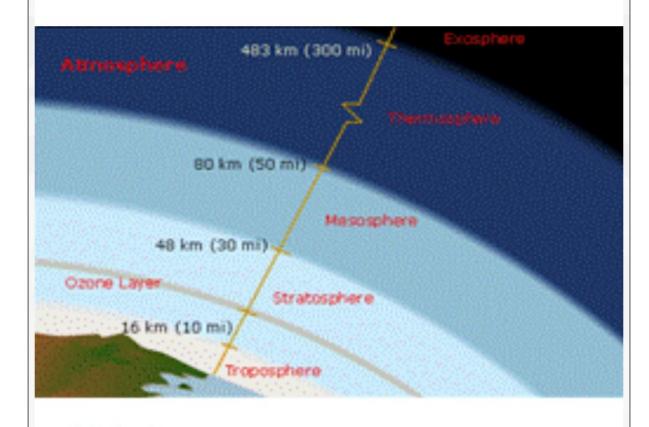
Publish date: 12/01/2014
Sections: Miraculousness
Rate: ★★★★★

এরকমই প্যারাডক্সিক্যাল প্রশ্ন তৈরি হবে এবং হতে থাকবে যতক্ষন, অর্ধেক কাফিরদের বিদ্যা এবং অর্ধেক আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি শিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলবে।
এই আর্টিকেলেই সুরক্ষিত ছাদের নানান মনগড়া সুডোসাইন্স চাটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। এমনকি পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা সত্যায়নে Dr Hugh Ross এর মত কাফেরের কথার রেফারেন্স আনতেও ভুল করেনি। খানিকটা কপি করে দিলাম:
"In fact, the Earth has the highest density of any of the planets in our Solar System. This large nickel-iron core is responsible for our large magnetic field. This magnetic field produces the Van-Allen radiation shield, which protects the Earth from radiation bombardment. If this shield were not present, life would not be possible on Earth. The only other rocky planet to have any magnetic field is Mercury—but its field strength is 100 times less than the Earth's. Even Venus, our sister planet, has no magnetic field. The Van-Allen radiation shield is a design unique to the Earth. (The Incredible Design of the Earth and our Solar System)"

২২:৬৫ এরও মনগড়া অদ্ভুত ব্যাখ্যাও দিলো যার সাথে আয়াতের কোন সম্পর্কই নেই। আয়াতে আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আকাশের পতন রোধ করেন আর ওরা বানিয়েছে উল্কা/ অন্যান্য পদার্থ পতন থেকে আল্লাহ দুনিয়াকে বাচায়!!! এদের অপব্যাখ্যা এতই নিম্নমানে পৌছেছে যে মানুষকে গাধা, আর গাধাকে মানুষ সাব্যস্ত করবার মতন অবস্থা তৈরি হয়েছে। আউজুবিল্লাহ!

প্রদত্ত প্রথম লিংকে দেখেছেন কিভাবে প্রগতিশীল মর্ডান ঘরানার মুসলিমগন গম্বুজাকৃতির আসমানকে অস্বীকার করেছে। এরপরে দেখেছেন কাফেরদের কথাকে ইসলামাইজড করতে গিয়ে কিরূপে ডোম ফার্মামেন্টেরই করাপ্টেড ব্যাখ্যা দিয়েছে ওই এটমোস্ফিয়রিক লেয়ারের এক্সপ্ল্যানেশনকে কেন্দ্র করেই। এবার দেখুন অভিশপ্ত শিয়াদের বিভ্রান্তি। । স্বয়ং এক কাফের ওদের ওয়েবে প্রশ্ন করে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। একজন তো এম্পটি স্পেসকে কুরআন এর সাথে কম্প্যাটিবল করতে এক অভিনব যুক্তি দিল। বলল, সারা স্পেসই তো এটমিক উপাদান দ্বারা ভরা। সেসব তো সাবএটমিক লেভেলে ফিজিক্যাল এন্টিটিই, সে হিসেবে ভ্যাকুয়াম এম্পটি স্পেস বা আকাশ হচ্ছে সলিড ছাদ। মোটকথা বায়ুমন্ডলের স্তরই হচ্ছে আসমানগুলোর ৭ স্তর। পড়ুনঃ
https://www.shiachat.com/forum/topic/234968269-quran-thinks-the-sky-a-phyical-object/

ইসলামিকবোর্ড[১৭] ওয়েবসাইটে প্রশ্ন করা হয় আসমান গম্বুজসদৃশ এবং নিকটবর্তী কিনা। উত্তরে হলিউডের সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম, ওয়ার্মহোল, পোর্টাল, স্পেস টাইম কন্টিনিউয়াম ইত্যাদি নানা কুফফারদের তত্ত্ব আনা হয় কুরআন সুন্নাহর দলিলের ব্যাখ্যায়! আর গম্বুজাকৃতির আসমান কিনা সেটাকে অবজারভারের পার্স্পেক্টিভ হিসেবে বলা হয়।
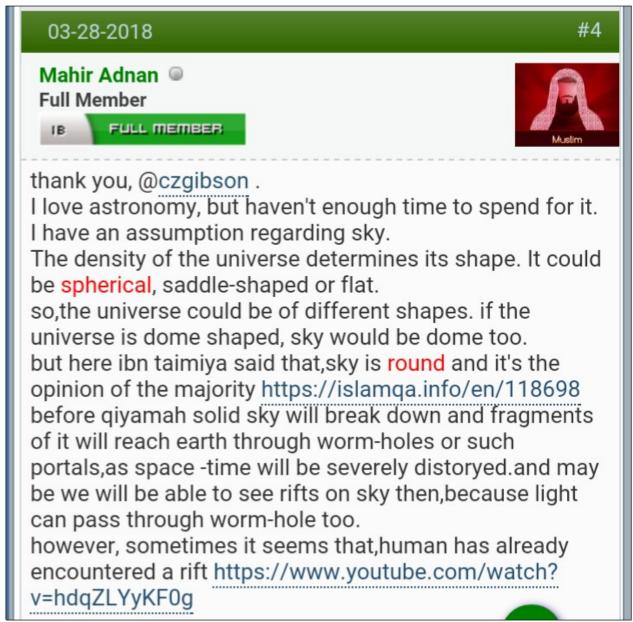
Have they not looked at the heaven above them - how We structured it and adorned it and [how] it has no rifts? [50:6]

No, the heaven above is the space becuase the adornament refers to the stars. Had there been a rift in space, it would have been seen even with the naked eye. You should have seen enough sci-fi movies to know a rift in space-time continuum to have an idea.

> *imam tabari wrote in tafsir of sura baqarah (ayat 22) that, ibn masud, ibn abbas (ra.) and katadah (rah.) said that the sky is like a dome. Are those sahih?*

i don't know about sahih or not but if you were to stand

এভাবেই নসের বিপরীতে কাফিরদের তত্ত্বের সাথে কম্প্যাটিবল চিন্তাকে গ্রহন করা হয়। অর্থাৎ যেভাবেই হোক কাফেরদের প্রদর্শিত রাস্তায় চলতে হবে, এটাই তাদের কাছে sacred knowledge! কাফেরদের ট্রোল পরিবর্তিত হলে ওরাও সাথে সাথে এডাপ্ট করে নেয়,আর বলে 'বিজ্ঞানময় কুরআন'! লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ! ওদের একটা যুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে, আর এটা যত দিনই যাবে কুরআনকেই সত্যায়ন করবে! কুরআনের দুর্বোধ্য ব্যখ্যাতীত বিষয়গুলোকেও ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করবে! এরা এ কথাও বলে, সাহাবীদের আসমান জমিন সংক্রান্ত বিশ্বাস প্রাচীন জিওসেন্ট্রিক, কেননা তাদের কাছে উন্নত প্রযুক্তি ছিল না, স্যাটেলাইট আবিষ্কৃত হয়নি,নবী(স) ছিলেন নিরক্ষর, এজন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দেখা মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যপারে তারা জ্ঞানহীন ছিল!! নাউজুবিল্লাহ!! আমরা নির্বোধদের কে বলি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কি আল্লাহর রাসূল(সাঃ) সপ্ত আসমান ছাড়িয়ে মিরাজে আল্লাহর কাছে নেন নি! তিনি কি তাকে অদেখা জগতের ব্যপারে কিছুই দেখান নি! তিনি কি সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে ভুল এবং মিথ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন রাসূল(সা) কে?! এবং আজ যা কাফিররা বলছে তা সত্য!!? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নিজেই তো আসমান ভেঙ্গে পড়ার কথা কুরআন মাজীদেই ইরশাদ করেছেন। অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত এসকল মুসলিম কি বলবে; আল্লাহও ভুল করেছেন!? নাউজুবিল্লাহ।
আমরা হালকা প্রদর্শন করেছি প্রতিষ্ঠিত সাইন্সের কোর টিচিং। আপনার কি মনে হয়, কিছু কুফরি

দর্শন(Natural philosophy) ও আকিদা কুরআন এর পবিত্র আয়াতগুলোকে সত্যায়ন করবে!? এরূপ চিন্তাশীলরা কতটা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধি মূর্খ!! যেখানে কাফেররা চায় এমন কিছু, যা শুধু কুরআনই নয়, আগের কিতাবগুলোকেও অসত্য প্রমান করবে, সেখানে কি করে ওই আশা করতে পারে!! মা'আযাল্লাহ!!

আমরা এতক্ষন আসমান নামের সলিড ছাদের অস্তিত্বের ব্যপারে উল্লেখ করেছি। আমরা এও বলেছি যে, আসমান যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ। এ কথার দলিল খুঁজতে, আমরা অবশ্যই সাহাবীদের(রাযি.) দ্বারস্থ হব। তারা ছিলেন হক্কের মাপকাঠি। আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء

অর্থাৎ, **"যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন"(২:২২)**

সাহাবীগনের আসমানের ব্যপারে আকিদা বা বিশ্বাস হচ্ছে, আসমান যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ।

আকাশকে যমীনের জন্য سماء বা আকাশ নামকরণ করা হয়েছে, তা তার উপর সমুচ্চ ও উর্ধ্বে স্থাপিত হওয়ার কারণে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা والسماء بناء-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যমীনের উপর আকাশের ছাদ হচ্ছে গম্বুজের আকৃতি সদৃশ্য। আর তা হচ্ছে যমীনের উপর ছাদ বিশেষ।

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী والسماء بناء-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ আকাশকে তোমার জন্য ছাদ করেছেন।

"হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ(রাঃ) ও কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্নিত আছে যে, তারা وَالسَّمَاء بِنَاء এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যমীনের উপর আকাশের ছাদ হচ্ছে গম্বুজের আকৃতি সাদৃশ্য। আর তা হচ্ছে যমীনের ছাদ বিশেষ।

কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্নিত আছে যে তিনি আল্লাহর বানী وَالسَّمَاء بِنَاء এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ আকাশকে তোমার জন্য ছাদ করেছেন।"

..................[তাফসীর ইবনে জারীর তাবারী ২:২২ দ্রষ্টব্য]

English:

حَدَّثَنِي مُوسَى بْن هَارُونَ, قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرو بْن حَمَّاد , قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ فِي خَبَر ذَكَرَهُ , عَنْ أَبِي مَالِك , وَعَنْ أَبِي صَالِح , عَنْ ابْن عَبَّاس , وَعَنْ مُرَّة , عَنْ ابْن مَسْعُود وَعَنْ نَاس مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَالسَّمَاء بِنَاء } , فَبِنَاء السَّمَاء عَلَى الْأَرْض كَهَيْئَةِ الْقُبَّة , وَهِيَ سَقْف عَلَى الْأَرْض وَحَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ , قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيد , عَنْ سَعِيد , عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْل اللَّه { وَالسَّمَاء بِنَاء } قَالَ : جَعَلَ السَّمَاء سَقْفًا لَك .

Musa ibn Harun narrated and said that Amru ibn Hammad narrated and said that Asbath narrated from al-Suddi in the report mentioned, from Abu Malik, and from Abu Salih, from ibn 'Abbas and from Murrah, from ibn Masud and from people of the companions of the prophet (peace and blessings be upon him):

"...and the sky a canopy..." The canopy of the sky over the earth **is in the form of a dome**, and it is a roof over the earth. And Bishr bin Mu'az narrated and said from Yazid from Sa'id from Qatada in the words of Allah "...and the sky a canopy..." He says he makes the sky your roof.

Tafsir al-Tabari for 2:22

অর্থাৎ আমরা যে এই আসমানকে গম্বুজ সদৃশ বলছি, এটা আমাদের মনগড়া কিছু নয়, বরং সরাসরি সাহাবীদের(রাঃ) আকিদা(বিশ্বাস)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

It is Allah who has created the earth as a place for you to live and the sky as a dome above you. He has shaped you in the best form and provided you with pure sustenance . This is Allah, your Lord. Blessed is Allah, the Lord of

the worlds.[40:64]

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী। অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্যে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন, যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, চলো, ফিরো এবং গমনাগমন কর। যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি যমীনকে হেলা দোলা হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে।

Tafsir Ibn kather 40:64

আল্লাহ বলেনঃ

"আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত।(রাদঃ২)

স্তম্ভকে সাধারণত সলিড কিছুকে ধারন করতে ব্যবহার করা হয়, স্তম্ভের প্রশ্ন তখনই আসে যখন কোন মজবুত প্রকাণ্ড স্ট্রাকচারকে উপরে ধরে রাখার প্রয়োজন পরে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার গম্বুজাকৃতির আকাশকে স্তম্ভের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।
মোডারেটদের এক যুক্তিওয়ালা 'মহাজ্ঞানী' বলেন,সমতল যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির আসমান এ আয়াতে এসে সাংঘর্ষিক হয়! তার বক্তব্য, গম্বুজের সার্কুলার প্রান্তসীমা তো যমীনকে স্পর্শ করে,তাহলে স্তম্ভ বিনা কি করে হয়!! এজন্য তিনি সাহাবীদের ব্যাখ্যাটি বর্জন করেন। উপরন্তু হাদিসটির বর্ননার বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন! তার উস্তাদ ন্যাক সাহেব বলেন, ইবনে জারীর(র) কোন মুফাসসির নন বরং উনি ইতিহাসবিদ! তিনি নাকি তার তাফসীরে(তাবারী) সকল আয়াতের সম্পর্কে ভুল শুদ্ধ -সত্য মিথ্যা 'ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ' সব রকমের বক্তব্য এনেছেন!!![১১]

অথচ তাফসীর তাবারির বিশুদ্ধতা, নির্ভরযোগ্য সনদ,সন্দেহজনক- দুর্বল সোর্স বর্জন,সরাসরি সাহাবি,তাবেইন, তাবে তাবেঈনদের থেকে বর্ননা ও ব্যাখ্যা গ্রহন এবং বিদাতহীন তাফসীরের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া(র),ইবনে খুজাইমা, ইমাম আত তাহাবী(র), ইবনে হাজার আল আস্কালানী(র),আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী(র)সহ প্রমুখ উলামা, মুহাদ্দিসিন ও মুফাসসিরীন।
বিস্তারিত দেখুনঃ https://islamqa.info/en/43778

এ বিষয়টা মোডারেট/মর্ডানিস্টদের মুখোশ খুলে দেয়।
মোডারেটরা ইমাম ইবনু জারীর তাবারী(রঃ) এর জন্য একটু বিব্রত হয় কারন তিনি সরাসরি সাহাবীদের থেকে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদিসগুলো এনেছেন যা ভন্ডদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যায় এবং উহা কুফফারদের কথার বিপরীতে থাকে। এজন্যই তাদের কাছে তিনি এলার্জিক।

গম্বুজাকৃতির আসমানের বিশ্বাসের বিষয়টি শুধু সাহাবীদেরই নয়। অতীতের জমহূর আলিম, মুফাসসীরগনও এটাই বিশ্বাস করতেন। তারা একেই কুরআন সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ন বলে উল্লেখ করেছেন। যারা বলতে চায়, গম্বুজাকৃতির আসমান স্তম্ভবিহীন আসমানের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক(!) এরা বস্তুত, সাহাবী(রাঃ), মুফাসসীরীন ও গ্রীক দর্শন আরবে প্রবেশ পূর্ব জমহূর উলামাদের চেয়েও বেশি বোঝেন! আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আইয়াস ইবনু মুআ'বিয়া (রঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। এই উক্তিটিই কুরআন কারীমের বাকরীতিরও যোগ্য বটে। এবং وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ .... الخ (২২ঃ ৬৫) এই আয়াত দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং تَرَوْنَهَا এই কথা দ্বারা আকাশে স্তম্ভ না থাকার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তম্ভে এই পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করছো।

"আইয়াস ইবনু মুআ'বিয়া (রঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। এই উক্তিটিই কুরআন কারীমের বাক্যরীতিরও যোগ্যও বটে এবং.... وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ (২২:৬৫) এই আয়াত দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয়।সুতরাং تَرَوْنَهُ এই কথা দ্বারা আকাশে স্তম্ভ না থাকার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তম্ভে এই পরিমান উচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা সচক্ষে অবলোকন করছ। এটা মহামহিমান্বিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতার একটি নিদর্শন। "
[তাফসীর ইবনে কাসিরঃপারা ১৩। পৃঃ ২৫৬]

অতএব, স্পষ্টত দেখছেন সাহাবীদের(রাঃ) থেকে আসা আয়াতের ব্যাখ্যা তথা হাদিস এবং পরবর্তী প্রাচীন আলেম উলামাগনের স্বীকৃতি। যার জন্য ইবনে কাসীরও(র) উল্লেখ করেন **"...আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। এই উক্তিটিই কুরআন কারীমের বাক্যরীতিরও যোগ্যও বটে "**। অর্থাৎ ইবনে কাসির(রহঃ) গম্বুজাকৃতির আসমানের

বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং দেখছেন মোডারেটরা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা যেন সাহাবী ও মুফাসসীরোনের চেয়েও বেশি বোঝে! মা'আযাল্লাহ! গম্বুজাকৃতির আসমান জমিনের প্রান্তসীমায় কিরূপ অবস্থায় আছে সেসম্পর্কে আমরা বেখবর, আর যেটা বিস্তারিত বলা হয়নি সেসম্পর্কে জানতেও খুব বেশি আগ্রহবোধ করিনা। আমরা শুনেছি এবং বিশ্বাস করেছি। ৪র্থ পর্বের শেষদিকে ক্বাফ পর্বত ও আসমানের ব্যাপারে কিছু আলোচনা গত হয়েছে।

<u>আসমান দুর্ভেদ্য সুরক্ষিত ছাদ, যার দরজা বন্ধ</u>
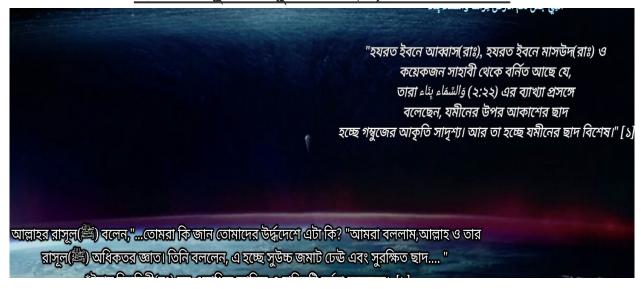
এই মজবুত আসমানি গম্বুজাকৃতির ছাদটি সুরক্ষিত বেষ্টনী। কোন কিছুই আল্লাহর অনুমতিতে ফেরেশতাদের দুয়ার খোলা ছাড়া উপরে যেতে পারে না। এটা আমরা মিরাজের হাদিসগুলোয় ভালভাবেই দেখি।প্রত্যেক আসমানে প্রহরী ফেরেশতারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আসমানের দুয়ার গুলো খোলে। আল্লাহ বলেনঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

"আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ

ফিরিয়ে রাখে" (আম্বিয়াঃ৩২)

21:32 (Y. Ali) And We have made the heavens as a canopy well guarded: yet do they turn away from the Signs which these things (point to)!

শয়তান জ্বীনরাও এটা ভেদ করতে অক্ষম। তারা উপরে গিয়ে আসমানি বার্তা গ্রহন করতে গেলেও মহা সংকটে পড়ে। আল্লাহ ওদের সম্পর্কে বলেনঃ

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا
আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে(সূরা জ্বীনঃ৮-৯)

আল্লাহ বলেনঃ

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি(হিজরঃ১৭)

আসমানে দরজা বা পথের অস্তিত্বের দলিলঃ

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ
পথবিশিষ্ট আকাশের কসম[আয যারিয়াতঃ০৭]

আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হবে হাশরের ময়দানে, যখন মালাইকাগন সারিবদ্ধ ভাবে যমীনে অবতরণ করবেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا
আকাশ উন্মুক্ত করা হবে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে(সূরা নাবা ১৯)

আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, অর্থাৎ এখন তা বন্ধ। কিয়ামতের দিন বহু দরজাবিশিষ্ট হওয়া আসমানের নিরেটভাবকে সত্যায়ন করে।
আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا
সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (ফুরকানঃ২৫)

এর দ্বারা প্রমান হয় যে, আসমানের দুয়ার বন্ধ। কিয়ামতের দিন আসমানকে বিদীর্ণ করে বহু দরজার সৃষ্টি করা হবে, যার মাধ্যমে ফেরেশতাগন অবতরণ করবেন যমীনে। ইমাম ইবনে কাসির বলেনঃ

"আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।" অর্থাৎ আকাশকে খুলে দেয়া হবে এবং তাতে ফেরেশতামণ্ডলীর অবতরণের পথ ও দরজা হয়ে যাবে।

আসমান প্রত্যেক খোলার জায়গা হতে ফেটে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ـ

অর্থাৎ "আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।" (৭৮ঃ১৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশে ছিদ্র ও গর্ত হয়ে যাবে এবং ওটা ফেটে যাবে। আরশ্ ওর সামনে থাকবে এবং ফেরেশ্তাগণ ওর প্রান্তদেশে থাকবেন, যে প্রান্তদেশ তখন পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়েনি। তাঁরা দরযার উপর থাকবেন এবং আকাশের দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন।

কিয়ামতের দিন যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যেসব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই সংবাদ দিচ্ছেন। এগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি যেমনঃ আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হওয়া এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া। সেই দিন ফেরেশতারা একত্রিত হওয়ার স্থানে সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে ফেলবেন। অতঃপর মহা কল্যাণময় প্রতিপালক বিচার-ফায়সালার জন্যে আগমন করবেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

هَلْ يَنظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তাদের নিকট মেঘের ছায়ার মধ্যে আগমন করবেন তারা শুধু এরই অপেক্ষা করছে।" (২ঃ ২১০)

আল্লাহ পাকের يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا -এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা দানব, মানব, পশু-পাখী এবং সমস্ত সৃষ্টজীবকে একই মাটিতে একত্রিত করবেন। অতঃপর দুনিয়ার আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং এই আকাশের অধিবাসীরা নীচে নেমে আসবে যাদের সংখ্যা দানব, মানব ও সমুদয় সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী হবে।

সুতরাং তারা দানব, মানব এবং সমুদয় মাখলূককে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এরপর দ্বিতীয় আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওর অধিবাসীরা নীচে নেমে আসবে। তারা তাদের পূর্বে অবতণকারী ফেরেশতাদেরকে ও জ্বিন, মানুষ এবং সমস্ত মাখলূককে পরিবেষ্টন করবে। আর এই দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসীদের সংখ্যা হবে দুনিয়ার আকাশের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী। তারপর তৃতীয় আকাশ ফেটে যাবে এবং ওর অধিবাসীরা নীচে অবতরণ করবে। তারা সংখ্যায় দ্বিতীয় আকাশের অধিবাসী, দুনিয়ার আকাশের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা অধিক হবে। তারা তাদের পূর্বে অবতারিত ফেরেশতাসমূহ, দানব, মানব এবং সমুদয় মাখলূককে পরিবেষ্টন করবে। অতঃপর অনুরূপভাবে প্রত্যেক আকাশই ফেটে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সপ্তম আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওর অধিবাসীরা নীচে নেমে আসবে যাদের সংখ্যা ছয় আকাশের অধিবাসী, দানব, মানব এবং সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী হবে। তারা তাদের পূর্বে অবতারিত আকাশসমূহের অধিবাসী, জ্বিন, মানুষ এবং সমস্ত মাখলূককে পরিবেষ্টন করবে। আর আমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালক মেঘমালার ছায়ায় অবতরণ করবেন এবং তাঁর চতুর্দিকে তাঁর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ থাকবেন যাঁদের সংখ্যা সপ্ত আকাশের অধিবাসী দানব, মানব ও সমস্ত সৃষ্টজীব অপেক্ষা বেশী হবে। বর্শার ফলকের গিঁটের মত তাঁদের শিং থাকবে। তাঁরা আরশের নীচে অবস্থান

করবেন। তাঁরা মহামহিমান্বিত আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল পাঠে এবং তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় লিপ্ত থাকবেন। তাঁদের পায়ের পাতা ও পায়ের গিঁটের মধ্যকার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। পায়ের গিঁট ও হাঁটুর মধ্যকার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। হাঁটু হতে কোমর পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। কোমর থেকে নিয়ে বুকের উপরের অস্থি পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। বক্ষের উপরোস্থিত অস্থি হতে কানের লতি পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব হবে পাঁচশ বছরের পথ। আর সেখান থেকে উপরের শেষাংশ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের পথ। জাহান্নাম এর অনুভূতি স্থল।"[১]

ইউসুফ ইবনে মাহরান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ এই আকাশ যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন

১. এভাবে এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা হতে ফেরেশতারা অবতরণ করবেন যাঁদের সংখ্যা মানব ও দানব হতে বেশী হবে। ওটা হলো কিয়ামতের দিন, যেই দিন আসমানের অধিবাসী ও যমীনের অধিবাসীরা মিলিত হবে। তখন যমীনবাসীরা জিজ্ঞেস করবেঃ "আমাদের প্রতিপালক এসেছেন কি?" তাঁরা উত্তরে বলবেনঃ "তিনি এখনো আসেননি, তবে আসবেন।" অতঃপর দ্বিতীয় আকাশ ফেটে যাবে। তারপর পর্যায়ক্রমে আকাশগুলো ফাটতে থাকবে। অবশেষে সপ্তম আকাশ ফেটে পড়বে। তখন ওর থেকে ফেরেশতারা নীচে অবতরণ করবেন যাঁদের সংখ্যা পূর্বে আকাশসমূহ হতে অবতারিত সমুদয় ফেরেশতা হতে এবং সমস্ত দানব ও মানব হতে বেশী হবে। তারপর নেতৃস্থানীয় ফেরেশতাগণ অবতরণ করবেন। অতঃপর আমাদের প্রতিপালক আটজন ফেরেশতা দ্বারা বহনকৃত আরশে চড়ে আসবেন। ঐ আটজন ফেরেশতার প্রত্যেকের পায়ের গিঁট হতে কাঁধ পর্যন্ত জায়গার দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের রাস্তা। ঐ ফেরেশতারা একে অপরের মুখের দিকে তাকাবেন না। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাথা নিজ নিজ হস্তদ্বয়ের মাঝে রেখে বলতে থাকবেনঃ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ অর্থাৎ "মহান ও পবিত্র বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।" তাঁদের মাথার উপর তীরের ন্যায় কিছু থাকবে এবং ওর উপর আরশ থাকবে।[১] প্রসিদ্ধ সূরের (শিঙ্গার) হাদীসে প্রায় এরূপই বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি যদি আসমানের দুয়ারগুলো খুলেও দেন যাতে তারা আরোহন করতে পারে, এরপরেও ওরা কুফরি করবে। আল্লাহ বলেনঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاء فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ
যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে [হিজরঃ১৪]

সুতরাং আসমানের দুয়ার সমূহ বন্ধ।

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি(আরাফঃ৪০)

আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার ভরে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না, অর্থাৎ তাদের সৎ আমল এবং প্রার্থনা উপরে উঠানো হবে না। পাপী ব্যক্তির রূহ্ কবয্ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ফেরেশতা ঐ রূহকে নিয়ে আকাশে উঠবেন এবং মালায়ে আ'লার যে ফেরেশ্তাদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করবেন তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন এই অপবিত্র রূহ্ কার? তখন তার জঘন্যতম নাম নিয়ে বলা হবে, অমুকের। শেষ পর্যন্ত আকাশে পৌছে বলবেন, দরজা খুলে দাও। কিন্তু দরজা খোলা হবে না।" যেমন ইরশাদ হচ্ছে– لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ অর্থাৎ "তাদের জন্যে আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না।"

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একটি জানাযার অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। আমরা কবরের কাছে পৌছলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে বসে পড়েন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়ি। আমরা এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করি যে, আমাদের মাথার উপর যেন পাখী বসে রয়েছে। (আমাদেরকে নীরব দেখে) তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল তা দিয়ে মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'কবরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর!' এ কথাটি দু'বার বা তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেনঃ "মুমিন যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে আখিরাতের দিকে যাত্রা শুরু করে তখন আকাশ থেকে জ্যোতির্ময় ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন। তাঁদের হাতে থাকে জান্নাতের কাফন।

জান্নাতের খোশবুও তাঁদের কাছে থাকে। তাঁদের সংখ্যা এতো অধিক থাকে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ফেরেশতাতেই ভরপুর থাকে। অতঃপর একজন ফেরেশ্তা এসে তার শিয়রে বসে পড়েন এবং বলেন– হে শান্ত ও নিরাপদ আত্মা! আল্লাহর ক্ষমার দিকে চলো। এ কথা শোনা মাত্রই আত্মা বেরিয়ে পড়ে যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে। যেমনই আত্মা বের হয় তেমনই চোখের পলকে ফেরেশ্তা তাকে জান্নাতী কাফন পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুগন্ধিতে তাকে সুরভিত করেন। মিশকের ঐ সুগন্ধি এতই উত্তম যে, দুনিয়ায় এর চেয়ে উত্তম সুগন্ধি আর হতে পারে না। তাকে নিয়ে ফেরেশ্তা আকাশে উঠে যান। যেখান দিয়েই তিনি গমন করেন সেখানেই ফেরেশ্তাগণ জিজ্ঞেস করেন, এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুকের। আকাশে পৌছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তাঁর সাথে অন্যান্য সমস্ত ফেরেশ্তাও দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত গমন করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম আকাশে পৌছে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমার এই বান্দার নামটি ইল্লীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি। ওর মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং ওর মধ্য থেকেই তাকে পুনরায় উত্থিত করবো।

এবার আসুন দেখা যাক হাদিসে কি এসেছে...

হযরত ইবনু আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে একটি লোক জিজ্ঞেস যে, "হে আল্লাহর রাসূল(সঃ)! এই আকাশ কি?" তিনি উত্তরে বলেন,"এটা হচ্ছে ঢেউ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।"

হাদিসটি মুসানাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্নিত হয়েছে।
(তাফসীর ইবনে কাসীর-পারা ১৭-সূরা আম্বিয়া এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)

قبة বলা হয় ছাদ ও তাঁবু খাড়া করাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলামের 'বেনা' বা ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে।" যেমন পাঁচটি স্তম্ভের উপর কোন ছাদ বা তাঁবু দাঁড়িয়ে থাকে।

অতঃপর এই যে আকাশ, যা ছাদের মত, তা আবার সুরক্ষিত ও প্রহরীযুক্ত, যাতে ওর কোন জায়গায় কোন ক্ষতি না হয়। ওটা সুউচ্চ ও নির্মল।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এই আকাশ কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "এটা হচ্ছে তরঙ্গ, যা তোমাদের হতে বন্ধ রাখা হয়েছে।" [১]

সুতরাং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এটা আদৌ আমাদের মনগড়া উক্তি নয়। বরং হাদিসেও এ কথাই আছে।

নূহ (আ) এর সময় মহাপ্লাবন সৃষ্টির সময় আসমানের দরজা খুলে দিয়ে ছিলেন, এতে আসমানি সমুদ্রের পানি দ্বারা যমীনে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ বলেনঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ

তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে[৫৪:১১]

. আকাশ হতে মুষল ধারের বৃষ্টির দরযা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উথালয়ে ওঠা পানির প্রস্রবণের মুখ খুলে দিলেন। এমন কি যা পানির জায়গা ছিল না, যেমন উনান ইত্যাদি হতে পানি উঠতে লাগলো। চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হলো না এবং যমীন হতে পানি উঠাও বন্ধ হলো না। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এটা চলতেই থাকলো। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময় আকাশ হতে পানির দরযা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। না এর পূর্বে কখনো এতো বেশী পানি বর্ষিত হয়েছিল, না এর পরে কখনো এরূপ পানি বর্ষিত হয়েছে। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলিয়ে দেয়। সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আকাশের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং ওগুলো দিয়ে অনবরত পানি বর্ষিত হতে থাকে।

আসমানের দুয়ার যেখানে বন্ধ, সেখানে কাফিররা রকেটের মাধ্যমে কথিত মহাশূন্যে যাওয়াকে কিভাবে দেখায়?
উত্তর হচ্ছে, হলিউডের বেইজমেন্টে। কম্পিউটারের গ্রাফিক্স ও থিয়েটারে। এগুলো সবই নাটক। আমরা তো জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির **শেষ পর্বে** পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছিলাম, এই রকেটের আবিষ্কারকের আকিদা-বিশ্বাস এবং কর্মকাণ্ড গুলোকে। বস্তুত, ওরা কাল্পনিক মহাকাশে যাবার কথা ছড়িয়ে আল্লাহর সৃষ্ট কনফাইন্ডমেন্টকে ভার্চুয়ালি ডিফাই করতে চায়। অর্থাৎ আল্লাহ যে ক্ষমতা দেন নি, সেটা করে দেখাবার দৃষ্টতা। আমরা আজ ওদের কার্যকলাপে বিশ্বাস করি এবং দ্বীনের সাথে সমন্বয়সাধন ঘটাই!

একাধিকবার শীর্ষস্থানীয় স্পেস এজেন্সিঃনাসার কর্মচারীদের মুখ থেকে বের হয়ে গেছে যে তারা এখন পর্যন্ত 'লো আর্থ অরবিট'ই অতিক্রম করতে পারেনি[১২]। লো আর্থ অরবিট কাফেরদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী পৃথিবী উপর ৯৯ মাইল থেকে ১২০০ মাইল রেঞ্জের আওতায়। ওরা যদি দুনিয়া ছেড়েই বের হতে না পারে, তাহলে চন্দ্রবিজয়(ওদের হিসাবে চাঁদ ২৩৮০০০ মাইল দূরে) কি করে হলো! তাও একবার না, ছয় বার!! জি, হলিউড বেজমেন্টে সবকিছুই হয়! ওদের হলিউডের অভিনয়কে সত্য শেখাতে মুসলিমদের মধ্যেও সার্কুলেট করা হয় নেইল আর্মস্ট্রং চাদকে দ্বিখণ্ডিত করার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন! এও শোনা যায়, তিনি নাকি ইসলামও গ্রহন করেন!!

যখন চন্দ্রগমনকারীদের বসিয়ে সাক্ষাতকার নেওয়া হচ্ছিল, তখন অলড্রিন, আর্মস্ট্রংদের মুখের অবস্থা দেখেছেন?
এদের কাছে একদল খ্রিষ্টান গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকার লোভ দেখিয়ে গস্পেল ছুয়ে চাদে যাবার সত্যতাকে শপথ করে বলতে বলে, তখন তো একজন ভোঁ দৌড় দিয়ে পলায়ন করে, আরেকজন ক্যামেরা বন্ধ করতে বলে। আরেকজন ঝগড়া করে কিল ঘুষি শুরু করে দেয়। ভণ্ডামি কাহাকে বলে! এই দৃশ্যগুলো সবই ধারন করা হয়েছে।[১৩]
ওদের বিশেষঅজ্ঞরা বলছেন, তারা ভ্যান এলেন বেল্টে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। এই বেল্ট অতিক্রম করতে তারা অরিয়ন নামের মহাকাশযান তৈরি করছে। চন্দ্রাভিযানে নাকি মহাকাশযানে ফয়েল জাতীয় শিল্ড ব্যবহার করা হয়েছিল। এরা আজকে ২০১৮ তে এসে বলছে, আমাদের হাতে ওই প্রযুক্তি নেই যা দিয়ে চাদে যাওয়া হয়েছিল। আমরা উহা ধ্বংস করে দিয়েছি।[১৪]

আজকে যেমন কস্মিক প্লুরালিজমের ফসল এলিয়েনদের অস্তিত্বে বিশ্বাস আনার জন্য সিনেমা,গল্প,ম্যাগাজিন তৈরি হয়, তেমনি চাদে যাবার নাটক তৈরির সময়েও মানুষের মনে এর সম্ভাবনার বিশ্বাস আনতে মিডিয়াতে অনেক কিছু দেখানো হয়।[১৫]

আজকে 'মঙ্গল নক্ষত্রে' মানুষ যাবার ভুয়া কন্সেপ্টের উপরে হলিউড অনেক ব্যস্ত আছে।অথচ আসমানি তরঙ্গায়িত ছাদ মানুষের জন্য বন্ধ। যদি একদম সোজা আসমান পানে কোন রকেট বা ড্রোন পাঠানো হয়, সেটার ক্ষেত্রে ঐরূপ ফলাফলই হবে যেরূপ সিভিলিয়ান স্পেস এক্স এর রকেটের ক্ষেত্রে হয়েছিল।
অথচ কাফিররা প্রচার করে ওরা চাঁদ মঙ্গল এবং আসমানের সর্বত্র জয় করে নিয়েছে। ওদের রোবট সর্বত্র গমন করে! বস্তুত, ওরা মিথ্যাবাদী বৈ আর কিছু নয়। উপরিউক্ত দলিলসমূহ ওদের সকল শয়তানি কর্মকান্ডের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাস যোগ্যতা শূন্য বিন্দুতে নিয়ে যায়।

আসমানে যেহেতু ওদের কোনই কর্তৃত্ব নেই সেহেতু রহমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ
নাকি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে[ছোয়াদঃ১০]

কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে তৈরি অসাধারন গ্র্যাফিক্যাল ডেপিকশান তৈরি করেছিলেন আব্দুল্লাহ নামের এক আলজেরীয় ভাই। লিংকঃ
https://m.youtube.com/channel/UCN_2XY-OXjwhwaYKKrFhdwg

এত কিছু জানবার পরেও একদল লোক থাকবেই, যারা রহমানের কালামের সরল অর্থ এবং সমগ্র নসের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে কাফিরদের কল্পনা,শয়তানের কথা ও কম্পিউটারে বানানো ইমেজ/এনিমেশনে বিশ্বাস করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

বিভ্রান্তি এবং ফিতনা সেখান থেকেই হয় যেখানে নসের তুলনায় আকল আর নফসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আরবে গ্রীক এস্ট্রোনমি পৌছানোর পরবর্তীতে আলিমদের মধ্যে যারাই জ্যোতির্বিবিদের সাথে ইসলামিক সৃষ্টিব্যবস্থাকে মেলাতে গেছেন তাদেরকে দেখবেন বিনা দলিলে নিজের যুক্তিনির্ভর আকলকে প্রাধান্য দিয়ে নসের বিপরীতার্থক অর্থকে নিয়ে ভিন্ন মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা এমনকি ইজমায় রূপায়ন পর্যন্ত করেছেন। ইবনে হাজম, ইবনুল মুনীর প্রমুখ আলিমগন বলেন, আলিমগনের মধ্যে ঐক্যমত্য রয়েছে যে আসমান গোল বলের ন্যায়![১৬] তাদের দলিল হচ্ছেঃ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ।
অর্থাৎ তারা ফালাক্কের কথা উল্লেখ পেয়ে আসমানের বর্তুলাকারের কল্পনা করেছেন। সেটাকেই প্রাধান্য এবং প্রচার করেছেন। তাদের কয়েকজন একই কাজ পৃথিবীর ক্ষেত্রেও করেছেন।

অথচ অন্যদিকে কাতাদা(রঃ),মুজাহিদ(রঃ), মুয়াবিয়্যাহ(রঃ) প্রমুখ জমহূর আলিম উলামাগন আসমানকে বলেছেন যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ। একই কথা পাওয়া যায় একাধিক সাহাবীদের(রাঃ) থেকে। এমতাবস্থায় আমরা নসের দিকে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করি।

কাফিররা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। ওরা আল্লাহর ব্যপারে বিচিত্র কুফরি দর্শনকেন্দ্রিক কথা বলে। Monism, Naturalism এর Pantheistic আকিদায় সৃষ্টিকর্তার ব্যপারে কুফরি কথা বলে। ওরা এতেই ক্ষান্ত নয়, ওরা আসমান যমীনের ব্যপারে বিকৃত ধারনা প্রচার করে। ওরা আসমান বলতে মহাশূন্য/ভ্যাকুয়ামকে বোঝায়, অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কেয়ামতের দিন মাথার উপরের আসমানকে কাগজের ন্যায় ভাঁজ করে ডান হাতে রাখবেন। বস্তুত, কাফিররা মহান সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টির ব্যপারে যে বিকৃত কথা বলে তা থেকে রহমান আল্লাহ ও তার

সৃষ্টি পবিত্র। আজকের পথহারা উম্মাহর অধিকাংশই এই সহজ বিষয়টা বোঝেনা, বুঝতেও চায় না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে"।(সূরা যুমার ৬৭)

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

[চলবে ইনশাআল্লাহ ...]

টিকাঃ

[১]

https://m.youtube.com/watch?v=33fuxFI6rJg

[২]

https://m.youtube.com/watch?v=0NRKFrzD1aA

[৩]

https://m.youtube.com/watch?v=Q-SlysdKk7Y

https://m.youtube.com/watch?v=xMp49IYBhO4

[৪]

https://m.youtube.com/watch?v=NEVW_9EVjFE

[৫]

https://m.youtube.com/watch?v=kmO2IKFiN_Q

[৬]

https://m.youtube.com/watch?v=rp7lYL-4PfE

[৭]

https://m.youtube.com/watch?v=lF3aTc95PFE

[৮]

https://m.youtube.com/watch?v=IAcp3BFBYw4

[৯]

https://m.youtube.com/watch?v=s1hD8c--BKo

[১০]

https://m.youtube.com/watch?v=S2UU1ozBmm0

[১১]

https://m.youtube.com/watch?v=BYBRo_7QvwI

[১২]

https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXepHM

[১৩]

https://m.youtube.com/watch?v=XgeLscTavAk

https://m.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI

[১৪]

https://m.youtube.com/watch?v=16MMZJlp_0Y

[১৫]

https://m.youtube.com/watch?v=QM7ebcR3-xE

[১৬]

https://islamqa.info/en/answers/118698/consensus-that-the-earth-is-round

বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব
[আসমান-যমীন স্থির]

পর্ব-৭

-আসমান ও পৃথিবী স্থির-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান ও জমিনকে স্থির করেছেন। উর্দ্ধলোকের গম্বুজাকৃতির সুবিশাল এই ছাদকে যেমনি আল্লাহ স্থির রেখেছেন ,তেমনিভাবে সমতলে বিছানো এই পৃথিবীকেও স্থির করেছেন। বাস্তবিকপক্ষেও আসমান জমিন স্থির। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর গতি কোন পরীক্ষণেই প্রমাণিত নয়। এ পর্যন্ত চারটি পরীক্ষনের[Michelson-Morely experiment, Michelson-Gale experiment, Airy's failure, The Sagnac experiment] প্রতিটির ফলাফলই স্থির-নিশ্চল পৃথিবীর অনূকুলে। আমরা কেউ সামান্যতম গতি বা ঘূর্নন কোন কিছুই অনুভব করিনা।

মহান আল্লাহ কুরআনে স্থির আসমান ও জমিনের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

"নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।"[৩৫:৪১]

এবার আসুন দেখা যাক উল্লিখিত আয়াতের ব্যাপারে ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ কি বলেছেনঃ

একে অপরকে তোমরা প্রতারিত করছো। নিজেদের মনগড়া মিথ্যা মা'বূদের দুর্বলতাকে সামনে রেখে সঠিক ও সত্য মা'বূদ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম শক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায় না। আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফূয রেখেছেন। প্রত্যেকটাই তাঁর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউই এগুলোকে স্থির রাখতে পারে না এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারে না। এই সহনশীল ও

উপরিউক্ত ছবিতে স্পষ্ট দেখছেন ইবনে কাসীর (র) দুনিয়ার নিশ্চলতা ও স্থবিরতা জোড় দিয়ে বলেছেন। আকাশকে দুনিয়ার উপর পতন রোধের কথা বলে স্পষ্ট করেছেন জিওস্টেশনারী ফ্লাট এনক্লোজড পৃথিবীকে এবং সলিড ছাদ স্বরূপ আকাশকে অর্থাৎ আল্লাহই আসমানকে সমতল যমীনের উপর পতন হওয়া থেকে রক্ষা করছেন। একইভাবে দুনিয়াকেও স্থির ও নিশ্চল করে রেখেছেন।

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া বর্ননার অপব্যাখ্যাকারীদের একদল এ আয়াত সম্পর্কে বলে, এখানে আসমান যমীনের স্থবিরতা বোঝানো হয়নি। তারা পক্ষীকুলকে আসমানে স্থির রাখার আয়াতটির দলিল দেয়। যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনবলী রয়েছে

[আন নাহলঃ৭৯]

যেমনটা নিচের স্ক্রিনশটে দেখতে পাচ্ছেনঃ

তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের}
অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ
এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের
{জন্যে নিদর্শনবলী রয়েছে 16:79।

অর্থ করেন "স্থির" তবে পাখির يمسك দেখুন আপনি যদি
আয়াতেও বলতে হবে "আল্লাহ ছাড়া পাখিগুলো কে কেউ
স্থির রাখেনা" ।। অথচ পাখিরা স্থির নয় পাখিদের উড়ন্ত
অবস্থায় আল্লাহ এদের আগলে রাখেন তদ্রুপ পৃথিবী ও
চলন্ত অবস্থায় আল্লাহ তার কক্ষপথে আগলে রাখেন যাতে
কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটে ।।

আরেকটি আয়াত বলাই আছে "প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্র আপন
আপন কক্ষপথে চলমান" 36:40 ।।

Edited · Like · Report · 2 hours ago

S[illegible]bd[illegible]

67:19 তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত
পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা
সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ-ই তাদেরকে "আগলে"
রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন।

এই আয়াতেও উডন্ত চলমান পক্ষিকল কে তিনি আগলে

বস্তুত, এরা নিজেদের আকলকে নসের উপরে প্রাধান্য দেয়। নিজেদের ক্ষুদ্র ইল্ম কে সাহাবীদের Understanding কে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। ওরা বলতে চায় এর দ্বারা স্থবিরতা/নিশ্চলতা বোঝানো হয়নি।অথচ আলোচ্য আয়াতটিকে [৩৫:৪১] সাহাবীগন(রাঃ) ঘূর্নন বা আবর্তনকে খন্ডন করতে ব্যবহার করেছেন[সুবহানআল্লাহ]। হাদিসটি নিম্নরূপঃ

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কোথা হতে আসলে?" সে উত্তর দিলোঃ "সিরিয়া হতে।" তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "সেখানে কার সাথে সাক্ষাৎ করেছো?" সে জবাবে বললোঃ "হযরত কা'ব (রাঃ)-এর সাথে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কা'ব (রাঃ) কি বর্ণনা করলেন?" লোকটি উত্তর দিলো যে, হযরত কা'ব (রাঃ) বললেনঃ "আসমান একজন ফেরেশতার কাঁধ পর্যন্ত ঘুরতে আছে।" হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) লোকটিকে বললেনঃ "তুমি কি তাঁর কথাটিকে সত্য বলে মেনে নিলে, না মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলে?" লোকটি জবাব দিলোঃ "আমি কিছুই মনে করিনি।" তখন তিনি বললেনঃ "হযরত কা'ব (রাঃ) ভুল বলেছেন।" অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ ... -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[২] অন্য সনদে আগন্তুক লোকটির নাম হযরত জুনদুব বাজালী (রাঃ) বলা হয়েছে। ইমাম মালিকও (রঃ) একথা খণ্ডন করতেন যে, আসমান ঘুরতে রয়েছে। আর তিনি এ আয়াত হতেই দলীল গ্রহণ করতেন এবং ঐ হাদীস থেকেও দলীল গ্রহণ করতেন যাতে রয়েছে যে, পশ্চিমে একটি দরযা রয়েছে যেটা তাওবার দরযা, ওটা বন্ধ হবে না যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। এসব ব্যাপারে মহান ও পবিত্র আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ।

ইংরেজিঃ

There has been recorded a statement/saying of k'ab in the presense [sic] of syedna Abdullah bin Masood, the man who keeps the secrets of messenger of Allah (pbuh) and syedna Huzaifa bin Alyaman (r.a.). This statement of K'ab is "The heaven revolves". However, both Syedna Abdullah bin Masood (r.a.) and syedna Huzaifa bin Alyaman (r.a.) said agreeably that "K'ab said incorrect, **and undoubtedly Allah has withheld the heaven and the earth least they move. And Abdullah Bin Masood (r.a.) supporting this statement added that Allah's commandment is enough for us, and they (Heavens & Earth) do not move**. This statement has been narrated by Saeed bin Mansoor (r.a.) and Abd bin Hameed son of Jareer, son of Almanzer (r.a.) and they narrated it with reference of Hafiz bin Abd ibne Hameed (r.a.).[Fiq-hus- Sahaba Baad-Al-Khulfa-e-Alarba]

সুতরাং, একটি সুস্পষ্ট সহীহ হাদিস দেখছেন যেটা আকাশের ব্যপারে পরিষ্কার ধারনা দিয়েছে। এ আয়াতকে ঘূর্নাবর্তনকে খন্ডন করতে শুধু সাহাবী(রাঃ) একাই করেননি বরং ইমাম মালিক(রহঃ) পর্যন্ত করেছেন। আমরাও আসমান ও পৃথিবীর ঘূর্নাবর্তনের ধারনাকে খন্ডন করতে সাহাবীদের(রাঃ) অনুসরনে এ আয়াতকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করি। এ আয়াতে আসমানের পাশাপাশি আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির রাখার কথাও বলেন। এতে প্রমান হয় আসমান ও যমীন উভয়ই স্থির ও নিশ্চল। এটাই সাহাবীদের(রাঃ) বিশুদ্ধ আকিদা বা বিশ্বাস। হযরত উমার (রাঃ) যখন কোন কিছুকে বিশ্বাস করানোর জন্য কসম করতেন তখন বলতেন, **"সেই মহান সত্ত্বার শপথ দিয়ে বলছি যার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী স্থির রয়েছে"**

'উমর (রাঃ) বললেন, একটু থামুন
আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি
যাঁর আদেশে আসমান ও জমিন স্থির রয়েছে। আপনারা
জানেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
বলেছেন, আমাদের (নবীগণের) মীরাস বণ্টিত হয় না।

Source : ihadis.com

উপরে এক অপব্যাখ্যাকারীর স্ক্রিনশটে দেখছেন, সূরা ইয়াসিনের ৪০ নম্বর আয়াতকে যমীনের ঘূর্নন-আবর্তনের দলিল বানিয়ে নিয়েছে যা শুধু অপব্যাখ্যাই না বরং সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। এ নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে, সামনেও আসছে।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এই গম্বুজাকৃতির আসমানকে যমিনের উপর স্থিরভাবে রেখেছেন,যেরূপে পৃথিবীকেও স্থির ও নিশ্চল করেছেন।
আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্টে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্টে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান[আল হাজ্জ্বঃ৬৫]

আল্লাহ বলেনঃ

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا

বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন [আন নামলঃ৬১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি যমীনকে স্থির ও বাসোপযোগী করেছেন যাতে মানুষ তাতে আরামে বসবাস করতে পারে এবং এই বিস্তৃত বিছানার উপর শান্তি লাভ করে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

اللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءً

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন স্থির ও বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ।" (৪০ ঃ ৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন যা দেশে দেশে পৌঁছে যমীনকে উর্বর করে দিচ্ছে, যার দ্বারা এতে বাগ-বাগিচা উদ্গত হয় এবং ফসল উৎপন্ন হতে পারে।

মহান আল্লাহ্ যমীনকে দৃঢ় করার জন্যে ওর উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন নড়া-চড়া ও হেলা-দোলা না করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অন্যত্র বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদেরকে রিষ্ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়;[40:৬৪]

এখানে ব্যবহৃত قَرَارًا শব্দের অর্থ স্থির/স্থিতিশীল /দৃঢ়/অনড়/বসবাসযোগ্য/stable/firm abode।

সূরা রূমের ২৫ নং আয়াতে বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে উঠার জন্য ডাক দেবেন একটি ডাক, তখন তোমরা উঠে আসবে। [৩০:২৫]

تَقُومَ শব্দটি দ্বারা স্থিতি / দাঁড়ানো/নিশ্চলতা বোঝায়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, যমীন ও আসমান তাঁরই হুকুমে স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি আকাশকে পৃথিবীর উপর ভেঙ্গে পড়তে দেন না। আসমান যমীনকে ধরে আছে এবং ওকে ধ্বংস হতে রক্ষা করছে।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন কিছু বিশ্বাস করানোর জন্যে শপথ করতেন তখন বলতেনঃ "সেই আল্লাহর কসম, যিনি আসমান ও যমীনকে ধারণ করে আছেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন যমীন ও আসমানকে পরিবর্তন করে দিবেন।"

English - Tafsir ibn kathir

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالاٌّرْضُ بِأَمْرِهِ

And among His signs is that the **heaven and the earth stand** by His command.

This is like the Ayat:

وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الاٌّرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

He withholds **the heaven from falling on the earth** except by His leave. (22:65)

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضَ أَن تَزُولاَ

Verily, Allah grasps the heavens and the earth **lest they should move away** from their places. (35:41)

Whenever **Umar bin Al-Khattab**, may Allah be pleased with him, swore an emphatic oath, he would say,**"No, by the One by Whose command the heaven and the earth stand,"** i.e., **they stand firm** by His command to them and His subjugation of them. Then, when the Day of Resurrection comes, the Day when the earth will be exchanged with another earth

সুতরাং আশা করি সুস্পষ্টভাবে দেখছেন যে শরী'আতের দলিল গুলো সরাসরিভাবে পৃথিবী ও আকাশকে স্থির ও নিশ্চল বলে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সত্য। এটাই ছিল সালাফের আকিদা বা বিশ্বাস। আপনারা সাহাবীদের থেকে আসা হাদিসগুলোও দেখেছেন। এ সকল আয়াত দ্বারা প্রাচীন ফকীহ ও মুফাসসীরিন আকাশ বা পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তন বা মোশনকে খণ্ডন করতেন।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ) পৃথিবীর স্থবিরত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি সূর্যকেন্দ্রিক মহাকাশ ব্যবস্থাকে খন্ডন করেন শরীআতের দলিল দ্বারা। এবং প্রমান করেন পৃথিবী স্থির ও নিশ্চল। পৃথিবী নয়, বরং সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলামের খানিকটা নিম্নরূপঃ

"মান্যবর শায়খ উত্তরে বলেন যে, শরীয়তের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এই ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমণ ঘটে। আমাদের হাতে এই দলীলগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী এমন কোন দলীল নাই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘূরার দলীলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি।........

.......সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এ ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এ কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়। হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এ মুহূর্তে মনে আসছেনা। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এ বিষয়টির দ্বার উম্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!"

বিস্তারিতঃ

https://salafibd.wordpress.com/2010/11/22/সূর্য-ঘুরে-না-পৃথিবী/

https://www.hadithbd.com/showqa.php?d=548

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6463.shtml

https://aadiaat.blogspot.com/2017/11/blog-post_5.html

শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ রহিমাহুল্লাহ বিশ্বাস করতেন পৃথিবী স্থির এবং সূর্যই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। হেলিওসেন্ট্রিক মডেলকে তিনি সরাসরি কুফরি সাব্যস্ত করেন।তিনি সেসমস্ত লোকেদেরকে তাকফির করেন যারা কোপার্নিকান কস্মোলজিতে বিশ্বাস করে। তিনি সেসকল লোকেদের মৃত্যুদন্ড কার্যকরের নির্দেশ দেন। যেহেতু, তা কুরআন সুন্নাহর বিপরীতের

মত। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ অবস্থানে অটল থাকেন।

তার এরূপ বিশ্বাসের জন্য অনেকরকমের সমালোচনা এবং চাপ আসতে থাকে। কাফিররা মুসলিমদের মধ্যে কোন খুঁত খুজে পাবার জন্য সবসময় সজাগ থাকে, ওরা এজন্য এ বিষয়টি প্রচারমাধ্যমে অনেক প্রচারণা চালায়। ইবনে বাজ চাপ ও সমালোচনার মুখে ফতওয়ায় সংস্করণে বাধ্য হলে তার পূর্ববর্তী প্রকাশনার সমস্ত ডকুমেন্ট সৌদি সরকারের নিয়ন্ত্রনে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় বলে শোনা যায়। আজ শুধু সেগুলোর নামই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও সেসবের প্রথম পাবলিকেশন মেলে না।

১৯৯৫ সালের ২২ফেব্রুয়ারী দ্য নিউ নিয়র্ক টাইমসে (p. A-14.) "*Muslim Edicts take on New Force*" টাইটেলে তার কথিত সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসের বিষয়টির সমালোচনা হয়।[2]

"*The Demon-haunted World" তে বিজ্ঞানী* Carl Sagan বলেনঃ "In 1993, the supreme religious authority of Saudi Arabia, Sheik Abdel-Aziz ibn Baaz, issued a edict, or fatwah, **declaring that the world is flat. Anyone of the round persuasion does not believe in God and should be punished.**"

১৯৬৬ সালের প্রথম প্রকাশে তিনি বলেন, ***"পৃথিবী স্থির আবাস্থল, যা আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন মানবজাতির জন্য এবং করেছেন একে শয্যাস্বরূপ, একে পাহাড়পর্বত দ্বারা স্থির রাখা হয়েছে যাতে নড়াচড়া না করে"***, এটা উল্লেখের পর তাকে মিশরীয় জার্নালিস্টগন খুব বিদ্রুপ এবং উপহাস করে প্রাচীন বিশ্বাস ধারনের জন্য। বাদশা ফয়সাল অনেক রাগান্বিত হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি **Al-adilla al-naqliyya wa al-ḥissiyya ‘ala imkān al-ṣu’ūd ila al-kawākib wa ’ala jarayān al-shams wa al-qamar wa sukūn al-arḍ ("Treatise on the textual and rational proofs of the rotation of the sun and the motionlessness of the earth and the possibility of ascension to other planets")** নামের আরেকটি বই প্রকাশ করেন। এতে তিনি **১৯৬৬** সালের ফতওয়াকে আবারো উল্লেখ করেন এবং জোড় দিয়ে উল্লেখ করেন যে সূর্যই আবর্তন করে পৃথিবীকে। পৃথিবী স্থির।

তিনি বলেনঃ

I only deemed it lawful to kill whoever claims that the sun is static (thābita

la jāriya) and refuses to repent of this after clarification. This is because denying the circulation of the sun constitutes a denial of Allah (Glorified be He), His Great Book, and His Honorable Messenger. It is well established in the Din (religion of Islam) by way of decisive evidence and Ijma` (consensus) of scholars that whoever denies Allah, His Messenger or His Book is a Kafir (disbeliever) and their blood and wealth become violable. It is the duty of the responsible authority to ask them to repent of this; either they repent or be executed. Thanks to Allah that this issue is not debatable among scholars.

ইবনে বাজ(রহ) ১৯৮৫ সালে যুবরাজ সুলতান বিন সালমানের আস সৌদ স্পেস ফিরে পৃথিবীর কথিত আবর্তন দেখার কথা প্রকাশের পর কিছুটা নমনীয় হবার কথা জনশ্রুতিতে আছে। পরের প্রকাশিত আর্টিকেলে বলেনঃ

I did not declare those who believe that the earth rotates to be infidels, nor those who believe that the sun moving around itself, but I do so for those who say that the sun is static and does not move (thābita la jāriya), which is in my last article. Whoever says so being an infidel is obvious from the Quran and the Sunnah, because God almighty says: 'And the sun runs on (tajri) to a term appointed for it' ... As for saying that the Sun is fixed in one position but still moving around itself, ..., I did not deal with this issue in my first article, nor have I declared as infidel anyone who says so.

ইবনে বাজ(রহঃ) পৃথিবীর স্থবিরতা ও নিশ্চলতাকে প্রমান করতে গিয়ে যা প্রকাশ করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, *Jiryan Al-Shams Wa Al-Qammar Wa-Sukoon Al-Arz[Motion of the Sun and Moon, and Stationarity of the Earth]*, এবং *Evidence that the Earth is Standing Still* নামের বই ও অনুচ্ছেদ।

Ibn Bāz(rh) বলেন:

"পৃথিবীর ঘূর্নন এবং গতিকে অবশ্যই আমি বাতিল সাব্যস্ত করি এবং আমি এর ভ্রান্তিকে দলিল প্রমান দ্বারা স্পষ্ট করেছি, আমি তাদেরকে মুর্তাদ বলছিলা যারা এর সপক্ষে বলে। কিন্তু আমি তাদেরকে মুর্তাদ ঘোষনা করছি যারা বলে,সূর্য গতিহীন, কেননা এটা সুস্পষ্টভাবে কুরআনের এবং

বিশুদ্ধ হাদিসের বিরুদ্ধে যায়।"(Majmū Fatāwā Ibn Bāz 9/228)[১]

১৯৬৬ সালে যখন বিন বায ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দামূলক একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধে তিনি বলেন যে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় 'পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে' এইরূপ মিথ্যা তথ্য শিক্ষা দিচ্ছে।
লেখক রবার্ট লেসি বিন বাযের একটি ফতোয়া উল্লেখ করে বলেন,আমেরিকানরা চাঁদে অবতরণ করেছে এই তথ্যের ওপর তিনি মুসলিমদের আহবান জানিয়ে বলেন, **"আমরা অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করব যখন কাফের এবং ফাসেকরা আমাদের কোন তথ্য জানাবে। আমরা তাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোন কিছুই করব না যতক্ষন না মুসলিমরা নির্ভর করতে পারে এমন তথ্যসূত্র পাই।"**

ইবনে বাজের পৃথিবীর স্থবিরতা নিয়ে লিখা কিতাবঃ *Textual and rational proofs of the rotation of the sun and the motionlessness of the earth and the possibility of ascension to other planets* এর লিংকঃ

http://www.archive.org/download/Hassouni_5/Eladillaennaklia-ibnBaz.pdf

শাইখ সালিহ আল ফওজানকে প্রশ্ন করা হয়
"সূর্য কি পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে?"
উত্তরে শাইখ বলেন, **"এ ব্যপারে কোন সন্দেহই নেই। কুরআন বলে যে, 'সূর্য সন্তরন করে' তা স্বত্বেও ওরা বলে যে সূর্য এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং পৃথিবীই ঘুরছে। এটা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। কোন মুসলিম কুরআনকে অবজ্ঞা করে আধুনিক থিওরি গুলোকে গ্রহন করতে পারে না। একজন মুসলিম অবশ্যই কুরআনকে অনুসরণ করতে বাধ্য।"**[৩]

শাইখ বানদার আল খাইবারিকে প্রশ্ন করা হয় পৃথিবী ঘুরছে নাকি স্থির, এ ব্যপারে। উত্তরে তিনি বলেন, পৃথিবী স্থির এবং নিশ্চল। তিনি বেশ কিছু যুক্তি উত্থাপন করে প্রমান করার চেষ্টা করেন যে পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্যই চারদিকে ঘুরছে। এছাড়া তিনি নাসার চন্দ্রবিষয়ক সকল তথ্য মিথ্যা

সাব্যস্ত করেন। তার এসংক্রান্ত ভিডিও অনলাইন ও সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। অনেক বিদ্রুপ, উপহাস করা হয় তাকে নিয়ে। তিনি যা বলেছেন তা নিম্নরূপঃ

"Someone is asking whether the Earth moves or whether it is fixed in place. Does it move or remain fixed? The truth, as described by our scholars Imam Ibn Baz and Sheikh Saleh Al-Fawzan, is that the Earth is fixed and does not move. This is in keeping with the text, and it makes sense as well. But some people, like that Massari, ridicule the fatwa by Sheikh Abd Al-Saleh Al-Fawzan. He is a man of logic and should be taken seriously. In any case, the Earth is fixed, as said by Allah: "Lest it should shift with you" [Quran 31:10]. Allah said that it is the sun that revolves: "And the sun runs towards its stopping point" [Quran 36:38]. Allah said about the sun and the moon: "Each in an orbit swimming" [Quran 21:33]. Allah said: "Abraham said: Indeed, Allah brings up the sun from the east, so bring it up from the west" [Quran 2:258]. This is some of the evidence.

There is ample evidence that it is the sun that revolves around the Earth. As for evidence based on reason... The [Westerners] present all kinds of theories, but we Muslims also have theories and brains.

First, let's say that we go from here to Sharjah Airport and take a plane to China. Are you with me? Concentrate now. Let's say that this is the Earth, and let's assume that it is turning... If we take an international flight from Sharjah to China... You say that the Earth is turning, right? If the plane stopped in mid-air, wouldn't China come to it? Am I right or not? If the Earth really does turn - China should come to the plane.

Now, let's assume that the Earth revolves the other way - the plane will never catch up with China no matter how long it flies. Since China is also revolving, you will never get there.

Secondly, Allah talked about the [celestial] house[Baitul Ma'mur] frequented [by angels]. This house is located in the seventh heaven. The Prophet Muhammad said that if it fell from the sky, it would fall on the Kaaba. But if

the Earth revolves, it would not fall on the Kaaba. It would fall in the ocean or somewhere on dry land. This proves that the Earth is fixed in place.

If the [celestial] house falls it will fall straight on the Kabaa, and this proves that the Earth is fixed. People, we cannot turn just anyone who makes statements into a star. We must resort to our immutable texts and our religious scholarship. Some in the West talk about the scientific inimitability of the Quran, saying: "If all this was mentioned in the Quran 1,400 years ago, how come you Muslims did not discover it yourselves?"

The [Americans] say that they landed on the moon, but they never set foot or laid their eyes on it. They produced it all in Hollywood or I don't know where. They said that they had gone to the moon and we just took their word for it."[...][৪]

সৌদি সালাফি আলিমদের এটা প্রায় একটা ট্রেডিশনাল বিশ্বাস যে, পৃথিবী স্থির। এর সপক্ষে আরো উল্লেখযোগ্য আলিমদের মধ্যে আছেন Abdul karim al-hemid.
Sheikh Ibn Jebrin , and sheikh Abu bakr al-jazaari, Sheikh Twegri,Sheikh Yehia haggouri, Allama Obaid Al Jabri প্রমুখ।[৫]

সুতরাং, এ বিষয়টা সুস্পষ্ট যে কুরআন সুন্নাহ আমাদেরকে কি বলছে। সেই সালাফ থেকে পরবর্তী প্রাচীন উলামা,মুফাসিরীন এবং আজকের শীর্ষস্থানীয় আলিম। অথচ আজ কথিত বিজ্ঞান আমাদের বলে ,গোলাকৃতি পৃথিবী প্রচন্ড গতিতে[৬৬.৬ mph] নিজে তো ঘুরছেই সাথে সূর্য্যের চারদিকেও ঘুরছে এমনকি সেটা সূর্যসমেত অসীমতার দিকে ধাবমান। আর আকাশ হচ্ছে শূন্যের শূন্য অবারিত সীমাহীনতা। বস্তুত এসব অপ্রমাণিত মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তো ঐ ভ্রান্ত বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীতটাই বললেন যে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের শিক্ষা ওরা শয়তানের কাছে থেকে লাভ করেছে।নিশ্চয়ই পৃথিবী ও আকাশ স্থির।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমানকেও স্থির বলেন। আজকের বিজ্ঞান অনুযায়ী Vacuum emptiness কে স্থির রাখার বিষয়টি কুরআনের পার্স্পেক্টিভে অর্থহীন। এতে প্রমান হয় আসমান সলিড ছাদস্বরূপ যাকে আল্লাহ বিনা স্তম্ভে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তিনিই একে স্থির রাখেন যাতে

পৃথিবীতে পতিত না হয়।

আল্লাহ মিথ্যাচারীদের দেওয়া তথ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকতে বলেছেন। সেখানে কাফিরদের ব্যাপারে কিরূপ সচেতন হওয়া প্রয়োজন! আল্লাহ বলেনঃ
"হে মু'মিনগণ! কোনো ফাসিক্ব যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে লও..." (সুরা হুজুরাতঃ৬)
ইবনে বাজ(রহ) চাদের যাবার খবরে কাফির ফাসিকদের কথা গ্রহনের ব্যাপারে উম্মাহকে সচেতন করেছিলেন। কিন্তু উম্মাহ তো আজ কাফিরদের তৈরি কস্মোলজিক্যাল প্যাগানিজমকে সম্পূর্নভাবে গ্রহন করে নিয়েছে। এক দ্বীনি ওয়েবপেজে পড়লাম, জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিতে বিশ্বাস করাটা বাধ্যতামূলক নয়[৬]। অথচ কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগান থিওরামে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকেই ইবনে বাজের (রহ) এর মত আলিম তাকফির এবং হত্যার দাবি তুলেছিলেন।

আমাদের হাতে সুস্পষ্ট কুরআনের নির্দেশনা হাদিসের বর্ননা রয়েছে, যার আলোচনা উপরে গত হয়েছে, এরপরে আলিমদের রেফারেন্স দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল, এরপরেও আলিম উলামাগনের ফাতাওয়া ও কথা গুলোকে এ জন্য উল্লেখ করেছি যাতে এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় না থাকে। একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, আমরা যে জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির কথা বলি সেটার সাথে উল্লিখিত আলিমদের বিশ্বাসগত সামান্য কিছুটা পার্থক্য আছে, যা সামনে কোন দিন আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সালামা নামের এক মিশরীয় মুসলিম ভাই জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি নিয়ে ব্যপক লেখালিখি করেন[৭], মজার বিষয় হচ্ছে তিনিও আধুনিক কস্মোলজির অরিজিন হিসেবে জিউইস কাব্বালিস্টিক মিস্টিক্যাল ট্রেডিশনকে উল্লেখ করেন, যেমনটা পূর্বের অজস্র আর্টিকেলে উল্লেখ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ এ পথে আমি একদম একা নই। তার ফেইসবুক গ্রুপে ঘুরে আসতে পারেনঃ facebook.com/groups/358254744358614

পরিশেষে, শাইখ ইবনে বাজের(রহ) সাথে গলা মিলিয়ে বলি, কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি অবশ্যই কুফরি থিওরি। একে অবশ্যই আমরা বাতিল সাব্যস্ত করি থিওরেটিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল ও থিওলজিক্যাল পার্স্পেক্টিভ থেকে। তবে শাইখের মত এতে বিশ্বাসীদেরকে ঢালাওভাবে তাকফির করিনা। আমরা কাফিরদের মনগড়া কুফরি কথাগুলোকে খন্ডন করতে শরী'আতের দলিলগুলো নিয়ে আসছি এবং ভবিষ্যতের আসব(বিইযনিল্লাহ)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাকে (জান্নাত বা জাহান্নামের জন্য)যে মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সে সেঅনুযায়ী ঐ বিশ্বাসের(ইডিওলজির)

দিকেই ধাবিত হবে। আমরা কেউই কাউকে জোড় করে কোন কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন বা অবিশ্বাস করাতে পারিনা যদি না আল্লাহ আযযা ওয়াযাল চান। আমাদের কাজ তো শুধুই রহমানের কথা গুলোকে প্রকাশ করা।

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ

[চলবে ইনশাআল্লাহ..]

টিকাঃ

[১]
https://www.abukhadeejah.com/the-motion-of-the-sun-around-the-earth-and-the-islamic-belief
[২]
https://www.nytimes.com/1995/02/12/world/muslim-edicts-take-on-new-force.html
[৩]
https://m.youtube.com/watch?v=KRFMDZP8vuQ
[৪]
https://m.youtube.com/watch?v=TmetQD1q4bY

https://www.memri.org/tv/saudi-preacher-bandar-al-khaybari-earth-does-not-revolve-around-itself-extended-version/transcript
[৫]
http://www.sh-yahia.net/old3/show_books_12.html

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

[চন্দ্র-সূর্য]

পর্ব-৮

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, সূর্য হচ্ছে অনন্ত অসীম স্পেসের মধ্যে ধাবমান অগনিত নক্ষত্রের একটি। আর চাঁদ হচ্ছে গোলাকৃতির কথিত পৃথিবী নামক গ্রহের একটি উপগ্রহ। চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে। আর পৃথিবী ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে,চারপাশে। সূর্য কাউকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে না বরং সেটা দুনিয়া চাঁদ, কথিত অন্যসব গ্রহ নিয়ে মহাশূন্যের অজানা গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। চাঁদের কোন আলো নেই, সে সূর্যের থেকে আলো ধার করে। চাঁদ পৃথিবীর মতই অবতরনযোগ্য ভূমিবিশেষ। সূর্যের আলো চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে...। কাফিররা এ শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি মুসলিমরাও কাফিরদের বলা অদেখা জগতের বর্ননাকে গ্রহন করেছে। শুধু তাই নয়, যেসব নিদর্শন চোখ দিয়েই যমীনে দাড়িয়ে দেখা যায় সেসবের ব্যাপারেও কাফিরদের বিশ্বাসকে গ্রহন করে নিয়েছে।

আমরা আজ দেখব, আমাদের দ্বীন ইসলাম এসবের ব্যপারে কি শিক্ষা দেয়। বস্তুত, আমাদের দ্বীন এর অবস্থান কাফিরদের শয়তানি আকিদা ও শিক্ষার বিপরীত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছয়দিনে আসমান যমীন সৃষ্টির একদম শেষভাগে শুক্রবারে চাঁদ-সূর্যকে সৃষ্টি করেন।

That is because of the report told us by Hannad b. al-Sari, who also said that he read all
of the hadith382 -Abu Bakr b. 'Ayyash-Abu Said (!) al-Baggal-`Ikrimah-Ibn 'Abbas-the Prophet: On Thursday He created heaven. On Friday He created the stars, the sun, the moon, and the angels, until three hours remained of it. In the first of these three hours, He created the terms (of human life), who would live# and who would die. In the second, He cast harm upon everything that is useful for mankind. And in the third, He (created) Adam and had him dwell in Paradise. He commanded Iblis to prostrate himself (before Adam), and He drove Adam out of Paradise at the end of the hour.383

[ইবনে জারির তাবারির ইতিহাস:১ম খন্ড]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চাঁদ ও সূর্যকে দুটি নিদর্শন এবং হিসাব রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত কর

[হা মীম সিজদাহঃ৩৭]

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ

[আনআমঃ৯৬]

১ মহান আল্লাহ বলেনঃ "সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ রীতিনীতি ও নিয়ম শৃংখলার উপর চলতে রয়েছে। ওদের গতির নিয়মের মধ্যে অণু পরিমাণও পরিবর্তন ঘটে না, ওগুলো এদিক ওদিক চলে যায় না, বরং প্রত্যেকটির কক্ষপথ নির্ধারিত রয়েছে। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে ওরা নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে রয়েছে। এই শৃংখলিত নিয়মের ফলেই দিন রাত্রি কমতে ও বাড়তে রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তিনিই সেই আল্লাহ যিনি সূর্যকে দীপ্তিময় বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে কোমল আলো দান করেছেন এবং হ্রাস বৃদ্ধির মনযিল নির্ধারণ করেছেন।" যেমন তিনি বলেনঃ "সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে ধরে নিবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে এবং প্রত্যেকেই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করতে রয়েছে।" তিনি আরও বলেনঃ "সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁর আদেশ পালনে সদা নিয়োজিত রয়েছে।" আল্লাহ পাক আরও বলেছেনঃ "এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহা পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।" কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। কেউই তাঁর অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়, সেটা যমীন আসমানের অণু পরিমাণই জিনিস হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি বাক্যকে عَزِيْزٌ ও عَلِيْمٌ শব্দ দ্বারাই শেষ করেছেন। যেমন এখানেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১. এই হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "তাদের জানবার পক্ষে রাত্রিও একটা নিদর্শন যে, ওর মধ্য থেকে আমি দিনকে অপসারণ করি, তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারের মধ্যে থেকে যায়। আর সূর্যও স্বীয় গতিপথে চলতে রয়েছে এবং স্বীয় নির্ধারিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্লাহ বলেনঃ

তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম।

[বাকারাঃ১৮৯]

আল্লাহ চাঁদ সূর্য উভয়কেই দুটি সূর্য(একজোড়া) হিসেবে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। আজকের এই চাঁদ মূলত আরেকটি সূর্য ছিল। এটা সূর্যের ন্যায় কিরণ দিত। পরবর্তীতে চাদের উপর কালিমা লেপন করে তার আলোর মাঝে স্নিগ্ধতা আনয়ন করা হয়,প্রখরতা কমিয়ে রাতের জন্য উপযুক্ত করা হয়। সূর্য আকারে চাদের চেয়ে বড় এবং এর আলোর প্রখরতাও বেশি।এ দুটি সূর্যকে যদি প্রথমাবস্থাতেই রাখা হত তাহলে দিন রাত্রির পার্থক্য করা মুশকিল হত। সূর্যকে আরশের আলো দ্বারা এবং চাঁদকে কুরসির আলো দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। সূর্য আদৌ কোন নক্ষত্র নয়, যেমনটা কাফিররা শেখায়। নক্ষত্র আল্লাহর সম্পূর্ন ভিন্ন সৃষ্টি। আল্লাহ কুরআনের সবস্থানে চাঁদ সূর্য ,দিন-রাত্রি এবং তারকারাজিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেন। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন সৃষ্টি।

চাঁদ সূর্যের আলোর ব্যপারে আসা একাধিক হাদিস:

According to al-Qasim492 -al-Husayn-Hajjaj-Ibn Jurayj-Ibn 'Abbas: The moon used to give luminosity just as the sun does, with the moon being the sign of the night and the sun being the sign of the day. "We have blotted out the sign of the night." (That is) the blackness in the moon

According to Bishr b. Mu'adh-Yazid b. Zuray-Sa'id (b. Abi 'Arubah)-Qatadah, commenting on God's word: "And We have made the night and the day two signs. We have blotted out thesign of the night": We used to be told 496 that the blotting of thesign of the night is the blackness that is in the moon. "And Wehave made the sign of the day something to see by": Giving light. God created the sun having more light and being larger than the moon.

According to Abu Kurayb-Talg478 -Za'idah479 -'Asim (b.Bahdalah)-'Ali b. Rabi'ah480 : Ibn al-Kawwa' asked what that blackness in the moon was, and `Ali replied: "We have blotted out the sign of the night, and We have made the sign of the day something to see by." That blackness is (a trace of) the blotting

Among the traditions transmitted from the Messenger of God on this subject is what I have been told by Muhammad b. Abi Mansur al-Amuli-Khalaf b. Wasi1428 -Abu Nuaym 'Umar b. Subh al-Balkhi429 -Mugatil b. I-iayyan43o -'Abd al-Rahman b. Abz4" -Abu Dharr al-Ghifari432 : I walked hand in hand with the Prophet around evening when the sun was about to set. We did not stop looking at it until it had set. He continued. I asked the Messenger of God: Where does it set? He replied: It sets in the heaven and is then raised from heaven to heaven until it is raised to the highest, seventh heaven. Eventually, when it is un?derneath the Throne, it falls down and prostrates itself, and theangels who are in charge of it prostrate themselves together with it. The sun then says: My Lord, whence do You command me to rise, from where I set or from where I rise? He continued. This is (meant by) God's word: "And the sun: It runs to a place where it is to reside (at night)"-where it is held underneath the Throne-"That is decreed by One Mighty and Knowing"4m -by "this" is meant the procedure of the "mighty" Lord in His royal authority, the Lord Who is "knowing" about His creation. He continued. (62) Gabriel brings to the sun a garment of luminosity from the light of the Throne, according to the measure of the hours of the day. It is longer in the summer and shorter in the winter, and of interme?diate length in autumn and spring. He continued. The sun puts on that garment, as one of you here puts on his garment. Then, it is set free to roam in the air of heaven until it rises whence it does. The Prophet said: It is as if it had been held for three

nights. Then it will not be covered with luminosity and will be commanded to rise from where it sets. This is (meant by) God's word: "When the sun shall be rolled up."434 He continued. The same course is fol?lowed by the moon in its rising, its running on the horizon of the heaven, its setting, its rising to the highest, seventh heaven, its being held underneath the Throne, its prostration, and its asking for permission . But Gabriel brings it a garment from the light of the Footstool. He continued. This is (meant by) God's word: "He made the sun a luminosity and the moon a light."435 Abu Dharr concluded: Then I went away together with the Messenger of God, and we prayed the evening prayer. This report from the Messen?ger of God indicates that the only difference between the condi?tion of the sun and that of the moon is that the luminosity of the sun comes from the wrap of the luminosity of the Throne with which the sun was covered, while the light of the moon comes from a wrap of the light of the Footstool with which the moon was covered.

Hudhayfah b. al-Yaman4' now said: I and my family are your ransom, O Messenger of God, but may I ask how will they be when the Trumpet is blown? The Prophet replied: Hudhayfah! By Him Who holds the soul of Muhammad in His hand! Surely, the Hour will come and the Trumpet be blown while a man who just treated his water basin with clay will not (have time to) draw wa?ter from it. Surely, the Hour will come while two men holding a garment between them will not (have time to) fold it or sell it to one another. Surely, the Hour will come while a man, having lifted a morsel to his mouth, will not (have time to) eat it. Surely, the Hour will come while a man who leaves with the milk just# drawn from his camel will not (have time to) drink it. The Prophet then recited this verse of the Qur'an: "Surely, it will come upon them suddenly when they are unaware. "469 When the Trumpet is blown and the Hour comes and God distinguishes between the

inhabitants of Paradise and the inhabi?tants of the Fire, who had not yet entered either, He will call for the sun and the moon. They are brought, black and rolled up,having fallen into quaking and confusion and being terribly afraid because of the terror of that day and their fear of the Merciful One. Finally, when they are around the Throne, they will fall down and prostrate themselves before God, saying: Our God! You know our obedience and our continuous worship of You. You know how quickly we executed Your command in the days of this world. Thus, do not punish us because the poly?theists worshiped us. We did not call on them to worship us, nor did we neglect to worhip You. The Lord will say: You have spoken the truth. Now I have taken it upon Myself to begin and to restore.470 I am restoring you to where I had you begin, Thus, return to what you were created from! The sun and the moon said: Our God, what did You create us from? God said: I created you from the light of My Throne. Thus, return to it! He continued. There will come forth from each of the two a flash of lightning so brilliant that it almost blinds the eye with its light. It will mingle with the light of the Throne. This is (meant by) God's word: "He begins and He restores. ,411 `Ikrimah said: I got up with the individuals who were told the story, and we went to Kab and informed him about Ibn 'Abbas' emotional outburst at (hearing) his story and about the story In 'Abbas had reported on the authority of the Messenger of God. Kab got up with us, and we went to Ibn 'Abbas. Kab said: I have learned about your emotional outburst at my story. I am asking God for forgiveness and I repent. I have told the story on the basis of a well-worn book that has passed through many hands. I do not know what alterations made by the Jews it may have contained.Now you have told a story on the basis of a new book recently revealed by the Merciful One and on the authority of the lord and best of the prophets. I would like you to tell it to me so that I can retain it in my memory as told on your authority. When I have been told it, it will replace my original story. 'Ikrimah said: Ibn 'Abbas repeated the story to Kab, while I

followed it in my heart paragraph by paragraph . He neither added nor omitted anything, nor did he change the sequence in any way.This added to my desire (to learn from) Ibn 'Abbas and to retain
the story in my memory.472

[ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর ইতিহাস]

ইবনে জারীর তাবারির(রহ:) বলেনঃ

In our opinion, the correct statement on this subject is that God created the sun of the day and the moon of the night as two signs, then made the sign of the day, which is the sun, something to see by and blotted out the sign of the night,which is the moon, through the blackness in it.It is permissible (to say) that God created them as two suns from the light of His Throne and then blotted out the light of the moon in the night, as stated by some we have mentioned. This was the reason for the difference of the condition of the sun and the moon. It is (also) permissible (to say) that the sun receives its luminosity through the wrap of luminosity of the Throne, with which it is covered, and the moon receives its light from the wrap of light of the Footstool, with which it is covered.504 If the chain of transmitters of one of the two reports I have mentioned were sound, we would adopt that report, but the chains of transmitters of both reports are disputed. Thus, we have not considered it permissible to decide on the soundness of the contents of the reports as regards the difference of condition between the sun and the moon. We know for certain, however, that God differentiated between their

capacities for giving light because He knew through His superior knowledge that the difference was best for the well-being of His creation. Thus, He made a distinction be?tween them and made the one something that gives light to see by, and the other something that has its luminosity blotted out.

সুতরাং এ হাদিস দ্বারা একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়। চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। যারা বিভিন্ন অসাড় যুক্তি দিয়ে কাফিরদের সাথে গলা মিলিয়ে বলতে চায় যে চাদের আলো নেই,তারা সুস্পষ্টভাবে মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নিচ্ছে। এদের কাউকে সতর্ক করার পড়েও অন্তরে ব্যধিজনিত কারনে একই অবস্থানে আছে, কেউ বা না জেনে ভুল করছে। বিচার দিবসে চাঁদ সূর্যের মধ্যে যাকে যে আলো দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে তার দিকে ফেরত নেওয়া হবে।

চাঁদের আলোর ব্যাপারটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনেও উল্লেখ করেন:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে

[ইউনূস-৫]

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির(রহ:) বলেন:

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্যে দীপ্তি বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্যে নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণ এক রকম এবং চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না বা একটির কিরণের সাথে অপরটির কিরণ মিলিত হয় না। দিবসে সূর্যের রাজত্ব আর রাত্রে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। দুটোই আসমানী আলোকবর্তিকা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সূর্যের মঞ্জিল নির্ধারণ করেননি, অথচ চন্দ্রের মঞ্জিল তিনি নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখের চাঁদ অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের আকার ধারণ করে। এরপর আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ণ একমাস পর প্রথম অবস্থায় এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি চন্দ্রের জন্যে মঞ্জিলসমূহ নির্ণিত করে রেখেছি (এবং ওটা তা অতিক্রম করছে), এমন কি ওটা (অতিক্রম শেষে ক্ষীণ হয়ে) এইরূপ হয়ে যায়, যেন খেজুরের পুরাতন শাখা। সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে; এবং উভয়ে এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করছে।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "সূর্য ও চন্দ্রের নিজ নিজ হিসাব রয়েছে।" এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। আল্লাহ এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং জগত সৃষ্টি মহান আল্লাহর বিরাট নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে এবং এটা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমাণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا........

অর্থাৎ "আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে বৃথা সৃষ্টি করিনি, এটা হচ্ছে কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি।" (৩৮ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ - فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

অর্থাৎ "তবে কি তোমরা এই ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর এটাও (ধারণা করেছিলে) যে, তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না? অতএব আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাবান, তিনি প্রকৃত বাদশাহ, তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি মহান আরশের মালিক।" (২৩ঃ ১১৫-১১৬) আয়াতগুলোর ভাবার্থ হচ্ছে— আমি দলীল প্রমাণাদি খুলে খুলে বর্ণনা করছি যাতে অনুধাবনকারীরা অনুধাবন করতে পারে।

ইমাম ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় চাঁদের স্বীয় আলোর কথা ইঙ্গিত করলেও অন্যত্র চাঁদের আলোকে সূর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। দুরকমের কথা উল্লেখের প্রকৃত কারন এক আল্লাহই ভাল জানেন। তবে তার সমসাময়িক সময়ে গ্রীক পিথারোরিয়ান/টলেমিয়ান এ্যস্ট্রোনমির প্রসিদ্ধি আর প্রভাব চারদিকে ছড়াচ্ছিল। এটা তিনি তার কিতাবাদিতে একাধিকবার উল্লেখ করেন। মাঝেমধ্যে এস্ট্রোনমারদের আকিদা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা খন্ডনও করেছেন। এরূপ হতে পারে তিনি কিছু কিছু বিষয় গ্রীক এস্ট্রোনমি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন সূর্যের অবস্থানের ব্যপারে টলেমিয়ান জিওসেন্ট্রিক মডেলের অনুসরন। হতে পারে চাঁদের আলোর প্রশ্নে ওইরূপ কিছু হয়েছে।

ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

আল্লাহ চাঁদের আলোর ব্যপারে আরও বলেনঃ

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।

[নূহ-১৬]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন:

করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? আর সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলোর আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে এতেও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে যে, গতিশীল বড় বড় সাতটি নক্ষত্র বা গ্রহ রয়েছে, যেগুলোর একটি অপরটিকে আলোহীন করে দেয়। দুনিয়ার আকাশে সবচেয়ে নিকটে রয়েছে চন্দ্র, যা অন্যগুলোকে জ্যোতিহীন করে থাকে।

দ্বিতীয় আকাশে রয়েছে 'আতারিদ'। তৃতীয় আকাশে আছে যুহরা। চতুর্থ আকাশে সূর্য রয়েছে। পঞ্চম আকাশে রয়েছে মিররীখ। ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে 'মুশতারী' এবং সপ্তম আকাশে যাহ্‌ল রয়েছে। আর অবশিষ্ট নক্ষত্রগুলো, যেগুলো হলো 'সাওয়াবিত' বা স্থির, অষ্টম আকাশে রয়েছে যেটাকে মানুষ 'ফালাকে সাওয়াবিত বলে থাকে। ওগুলোর মধ্যে যেগুলো শারাবিশিষ্ট ওগুলোকে 'কুরসী' বলে থাকে। আর নবম ফালাক হলো তাদের নিকট ইতাস বা আসীর। তাদের নিকট এর গতি অন্যান্য ফালাকের বিপরীত। কেননা, এর গতি অন্যান্য গতির সূচনাকারী। এটা পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে চলতে থাকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ফালাক চলে পূর্বদিক হতে পশ্চিম দিকে। এগুলোর সাথে নক্ষত্রগুলোও চলাফেরা করে। কিন্তু গতিশীলগুলোর গতি ফালাকগুলোর গতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ওগুলো সবই পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে চলে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি স্বীয় শক্তি অনুযায়ী স্বীয় আকাশকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। চন্দ্র প্রতি মাসে একবার প্রদক্ষিণ করে, সূর্য প্রদক্ষিণ করে বছরে একবার, যাহল প্রতি ত্রিশ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। সময়ের কমবেশী হয় আকাশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুপাতে। তাছাড়া প্রত্যেকটির গতিবেগও সমান নয়। এ হলো তাঁদের সমস্ত কথার সারমর্ম যাতে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বহু কিছু মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ওগুলো এখানে বর্ণনা করতেও চাই না, এবং এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো একটির উপর আরেকটি, এভাবে রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দুটোর ঔজ্জ্বল্য ও কিরণ পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাত্রির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট মনযিল ও কক্ষপথ রয়েছে। এর আলো ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন এক সময়ও আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের পরিচয় লাভ করা যায়।

অর্থাৎ যে কথা বলছিলাম। ইবনে কাসির(রহঃ) এর যুগে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবের কথা এখানেও উল্লেখ করেছেন। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় উল্লেখ করেনঃ

বিশেষজ্ঞগণ এসব নক্ষত্রের আকার ও গতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনকি তাঁরা ইলমুল আহকামের পর্যন্ত শরণাপন্ন হয়েছেন। ঈসা (আ)-এর বহু যুগ আগে সিরিয়ায় যে গ্রীক সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করত, এ বিষয়ে তাদের বিশদ বক্তব্য রয়েছে। তারাই দামেশ্‌ক নগরী নির্মাণ করে তার সাতটি ফটক স্থাপন করে এবং প্রতিটি ফটকের শীর্ষদেশে সাতটি গ্রহের একটি করে প্রতিকৃতি স্থাপন করে সেগুলোর পূজা পার্বণ এবং সেগুলোর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। একাধিক ঐতিহাসিক এবং আরও অনেকে এসব তথ্য বর্ণনা করেছেন। আস্‌সিররুল মাকতুম ফী মাখাতাজতিশ শামসে ওয়াল কামারে ওয়ান নুজুম (السر المكتوم فى مخاطة الشمس والقمر والنجوم) গ্রন্থের লেখক হাররানের প্রাচীনকালের দার্শনিক মহলের বরাতে এসব উল্লেখ করেছেন। তারা ছিল পৌত্তলিক। তারা সাত গ্রহের পূজা করত। আর তারা সাবেয়ীদেরই একটির অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ . وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

অর্থাৎ—তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না চন্দ্রকেও না, সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (৪১ ঃ ৩৭)

আবার আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ সম্পর্কে বলেছেন যে, সে সুলায়মান (আ)-কে ইয়ামানের অন্তর্গত সাবার রাণী বিলকীস তার বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতে গিয়ে বলেছিল ঃ

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ . وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ . أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

অর্থাৎ—আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।

নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি। (২৭ ঃ ২৩-২৬)

আল্লাহ বলেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও *দীপ্তিময় চন্দ্র*।

[ফুরকানঃ৬১]

জ্যোতির্ময় চন্দ্রকে কিয়ামতের দিন জ্যোতিহীন করা হবে সূর্যের ন্যায়, চাঁদের যদি নিজস্ব আলো নাই থাকে, সেটাকে আলোকহীন করবার কথা বলার কোন মানে হয় না। এটা প্রমান করে চাঁদের আলো আছে। আল্লাহ বলেনঃ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে[৮১:১]

وَخَسَفَ الْقَمَرُ

চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।[কিয়ামাহ:৮]

আজ যারা কাফিরদের কথিত বিজ্ঞানের মোহে পরে পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত শব্দ 'নূর','মুনীর' এর অপব্যাখ্যা করে বলছে এর অর্থ, ধার করা আলো, এরা সুস্পষ্ট মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।
উপরিল্লিখিত হাদিসগুলোই তাদের অপব্যখ্যা আর মিথ্যাচারকে প্রকাশ করে দেয়। আরবি অভিধানে নূর অর্থ আলো বা জ্যোতি। ওরা যারা 'নূর' দ্বারা 'ধার করা আলো' বলতে চায়, তারা এই অপব্যখ্যা দিতে গিয়ে জঘন্য শিরকের দিকে হাটছে। আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ "আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি" এখানে নূর অর্থ ধার করা আলো বলা হলে কি জঘন্য শিরকই না হয়ে যায়! ওরা কি এখানেও বলবে আল্লাহর এ নূর ধার করা আলো!?(নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

একই ভাবে আল্লাহ সূরা আয যুমারে বলেন:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে-তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না

[আয যুমার-৬৯]

অপব্যাখ্যাকারীদের কথা গ্রহন করলে এখানে অর্থ হবে "পৃথিবী তার পালনকর্তার ধার করা

আলোয় উদ্ভাসিত হবে"(নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং আশা করি বুঝতে পারছেন এদের অর্থবিকৃতি আর অপব্যখ্যা কতটা নিকৃষ্ট পর্যায়ের! এরা হয়ত এখন বলবে তাদের অপব্যখ্যাটি শুধু চাদেঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারন তাদের মূল লক্ষ হচ্ছে যেকোন উপায়ে কাফিরদের সাথে সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো মেলানো।

একইভাবে মুনীর শব্দের অর্থ প্রদীপ্ত, আলোকদীপ্ত, দীপ্তিময়,আলোকোজ্জ্বল। আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং আলোকদীপ্ত প্রদীপরূপে।

[আল আহযাবঃ৪৬]

যারা বলে মুনীর মানেও ধার করা আলো, তারা কি বলতে চায় প্রদীপের আলো ধার করা হয়!? যে নূর দিয়ে রাসূল(সাঃ) কে প্রেরন করা হয়েছে ওটা ধার করা? আল্লাহর এক নামই তো নূর, আল্লাহই নূরের মালিক। ওরা কি বলতে চায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই নূর ধার করা বা রিফ্লেক্টেড!? (নাউজুবিল্লাহ)

আমি জামি না ওরা এসব উদ্ভট অনুবাদ কোথায় পায়।

আপনারা চাঁদের আলোর ব্যপারে আল্লাহর রাসূল(সা:) ও সাহাবিদের(রাঃ) বিশ্বাস কি ছিল,তা প্রথমেই পাঠ করেছেন। সুতরাং ১৩, ১৪'শত বছর পর যদি কোন অভিধান কাফিরদের কথিত অপবৈজ্ঞানিক চাকায় কুরআনকে ঘোরাতে গিয়ে শব্দের অর্থের বিকৃত করে, তাহলে তা কস্মিনকালেও গ্রহনযোগ্য না। যেকোন মতাদর্শকে কুরআন সুন্নাহর মাপকাঠি দ্বারা যাচাই করলেই হক্ক বা বাতিল স্পষ্ট হয়।

এ বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ সত্য বলেছিলেন। তিনি বলেনঃ

The words diya', noor and so on refer to something that produces light by itself, such as the sun and moon, and such as fire. Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning):

"It is He Who made the sun a shining thing [diya'] and the moon as a light [noor]"

[Yoonus 10:5] ,

"And We have made (therein) a shining lamp (sun)"

[an-Naba' 78:13] .

Allah, may He be glorified, calls the sun siraaj (lamp) and diya' (light) because in addition to illuminating and shining, it produces heat and

burning. So it is more akin to fire, unlike the moon, which illuminates without heat. Hence He says: **"It is He Who made the sun a shining thing [diya'] and the moon as a light [noor]" [Yoonus 10:5]** .
The point here is that the words diya', noor and so on refer to something that shines and illuminates by itself, such as the sun, moon and fire. What it refers to is the rays that may be produced as a result of that in the air and on land. The latter (the rays) are transient and result from something else; they are not the item that produces it and are not an inherent characteristic of it – rather they are something that happens because of it.

End quote from **Al-Jawaab as-Saheeh (4/368).**

ইবনে তাইমিয়া(রহঃ) এ ব্যপারে ঠিক বলেছেন, চাদ ও সূর্যের আলোর উৎস তারা নিজেরাই। সূর্যের 'দিয়্যা' উত্তপ্ত আর অপরদিকে চাঁদের 'নূর' নিরুত্তাপ শীতল। আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে কাফিরদের বিকৃত ধারনার সাথে মুসলিমরা তাল মেলাতে শুরু করে তখন থেকে যখন থেকে গ্রীক দর্শন কালাম শাস্ত্রের নামে গ্রহন করতে শুরু করে। আজ ইসলামের অনেক বড় দাঈরা কাফিরদের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পেতে আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে।এরা কাফিরদের বিভিন্ন কাল্পনিক আবিষ্কারের রেফারেন্স টানতেও ভুল করেনি।যেমন দেখুনঃ
http://www.answering-christianity.com/ahmed_eldin/light_of_moon.htm

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চাঁদের জন্য বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারন করেছেন। সেটা ১৫ দিন অন্তর বিভিন্ন মঞ্জিলে পরিবর্তিত হয়ে পূর্নতা প্রাপ্ত হয়। আমরা ইতোমধ্যে হাদিসে চাঁদের স্বীয় আলোর উল্লেখ পেয়েছি। তাই এটা স্পষ্ট যে চাঁদের আলোর হ্রাস বা বৃদ্ধি চাঁদের সাথেই সংশ্লিষ্ট ,এতে হেলিওসেন্ট্রিক মিথ্যাচার অনুযায়ী সূর্য কিংবা পৃথিবীর সম্পৃক্ততা নেই। চাঁদের জন্য সৃষ্ট মঞ্জিলের ব্যপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা স্বয়ং বলেন:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়।

[সূরা ইয়াসিন:৩৯]

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ

এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে[ইনশিকাকঃ১৮]

অতএব আল্লাহর নির্ধারন অনুযায়ী চাঁদ তার স্বীয় আলোর পরিবর্তন করে। কখনো তা একদম ছোট হয়ে যায়, কখনো বা পূর্নতাপ্রাপ্ত হয়।

আধুনিক কাব্বালিস্টিক সুডো সায়েন্স আমাদেরকে বলে। চাঁদ সূর্যের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র। পৃথিবীর চেয়েই সূর্য ১৩ লক্ষগুন বড়! অথচ সত্য হচ্ছে আল্লাহ আযযা ওয়াযাল চাঁদ ও সূর্যকে সমান্তরাল কক্ষপথে রেখেছেন। চাঁদ সূর্য নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটির পিছনে আরেকটি আসমানি সমুদ্রের কক্ষপথে(ফালাকে) সন্তরনশীল। চাঁদ সূর্যকে স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমনরত। এখানে 'প্রত্যেকে' দ্বারা আমি শুধু চাঁদ সূর্যের কথাই বলেছি। কিন্তু যারা আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে মিথ্যাচার করে তারা কুরআনের আয়াতে যখন 'প্রত্যেকে' শব্দটিকে পায় তারা এর দ্বারা বলতে চায়, এই 'প্রত্যেকের' মধ্যে যার উল্লেখ নেই, সেটাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ চাঁদ,সূর্য,পৃথিবী সবকিছুই!!! এদের যুক্তি হচ্ছে, যদি প্রাচীনকালে সুস্পষ্টভাবে পৃথিবীর গতির কথা বলা হত ,তবে মুসলিমরা মুরতাদ হয়ে যেত! নাউজুবিল্লাহ!! দেখুন: http://www.peaceinislam.com/mahir/19321/
এখানে আরেক দ্বীনের দাঈ আধুনিক অপবিজ্ঞান আর কুরআন সুন্নাহকে এক করতে কতকিছু করলেন! নিউটনের মত সর্সারারের বিচিত্র থিওরি আনতেও ভুল করেননি! এরা যে কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যা বুঝতে ও করতে কাফিরদের চশমা ব্যবহার করছে, সেটা খুবই স্পষ্ট। ইসলামকে অপবিজ্ঞানের চাকায় ঘুরিয়ে ব্যাখ্যাদানের এক মহাপ্রচেষ্টা। পড়ুনঃ
https://response-to-anti-islam.com/show/
%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF-
%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE
%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF
%E0%A6%AC%E0%A7%80-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87--
%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-
%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87--/189

আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।

[আম্বিয়াঃ৩৩]

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন:

> এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করছেনঃ তোমরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য কর এবং দিন ও ওর আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারপর এ দুটোর পরস্পর ক্রমাগত সুশৃংখলভাবে গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য কর এবং একটি কমে যাওয়া ও অপরটি বেড়ে যাওয়া দেখো। আরো দেখো সূর্য ও চন্দ্রের দিকে। সূর্যের আলো এক বিশেষ আলো এবং ওর আকাশ, ওর যামানা, ওর নড়াচড়া এবং ওর চলনগতি পৃথক। চন্দ্রের আলো পৃথক ওর কক্ষপথ পৃথক এবং চলনগতি পৃথক। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিমগ্ন রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তিনিই সকালকে উজ্জ্বলকারী, তিনিই রাত্রিকে শান্তিময় করেন, তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ আয়াতে চাঁদ,সূর্য,দিন-রাত্রির বাইরে অন্য কিছুকে উল্লেখ করেননি। এখানে 'কুল্লুন' শব্দটি দ্বারা এই চারটি জিনিসের সবগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এর বাহিরের কোন কিছুকে নয়। কোন মুফাসসীরও এমনটি বলেননি,উপরেই ইমাম ইবনে কাসিরের তাফসির উল্লেখ করেছি।

কাফিরদের মনগড়া থিওরি গ্রহন করা ব্যধিগ্রস্ত মুসলিমরা এর মধ্যে পৃথিবীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এতে তাদের ফায়দা হলো, কাফির মুশরিকদের আকিদার সাথে নিজেদের সমন্বয়সাধন। ইসলাম ও বাতিলের মেলবন্ধন।

কুল্লুন শব্দটি শুধু এই আয়াতেই নয়, আরো অনেক আয়াতে রয়েছে।

আল্লাহ বলেনঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ

সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে

[ইয়াসিন ৩৮,৪০]

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্-(সঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "ওর গন্তব্যস্থল আর্শের নীচে রয়েছে।"

মুসনাদে আহমাদে এর পূর্ববর্তী হাদীসে এও রয়েছে যে, সে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। তাকে যেন বলা হয়ঃ "তুমি যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও।" তখন সে তার উদয়ের স্থান হতে বের হয়। আর এটাই হলো তার গন্তব্যস্থান।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটির প্রথম অংশটুকু পাঠ করেন।

একটি রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে, এটা খুব নিকটে যে, সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবূল করা হবে না এবং অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেয়া হবে না। বরং বলা হবেঃ "যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও।" তখন সে পশ্চিম দিক হতেই উদিত হবে। এটাই হচ্ছে এই আয়াতে কারীমার ভাবার্থ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূর্য উদিত হয় এবং এর দ্বারা মানুষের পাপরাশি মাফ করে দেয়া হয়। সে অস্তমিত হয়ে সিজদায় পড়ে যায় এবং অনুমতি প্রার্থনা করে। সে অনুমতি পেয়ে যায়। একদিন সে অস্তমিত হয়ে বিনয়ের সাথে সিজদা করবে এবং অনুমতি প্রার্থনা করবে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। সে বলবেঃ "পথ দূরের, আর অনুমিত পাওয়া গেল না! এজন্যে পৌঁছতে পারবো না।" কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখার পর তাকে বলা হবেঃ "যেখান হতে অস্তমিত হয়েছিলে সেখান হতেই উদিত হও।" এটা হবে কিয়ামতের দিন। যেই দিন ঈমান আনয়নে কোন লাভ হবে না। যারা ইতিপূর্বে মুমিন ছিল না সেই দিন তাদের সৎ কাজও বৃথা হবে।

এটাও বলা হয়েছে যে, مُسْتَقَرٌّ দ্বারা ওর চলার শেষ সীমাকে বুঝানো হয়েছে, যা হলো পূর্ণ উচ্চতা, যা গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে এবং পূর্ণ নীচতা যা শীতকালে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা একটা উক্তি হলো। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই আয়াতের مُسْتَقَرٌّ শব্দের দ্বারা ওর চলার সমাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন ওর হরকত বন্ধ হয়ে যাবে। ওটা জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং এই সারা জগতটাই শেষ হয়ে যাবে। এটা হলো مُسْتَقَرٌّ زَمَانِى বা সময়ের গন্তব্য।

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সূর্য স্বীয় গন্তব্যের উপর চলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের উপর, যা সে অতিক্রম করতে পারে না। গ্রীষ্মকালে তার যে চলার পথ রয়েছে এবং শীতকালে যে চলার পথ রয়েছে, ঐ পথগুলোর উপর দিয়েই সে যাতায়াত করে থাকে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতে لَا مُسْتَقَرَّ لَهَا রয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের চলার বিরাম নেই। বরং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে দিন রাত অবিরাম গতিতে আবর্তন করতে রয়েছে। সে থামেও না এবং ক্লান্তও হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ অর্থাৎ "তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন

তা'আলার নির্দেশে দিন রাত অবিরাম গতিতে আবর্তন করতে রয়েছে। সে থামেও না এবং ক্লান্তও হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ অর্থাৎ "তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন যেগুলো ক্লান্ত হয় না এবং থেমেও যায় না।"(১৪ ঃ ৩৩) কিয়ামত পর্যন্ত এগুলো এভাবে চলতেই থাকবে। এটা হলো ঐ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর কেউ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না এবং যাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

অর্থাৎ "তিনি সকাল আনয়নকারী, যিনি রাত্রিকে শান্তি ও আরামের সময় বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাব দ্বারা নির্ধারণ করেছেন, এটা হলো মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"(৬ ঃ ৯৭) এভাবেই মহান আল্লাহ সূরায়ে হা-মীম সাজদাহর আয়াতকেও সমাপ্ত করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ চন্দ্রের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। ওটা এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন সূর্যের চলন দ্বারা দিন রাত জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

অর্থাৎ "লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাওঃ ওটা মানুষ এবং হজ্বের জন্যে সময় নির্দেশক।"(২ ঃ ১৮৯) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ -

অর্থাৎ "তিনি সূর্যকে জ্যোতির্ময় ও চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন এবং ওগুলোর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর ও হিসাব জানতে পার।"(১০ ঃ ৫) আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا -

অর্থাৎ "আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা

তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা স্থির করতে পার এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।"(১৭ ঃ ১২) সুতরাং সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন গতিও পৃথক। সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে এবং ঐ জ্যোতির সাথেই হচ্ছে। হ্যাঁ তবে ওর উদয় ও অস্তের স্থান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম বেশী হতে থাকে। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র। চন্দ্রের মনযিলগুলো বিভিন্ন। মাসের প্রথম রাত্রে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং আলো খুবই কম হয়। দ্বিতীয় রাত্রে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মনযিলও উন্নত হতে থাকে। তারপর যেমন যেমন উঁচু হয় তেমন তেমন আলো বাড়তেই থাকে। যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো নিয়ে থাকে। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাত্রে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ওর আলোকও পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর কমতেও শুরু করে। এভাবে ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে প্রকাশিত করেন। আরবরা চন্দ্রের কিরণ হিসেবে মাসের রাত্রিগুলোর নাম রেখে দিয়েছে। যেমন প্রথম তিন রাত্রির নাম 'গারার'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'নাকাল'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'তিসআ'। কেননা, এগুলোর শেষ রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'আশ্‌র'। কেননা এগুলোর প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'বীয'। কেননা, এই রাত্রিগুলোতে চন্দ্রের আলো শেষ পর্যন্ত থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম তারা 'দারউন' রেখেছে। এই دُرَّعٌ শব্দটি دَرْعَاءُ শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলোর এই নামকরণের কারণ এই যে, ষোল তারিখের রাত্রে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত

হয়ে থাকে। তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার হয় অর্থাৎ কালো হয়। আর আরবে যে বকরীর মাথা কালো হয় তাকে شَاةٌ دَرْعَاءُ বলা হয়। এরপর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'যুল্‌ম' বলে। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'হানাদিস'। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'দা'দী' বলা হয়। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'মাহাক', কেননা, এতে চন্দ্র শেষ হয়ে যায় এবং মাসও শেষ হয়।

হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ) 'তিসআ' ও 'আশ্‌র্‌কে গ্রহণ করেননি। যেমন غَرِيْبُ الْمُصَنَّفِ নামক কিতাবে রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া।' এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেউ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক যাবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির পালার সময় অপরটি হারিয়ে থাকবে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ওটা হলো নতুন চাঁদের রাত্রি। ইবনে মুবারক (রঃ) বলেন যে, বাতাসের পর বা ডানা রয়েছে এবং চন্দ্র পানির গিলাফের নীচে স্থান করে নেয়। আবূ সালিহ্ (রঃ) বলেন যে, এর আলো ওর আলোকে ধরতে পারে না। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, রাত্রে সূর্য উদিত হতে পারে না।

আর রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারে না, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাত্রে। রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে এসে পড়ে। একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, না বিশৃংখলার আশংকা আছে। এমন হতে পারে না যে, দিনই থেকে যাবে, রাত্রি আসবে না এবং রাত্রি থেকে যাবে, দিন আসবে না। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিবস ও রজনী নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসেম (রঃ)-এর উক্তি এই যে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ফালাকে এগুলো যাওয়া আসা করছে। কিন্তু এটা বড়ই গারীব এমনকি মুনকার বা অস্বীকৃত উক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি হচ্ছে চরখার ফালাকের মত। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা যাঁতার পাটের লোহার মত।

অর্থাৎ চরকার ন্যায় অথবা যাঁতার পাটের লোহার মত ফালাকের কক্ষপথে চাঁদ সূর্য দিন রাত্রি আবর্তন করছে। এই কক্ষপথ পৃথিবীকেন্দ্রিক।১৪০০ বছর পর মোডারেট ও মর্ডানিস্ট মুসলিমদের নব:উদ্ভাবিত অপব্যাখ্যা অনুযায়ী আদৌ সূর্যোকেন্দ্রিক নয়,কাফিরদের আকিদানুযায়ী পৃথিবীও ফালাকের অন্তর্ভূক্ত নয়। চাঁদ,সূর্য,তারকা,দিন-রাত্রি শুধুমাত্র ফালাকে আবর্তনশীল,এর বাইরের অন্য কিছু নয়।
এ ফালাকে চাঁদ সূর্য,দিন রাত্রি সমান্তরালভাবে একের পিছনে অপরটি আবর্তন করে।। একটির পিছনে আরেকটি আবর্তন করে, কিন্তু কেউ কারো সাথে স্পর্শ করে না। গম্বুজাকৃতির আসমানকে প্রদক্ষিন করে চাঁদ,সূর্য সমতল যমীনের নিচ প্রদক্ষিন করে অপর প্রান্তে উদিত হয়। ওয়া আল্লাহু আ'লাম। "কুল্লুন" শব্দ যোগে আল্লাহ আরো একাধিক আয়াত নাযিল করেন, এর দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত সেলেস্টিয়াল বডির বাইরে অন্য কিছুকে বোঝানো হয় নি। আল্লাহ বলেনঃ

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ;

তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়

[ফাতিরঃ১৩]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সুর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল

[যুমারঃ০৫]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন?

[লোকমান-২৯]

চাঁদ-সূর্যের প্যারালাল(সমান্তরাল) অবস্থানে আবর্তনের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়, যখন আল্লাহ চন্দ্রকে সূর্যের পিছনে আসার কথা বলেন। আল্লাহ বলেন:

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে[শামসঃ২]

চাঁদ সূর্যকে অনুসরণ করছে, এমনটা নয় যে পৃথিবীকে সূর্য আর পৃথিবীসহ সকল আসমানি বস্তু সূর্যকে,যেমনটা প্রচলিত বিজ্ঞান আমাদেরকে শেখায়। আল্লাহ বলেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ

তিনি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে একে অপরের অনুগামীরূপে বানিয়েছেন।(১৪:৩৩)

এর দ্বারা প্রমান হয় চাঁদ-সূর্য হেলিওসেন্ট্রিক প্যগান কস্মোলজি অনুযায়ী সুবিশাল দূরত্বে অবস্থান করছে না, বরং তারা অনেক কাছাকাছি। এতে প্রমান হয় চাঁদ ও সূর্যের আকৃতিগত বৈষম্য এতটা বেশি নয় যেটা শেখানো হয়। বরং, তাদের মধ্যকার আকৃতিগত বৈষম্য অনেক কম। চাঁদ-সূর্য পরস্পর সন্নিকটস্থ, পৃথিবীরও অনেক নিকটবর্তী দূরত্বে এদের অবস্থান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরশের আলোকে সূর্যালোকের উৎস বানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত হাদিস চাঁদের আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সূর্য আকারে চাঁদের চেয়ে কিছুটা বড়, কিন্তু নূনের পৃষ্ঠে সমতলে বিছানো যমীনের তুলনায় অনেক ছোট।আল্লাহ এর জন্য একটি কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সূর্য সত্যিই উদিত হয় এবং অস্ত যায়। এটা পার্স্পেক্টিভের ইল্যুশন না আদৌ, যেমনটা কাফিররা বলে থাকে। সারা আসমান একবার প্রদক্ষিন করে পশ্চিম দিকের কালো পানিতে সেটা অস্ত যায়। সূর্য ডুবে যাবার পর সেটা যমীনের তলদেশে চলে যায়। অতঃপর, তা এক আসমান থেকে অপর আসমানে যেতে থাকে, এর পর সর্বোচ্চ আসমানে পৌছে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় উদিত হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। অতঃপর যমীনের বিপরীত পূর্বে গিয়ে উদিত হয়। হয়ত, পুরো বিষয়টা অনেক দ্রুত হয়, তাই আমরা একদিকে অস্ত অন্যদিকে উদীত হবার মাঝে সময়ের তেমন কোন পার্থক্য অনুভব করিনা। ওয়া আল্লাহু আ'লাম। যা উল্লেখ করলাম এসব কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক তথ্য, কোন কাফির মুশরিকদের মনগড়া বানীভিত্তিক কিছু নয়।

হয়ত,চাঁদ সূর্য আমাদের মাথার উপর প্রথম আসমানেই অবস্থান করে। প্রাচীন গ্রেসীয়ান টলেমিয়ান এস্ট্রোনমি অনুযায়ী সূর্য চতুর্থ স্তর উপরের কক্ষপথে, হয়ত এটা থেকে ইবনে কাসিরসহ প্রাচীন কিছু আলিম মনে করতেন যে সূর্য ৪র্থ আসমানে। তাদের মত সত্য হলে সাত আসমানের স্তরগুলো আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যেই রয়েছে। এতে করে প্রচলিত বিজ্ঞানপন্থীরা অপব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আরও বিপদে পড়বে,কেননা তাদের মতে প্রথম আসমানের সীমানা এখনো সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে, ৪র্থ আসমানের কোনকিছু দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকার বিষয় তো অনেক দূরের কথা।

হয়ত সূর্য প্রথম আসমানেই অবস্থিত। এরূপ ধারনার কারন, কিছু হাদিসে প্রত্যেক আসমান তৈরির উপাদানের বর্ননা পাওয়া যায়, প্রথম আসমান পানির বা স্ফটিকের তৈরি, এজন্য স্বচ্ছ। কিন্তু এর উপরের গুলির বর্ননানুযায়ী, উর্দ্ধদেশের কিছুই দেখা সম্ভব না। এজন্য এরূপ হতে পারে যে সবকিছুই প্রথম আসমানে রয়েছে।তাছাড়া কিছু হাদিসেও প্রথম আসমানে চন্দ্র-সূর্য,তারকাদের ফালাকের অবস্থানের কথা এসেছে। বিপরীত মত(সূর্য ৪র্থ আসমানে) সত্য হলেও কোন আপত্তি

নেই। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

শাইখ সালিহ আল উসাইমিন(রহঃ),শাইখ ইবনে বাজ(রহঃ) প্রমুখ আলিমগন যখন কুরআন সুন্নাহর দলিলে জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজির প্রমান দেখিয়েছেন,তখন তারা আলোচিত দলিল সমূহে সূর্যের পৃথিবীকেন্দ্রিক আবর্তনকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন। এ বিষয়ে তাদের অবস্থান সঠিক। কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য প্রমান আছে যা স্পষ্টভাবে সূর্যের পৃথিবীকেন্দ্রিক আবর্তনকে প্রকাশ করে। নিচের হাদিসটিকে লক্ষ্য করুনঃ

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)। এই সূর্য কোথায় যায় তা তুমি জান কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-ই খুব ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা গিয়ে আল্লাহর আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যায় এবং স্বীয় প্রতিপালকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে। এটা খুব নিকটবর্তী যে, একদিন তাকে বলে দেয়া হবে– 'যেখান হতে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।"[১]

এখানে আল্লাহ সূর্যকে যে স্থান থেকে এসেছে ,সেখানে ফিরে যাবার জন্য হুকুম করবেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় সূর্যই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং সূর্যকেন্দ্রিক মহাকাশ ব্যবস্থা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। হাদিসটি প্রমান করে সূর্যই প্রতিদিন যমীনের চারপাশে আবর্তনের পরে অস্তমিত হয়ে আরশের নিচে গিয়ে সিজদাহ করে।এমনটি নয় যে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সূর্যাস্তের ইল্যুশন সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু , গোলাকার পৃথিবীতে পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাতে হলে পোল শিফটিংয়ের ঘটনা ঘটতে হবে,অর্থাৎ পৃথিবী উল্টে গিয়ে দক্ষিনমেরুকে উত্তরমেরুর স্থানে এবং দক্ষিনমেরুকে উত্তরমেরুর স্থানে আসতে হবে। এরূপ হবার কথা হলে, হাদিসে সূর্যকে পশ্চিমদিক দিয়ে উদিত হতে হুকুম না দিয়ে পৃথিবীকেই উল্টে যেতে বলতেন। অতএব,এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে সূর্যই প্রতিদিন পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে,অস্তমিত যাচ্ছে এবং আরশের নিচে সিজদায় পড়ে প্রতিদিন উদিত হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে।

এরকম আরো কিছু হাদিসঃ

It is narrated on the authority of Abu Dharr that the Messenger of Allah (may peace be upon him) one day said: Do you know where the Sun goes? They replied: Allah and His Apostle know best. He (the Holy Prophet) observed: Verily it (the Sun) glides till it reaches its resting place under the

Throne. Then it falls prostrate and remains there until it is asked: Rise up and go to the place whence you came, and it goes back and continues emerging out from its rising place and then glides till it reaches its place of rest under the Throne and falls prostrate and remains in that state until it is asked: Rise up and return to the place whence you came, and it returns and emerges out from it rising place and the it glides (in such a normal way) that the people do not discern anything (unusual in it) till it reaches its resting place under the Throne. Then it would be said to it: Rise up and emerge out from the place of your setting, and it will rise from the place of its setting. The Messenger of Allah (may peace be upon him) said. Do you know when it would happen? It would happen at the time when faith will not benefit one who has not previously believed or has derived no good from the faith.

Sahih Muslim 1:297

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ" يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ". قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ" فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}"

Abu Dharr said: Once I was with the Prophet (ﷺ) in the mosque at the time of sunset. The Prophet (ﷺ) said, "O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?" I replied, "Allah and His Messenger know best." He said, "It proceeds until it prostrates underneath Allah's Throne. And that is Allah's saying: 'And the sun runs on its course to its settling place.'" (Quran 36:38)

(Bukhari, 4802)

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهِ { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} قَالَ " مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ

Abu Dharr said: I asked the Prophet (ﷺ) regarding the verse, "And the sun runs on its course to its settling place." (Quran 36:38) He said, "Its settling place is underneath Allah's Throne."

(Bukhari 7433)

فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا، يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا

In another narration, the Messenger said: "The Sun proceeds until it prostrates itself under the Throne and seeks permission to rise again, and it is permitted. Then a time will come when it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return from where it has come and so it will rise in the West."

(Bukhari 3199)

এক জিহাদের অভিযানে হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ) তার সেনাবাহিনী নিয়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করছিলেন। তখন প্রায় আসরের সময় হয়ে গিয়েছিল। ঐ অবস্থায় তিনি সূর্য যেন ডুবে না যায়,সেজন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। অতঃপর ,সূর্য থেমে গিয়েছিল।

إن الشمس لم تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إلا ليوشع لَيَالِي سافَرَ إلى بيت المقدس

From Abu Hurairah, the Prophet (ﷺ) said: "The Sun was not held back for any human being except Joshua (Yoosha') as he was marching to Jerusalem."

(Ahmad in Al-Musnad 2/325, Al-Hākim 2/130 –
the narration is authentic to the conditions of Bukhari)

فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

In a narration, the Messenger said: "The Prophet (Yoosha' or Joshua) carried out a military expedition and when he reached the town at the time or nearly at the time of the 'Asr prayer, he said to the Sun, "O Sun! You are under Allah's command and I am under Allah's command. O, Allah! Stop it from setting on us." It was stopped until Allah made him victorious."

(Bukhari, 3124)

হাদিসে লক্ষনীয় বিষয় যে এখানে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) সূর্যকে থেমে যাবার কথা বলেছেন। সূর্যাস্ত যদি পৃথিবীর ঘূর্ননের জন্য হত, তবে সূর্যের কথা না বলে পৃথিবীকে থামবার কথা বলতেন। এ হাদিস সত্যকে আরো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

হিব্রু বাইবেলেও একই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়:

12: Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the sons of Israel, and he said in the sight of Israel, "O sun, stand still at Gibeon, And O moon in the valley of Aijalon." 13: So the sun stood still, and the moon stopped until the nation avenged themselves of their enemies."

(Joshua 10:12-13)

কুরআন সুন্নাহে এরকম শত সহস্র দলিল আছে যা প্রমাণ করে সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবং যমীন সমতল।মেইনস্ট্রিম সমতল পৃথিবীর যে মডেল রয়েছে তাতে, সূর্য চক্রাকারে জমিনের উপরে ঘড়ির কাটার মত ঘুরতে থাকে। প্রচলিত ফ্ল্যাট আর্থ মডেলটি গ্লোবাল স্পিরিচুয়ালিস্ট এজেন্ডা কর্তৃক সবচেয়ে বেশি প্রোমোটেড। এটা আধ্যাত্মবাদী চীনা তাওধর্মের ইং ইয়াং সিম্বল থেকে নেওয়া। তাওবাদীরা মনে করে ইং ইয়াং তথা চন্দ্র সূর্য্যের ঘড়ির কাটার মত সন্তরন দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান পৃথিবীতে চড়ে বেড়ায় যা সাধনা দ্বারা ধারন করতে হয়। সুতরাং এই ম্যাপটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এছাড়া প্রচলিত এ ফ্ল্যাট আর্থ মডেলের ম্যাপগুলোর সাথে বাস্তবতার খুব বেশি মিল নেই। অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপটি গ্লোব মডেল একরকম, আর সমতল ম্যাপে অন্যরকম। সর্বোপরি মেইনস্ট্রিম ফ্ল্যাট আর্থ মডেল(এ্যাযিমুথাল একুাইডিস্ট্যান্ট প্রজেকশন) কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। আল্লাহ তার পবিত্র কালামে মাজীদে বলেছেন সূর্য কর্দমাক্ত জলাশয়ে ফিজিক্যালি অস্তমিত হয়।এটা যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহর অমোঘ সত্য দলিলগুলোকে লঙ্ঘন করে,সেজন্য আমরা এই মডেলকে ভুল মনে করি। কুরআন হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ননা পাওয়া যায় যে,কর্দমাক্ত জলাশয়ে সূর্যাস্ত ফিজিক্যালি ঘটে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি গোটা আসমান যমীনের চারদিক সমুদ্রবেষ্টিত। আমাদের মাথার উপরের আসমানও একটি আবদ্ধ তরঙ্গের সমুদ্র, যার মধ্য দিয়ে কক্ষপথ নির্মিত আছে তারকা,চাঁদ-সূর্যের সঞ্চালনের জন্য।

We were told the same by al-Qasim b. al-Hasan-al-I;Iusayn b. Dawud-Hajjaj-Ibn Jurayj-Sa'id b. Jubayr-Ibn 'Abbas. He said288 : The heavens and the earth and everything in them are encompassed by the oceans, and all of that is encompassed by the haykal,289 and the haykal reportedly is encompassed by the Footstool.

[ইমাম ইবনে জারির তাবারির ইতিহাস]

সূর্য রোজ এই আসমানি সমুদ্রে সন্তরনের পর পশ্চিমের কর্দমাক্ত জলাধারে অস্তগমন করে সমতল যমীনের তলদেশে চলে যায়। পরবর্তী দিন আবার পূর্বদিক থেকে উদিত হয়।চন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এ ব্যপারে একটি সুস্পষ্ট হাদিস এসেছে যার ইসনাদ বিশুদ্ধ। আজকে কাফিরদের অপবিজ্ঞান গ্রহনকারী মুসলিমরা আজ এই দলিলকে এড়িয়ে যেতে অনেক চেষ্টা করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূর্য 'সাফিয়াহ' (পশ্চাৎ ভাগের ফৌজ)-এর ন্যায় কাজ করে। দিনে নিজের চক্রের কাজে লেগে থাকে, তারপর

১. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

www.QuranerAlo.com

সূরাঃ লোকমান ৩১ ৬৯৭ পারাঃ ২১

অস্তমিত হয়ে আবার রাত্রে যমীনের নীচে চলে গিয়ে ঘুরতে থাকে। অতঃপর পরের দিন আবার সকালে উদিত হয়। এভাবেই চাঁদও কাজ করতে থাকে।

English:

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn 'Abbas said, "The sun is like flowing water, running in its course in the sky during the day. When it sets, it travels in its course beneath the earth until it rises in the east." He said, "The same is true in the case of the moon."

Its chain of narration is **Sahih**.

[Tafsir ibn Kathir-31:29]

বিস্তারিত:

http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1784

হাদিসটি প্রচলিত মহাকাশবিজ্ঞানের সম্পূর্ন বিপরীত। এ হাদিস ঠিক তাই বলে,যা আমরা প্রতিনিয়ত বলি। এটা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে পৃথিবী সমতল, সূর্য পৃথিবীর তুলনায় অনেক ছোট। সেটা অস্ত যায় যমীনের একদিকে,এরপর সেটা যমীনের তলদেশ দিয়ে পার হয়ে বিপরীত দিক থেকে উদিত হয়। হাদিসটি তাদের ভন্ডামি প্রকাশ করে দেয় যারা কাফির মুশরিকদের কাল্পনিক শয়তানি সৃষ্টিতত্ত্বকে ইসলামাইজ করে, ইসলামের সাথে সমন্বয় ঘটায় এবং শয়তানি কস্মোলজিকে গ্রহন করে নেয়।

এই হাদিস যে মোডারেট, মর্ডানিস্ট মুসলিম মানতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক। কারন মেইনস্ট্রীম বিজ্ঞানের সাথে একেবারেই ইনকম্প্যাটিবল। কোন কুযুক্তি দিয়েও মেলানো যায় না। এর উপর আরো বড় সমস্যা হচ্ছে এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, একে কোনভাবে বর্ননায় ত্রুটি দেখিয়ে সরাসরি জঈফ

বা মওযূ প্রমান করা যাচ্ছে না।এজন্য তাদের বিজ্ঞ আলিমগনের পরামর্শ হচ্ছে এটা নিয়ে মাথা না ঘামানো। এটা তাদের নিকট এজন্য অগ্রহনযোগ্য, কারনঃএটা সরাসরি আল্লাহর রাসূলের বানী নয়। বরং সাহাবীর।'এমনও হতে পারে যে', এটা কাব ইবনে আহবারের(রাঃ) থেকেও বর্নিত হতে পারে বলে "সন্দেহ"। 'এমনও হতে পারে যে',যে এটা ইজরাইলি বর্ননা। এজন্য
এটাকে অথেনটিক হাদিস হিসেবে গ্রহন করছেন না। তাই এটা নিয়ে মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন নেই, আনসাইন্টেফিক কিনা সেটা ভাবনা তো দূরের কথা। মোট কথা, কাফিরদের কাল্পনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গেলেই বাতিল। সেটা যেভাবেই হোক।
পড়ুনঃ
http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=336679

শুধু এ হাদিসই নয়, সূর্যাস্ত সংক্রান্ত সহীহ হাদিস গুলোকেও অগ্রহনযোগ্য বানানোর প্রানান্ত চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এরা কেমন যেন শরীআতের দলিলের চেয়েও কাফিরদের বিকৃত শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। যেই হাদিস, সায়েন্টিফিক থিওরির প্রতিকূলে সেগুলো বাতিল। দলিল সহীহ হলেও, যেকোন উপায়ে অগ্রহনযোগ্য বানানো হয়।
নিচের হাদিসগুলো লক্ষ করুনঃ

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة، - المعنى - قالا حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال " هل تدري أين تغرب هذه " . قلت الله ورسوله أعلم . قال " فإنها تغرب في عين حامية " .

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে একই গাধার পিঠে বসা ছিলাম, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি জানো, এটা কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ “এটা উষ্ণ পানির এক ঝর্ণায় অস্তমিত হয়” (সূরাহ কাহ্ফঃ ৮৬)। [৪০০২]

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০০২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برذعة أو قطيفة قال: فذاك عند غروب الشمس, فقال لي: «يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب في عين حامئة تنطلق حتى تخر لربها -عز وجل- ساجدة تحت العرش فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول: يا رب إن مسيري بعيد، فيقول لها: اطلعي من حيث غبت فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ». (حم) صحيح

আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেনঃ আমি একটি গাধার ওপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ের সাথে ছিলাম। তখন তার উপর একটি পাড়যুক্ত চাদর ছিল। তিনি বলেনঃ এটা ছিল সূর্যাস্তের সময়, তিনি আমাকে বলেনঃ “হে আবু যর তুমি জান এটা কোথায় অস্ত যায়?” তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলেনঃ সূর্যাস্ত যায় একটি কর্দমাক্ত ঝর্ণায়, সে চলতে থাকে অবশেষে আরশের নিচে তার রবের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, যখন বের হওয়ার সময় আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন, ফলে সে বের হয় ও উদিত হয়। তিনি যখন তাকে যেখানে অস্ত গিয়েছে সেখান থেকে উদিত করার ইচ্ছা করবেন আটকে দিবেন, সে বলবেঃ হে আমার রব আমার পথ তো দীর্ঘ, আল্লাহ বলবেনঃ যেখান থেকে ডুবেছে সেখান থেকেই উদিত হও, এটাই সে সময় যখন ব্যক্তিকে তার ঈমান উপকার করবে না”। [আহমদ]

সহিহ হাদিসে কুদসি, হাদিস নং ১৬১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

মুসানাদে আহমাদ,সুনানে আবু দাউদ, বুখারীসহ আরো অনেক জায়গায় এ বর্ননা রয়েছে। খুব স্বাভাবিক যে অপবিদ্যাকে আকঁড়ে ধরা মুসলিমরা একে সহ্য করে পারবে না। তাই এজন্য হাদিসগুলোর চেইন অব ন্যারেশনে খুঁত বের করার জন্য কি প্রচেষ্টা(!) দেখুন, http://www.letmeturnthetables.com/2012/09/weak-hadith-sun-spring-warm-water.html?m=1

সূর্য কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্তমিত হয়। এটা শুধু হাদিসেই নয়, কুরআনেও স্পষ্ট আছে। আল্লাহ বলেনঃ

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

অবশেষে তিনি(যুলকারনাইন) যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।

এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব।

[সূরা কাহাফঃ৮৬-৮৮]

আধুনিক (অপ)বিজ্ঞান অনুযায়ী যেহেতু সূর্য ৯৩মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবী সূর্যের তুলনায় ১৩ লক্ষগুন ছোট ,তাই সূর্যের পক্ষে ১৩ লক্ষগুন ক্ষুদ্র যমীনে অস্তমিত হওয়া অসম্ভব ব্যপার। বিষয়টা একেবারেই কল্পনারও অযোগ্য ও অযৌক্তিক। এজন্য কাফিরদের সাথে সুর মেলানো মুসলিমরা বলে,এ আয়াতের দ্বারা অবজারভারের পার্স্পেক্টিভ থেকে সূর্যকে অস্ত হতে দেখার বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে।কিন্তু সূর্য কখনোই ফিজিক্যালি অস্তমিত হয় না, সূর্য তার অবস্থানে স্থির রয়েছে। পৃথিবীই বরং ঘূর্ননের দরুন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ইল্যুশন তৈরি করছে!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ যুগের মুসলিমরা যেভাবে নিজেদের মত ব্যাখ্যা তৈরি করে নিয়েছে , সাহাবীগন(রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কি বলেছিলেন? নিশ্চয়ই সাহাবীরা(রাঃ) হচ্ছেন হক্কের মাপকাঠি। তাদের আকিদা ও ব্যাখ্যাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সত্য। এ আয়াতের ব্যাপারে সাহাবীদের কথোপকথন এবং ব্যাখ্যা সংক্রান্ত হাদিসটি নিম্নরূপঃ

<u>English</u>

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِب الشَّمْس وَجَدَهَا تَغْرُب فِي عَيْن حَمِئَة }
يَقُول تَعَالَى ذِكْره : { حَتَّى إِذَا بَلَغَ { ذُو الْقَرْنَيْنِ }مَغْرِب الشَّمْس وَجَدَهَا تَغْرُب فِي عَيْن حَمِئَة }, فَاخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة ذَلِكَ, فَقَرَأَهُ بَعْض قُرَّاء الْمَدِينَة وَالْبَصْرَة : { فِي عَيْن حَمِئَة }بِمَعْنَى :

أَنَّهَا تَغْرُب فِي عَيْن مَاء ذَات حَمْأَة , وَقَرَأَتْهُ جَمَاعَة مِنْ قُرَّاء الْمَدِينَة , وَعَامَّة قُرَّاء الْكُوفَة : " فِي عَيْن حَامِيَة " يَعْنِي أَنَّهَا تَغْرُب فِي عَيْن مَاء حَارَّة . وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيلهمْ ذَلِكَ عَلَى نَحْو اِخْتِلَاف الْقُرَّاء فِي قِرَاءَته

The meaning of the Almighty's saying, 'Until he reached the place of the setting of the sun he found it set in a spring of murky water,' is as follows: When the Almighty says, 'Until he reached,' He is addressing Zul-Qarnain. Concerning the verse, 'the place of the setting of the sun he found it set in a spring of murky water,' the people differed on how to pronounce that verse. Some of the people of Madina and Basra read it as 'Hami'a spring,' meaning that the sun sets in a spring that contains mud. While a group of the people of Medina and the majority of the people of Kufa read it as, 'Hamiya spring' meaning that the sun sets in a spring of warm water. The people of commentary have differed on the meaning of this depending on the way they read the verse.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ: ثنا مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة , عَنْ وَرْقَاء , قَالَ سَمِعْت سَعِيد بْن جُبَيْر ,

قَالَ: كَانَ اِبْن عَبَّاس يَقْرَأ هَذَا الْحَرْف } فِي عَيْن حَمِئَة {

Muhammad bin 'Abd al-A'laa narrated and said: Marwan ibn Mu'awiya narrated from Warqa, he said: I heard Sa'id ibn Jubayr say: ibn 'Abbas read this letter "in a muddy spring"

وَيَقُول : حَمْأَة سَوْدَاء تَغْرُب فِيهَا الشَّمْس

and he said: the sun sets in black mud.

وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هِيَ تَغِيب فِي عَيْن حَارَّة

Others said: it disappears (تَغِيب) in a hot spring.

Tafsir al-Tabari for verse 18:86 .

The word "Hamiya" is derived from one of two pronunciations coming from the word "Hama'a" which is clay as Allah says, "I am creating people out of

dirt and compact clay" إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ which is smooth clay as has previously been shown. Ibn Jarir stated that it was narrated by Yunus, narrated by Ibn Wahb, narrated by Nafi' Ibn Abu Na'im who heard Abdel Rahim Al'Araj say that Ibn Abbas used to speak about the muddy well and would pronounce the word as "Hama'a."
Nafi' stated that Kab Al Ahbar was asked about it and he replied saying, "You are more learned in the Quran than I am, but I find it (the sun) in the Book (Torah) descending in black mud." It was similarly narrated by Ibn Abbas and Mujahid from others. Abu Dawud Al Tayalisi stated that it was narrated by Muhammad Ibn Dinar, narrated by Sa'ad Ibn Aws, Narrated by Misda', narrated by Ibn Abbas, narrated by Abu Ibn Kab that the prophet – peace be upon him- made him read it as "Hami'a." Also, Ali Ibn Abu Talha narrated from Ibn Abbas that the sun DESCENDS in a "Hamiya" well , meaning warm water well. The same was also narrated by Al-Hassan Al Basri.

Ibn Jarir stated that the truth is that both pronunciations are correct and no matter which way a person may read it then, he is correct. I said that there is no contradiction between the two meanings, for it may be that the water in the well is warm because it faces the heat of the setting sun with no protection from its rays. The word "Hami'a" meaning water mixed with black clay is also possible as was narrated by Kab Al Ahbar and others. It was narrated by Jarir, narrated by Muhammad Ibn Al Mathny, narrated by Yazid Ibn Harun, narrated by Al-Awam, narrated by a servant of Abdullah Ibn Umar, narrated by Abdullah who stated that the prophet – peace be upon him – watched the sun while it was setting and said, "In Allah's hot fire. If it wasn't for Allah's command, the sun would burn all those who are on earth." I said this was also narrated by imam Ahmad from Yazid Ibn Harun who elevated this hadith. It may be that this is the saying of Abdullah Ibn Umar and his companions whom he found during the battle of Yarmuk, and Allah knows best.

Ibn Abu Hatim stated that it was narrated by Hajjaj Ibn Hamza, narrated by Muhammad Ya'ny Ibn Bashir, narrated by Umar Ibn Maymun, narrated by Hadir Ibn Abbas who related that Mu'awiya Ibn Abu Sufyan read the verse in Surah of the Cave (Surah 18:86), "He found it set in a spring of murky water," and was told by Ibn Abbas that it was read and pronounced as "Hami'a." Mu'awiya then asked Abdullah Ibn Umar how he read it and was told, "We read it as you read it." Ibn Abbas told Mu'awiya, "That the Quranic verse was revealed in my house, so send for Kab Al-Ahbar." Ibn Abbas then asked Kab, " Where do you find the sun setting in the Torah? " He responded, "Ask the Arabian people for they are more learned about it. As for me, I find the sun setting in the Torah in water and mud," he then pointed towards the west. Ibn Hadir stated to Ibn Abbas, "Had I been present earlier with you I would have informed you of something to enlighten you regarding the issue of what the warm well is." Ibn Abbas replied, "And what would that be?" He said, "Regarding what was mentioned of Zul-Qarnain following a path with knowledge, he traveled the earth both east and west seeking the reasons, being a command given by a wise guide. He then saw the sun at dusk DESCENDING IN A WELL that was 'Khulb' and 'Thatin' and 'Harmad.'" Ibn Abbas asked, "What is Khulb?" He replied, "It is mud in their language." Ibn Abbas asked, "And what is Thatin?" He replied, "It is warmth." He was asked, "And what about Harmad?" He replied, "It means black." Ibn Abbas then asked for a male or a youth to be brought to him and said, "Write down what this man says."Sa'id Ibn Jubair narrated that Ibn Abbas was reading Surah of the Cave (Surah 18:86) and read the verse, "He found it set in a spring of murky water (Hama'a)." Then Kab said, "I swear by Him who holds Kab's soul in His hand, I have not heard anyone recite it the way it is revealed in the Torah other than Ibn Abbas. For we find it in the Torah descending in a black clod of mud."

حَمِئَةٍ শব্দ حَمْأَةٌ হতে বের হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মসৃণ কাদা মাটি। কুরআন কারীমের–

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ- (১৫ঃ ২৮)

(নিশ্চয় আমি মানুষকে খনখনে মাটি দ্বারা যা পচা কাদা হতে তৈরী করে সৃষ্টি করেছি) এই আয়াতের তাফসীরে এটা গত হয়েছে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই অর্থ শুনে হযরত নাফে' (রঃ) শুনেন যে, হযরত কা'ব আহবার (রঃ) জিজ্ঞাসার সুরে বলেছিলেনঃ "আপনারা আমার চেয়ে কুরআন বেশী জানেন। কিন্তু আমি তো কিতাবে পাচ্ছি যে, ওটা কালো বর্ণের মাটিতে ডুবে যায়?" একটি কিরআতে فِيْ عَيْنٍ حَامِيَةٍ রয়েছে। অর্থাৎ সূর্য গরম জলাশয়ে অস্তমিত হয়। এই দু'টি কিরআত প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং দু'টোই সঠিক। সুতরাং যে কোন একটি পড়া যাবে এবং এ দু'টোর অর্থেও কোন বৈপরীত্ব নেই। কেননা, সূর্য নিকটে থাকার কারণে পানি গরম ও কালো হয় এবং তথাকার মাটি কালো বর্ণের হওয়ার কারণেঐ পানির কাদা ঐ বর্ণেরই হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্যকে অস্তমিত হতে দেখে বলেনঃ "আল্লাহর উত্তেজনাপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে (অস্তমিত হচ্ছে), যদি আল্লাহর হুকুমে এর উত্তেজনা কমে না যেতো। তবে এটা যমীনের সমস্ত কিছু দগ্ধ করে ফেলতো। [১]

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মুআ'বিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান (রাঃ) সূরায়ে কাহ্ফের এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি عَيْنٍ حَامِيَةٍ পাঠ করনে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমরা তো حَمِئَةٍ পড়ে থাকি।" একথা শুনে হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কিরূপ পড়েন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আপনি যেভাবে পড়লেন আমিও সেই ভাবে পড়ে থাকি।" তখন

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। হতে পারে যে, এটা আবদুল্লাহ ইবনু আমরের (রঃ) নিজস্ব কথা। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমাদের ঘরেই কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয়েছে।" হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে হযরত কা'বকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "তাওরাতে আপনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার স্থান কোথায় পেয়ে থাকেন?" উত্তরে হযরত কাব' (রাঃ) বলেনঃ এ ব্যাপারে আহলুল আরাবিয়্যাহকে জিজ্ঞেস করুন। এ বিষয়ে তাঁরাই ভাল জ্ঞান রাখেন। আমি তাওরাতে পাই যে, সূর্য মাটি ও কাদার মধ্যে অস্তমিত হয়।" ঐ সময় তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা পশ্চিম দিকে ইশারা করেন। [১] এসব ঘটনা শুনে ইবনু

হা'যির (রঃ) বলেনঃ আমি ঐ সময় বিদ্যমান থাকলে হযরত ইবনু আব্বাসের (রাঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় তুব্বা'র নিম্নের দু'টি ছন্দ পাঠ করতাম যা তিনি যুলকারনাইনের আলোচনায় বলেছিলেনঃ

بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِي ۞ أَسْبَابَ أَمْرٍ مِنْ حَكِيمٍ مُرْشِدِ

فَرَأَى مُغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبِهَا ۞ فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وَثَاطٍ حَرْمَدِ

অর্থাৎ "তিনি মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌঁছে যান। কেননা, বিজ্ঞানময় ও পথ প্রদর্শক (আল্লাহ) তাঁকে সর্বপ্রকারের আসবাব ও সরঞ্জাম প্রদান করেছিলেন। তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় দেখতে পান যে, ওটা কালো বর্ণের কাদা মাটিতে অস্তমিত হচ্ছে।" হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "خُلُبٌ" এর অর্থ কি?" উত্তরে বলা হয়ঃ "মাটি।" তিনি প্রশ্ন করেনঃ ثَاط কি?" জবাবে বলা হয়ঃ "কাদা।" তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ حَرْمَد কি?" উত্তর আসে "কালো।" তৎক্ষণাৎ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) একটি লোককে বা তাঁর গোলামকে বলেনঃ "এই লোকটি যা বলছে তা লিখে নাও।"

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরায়ে কাহ্ফ পাঠ করেন। যখন তিনি وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ এইরূপ পাঠ করেন তখন হযরত কা'ব (রাঃ) বলে ওঠেনঃ "যাঁর হাতে কা'বের (রাঃ) প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তাওরাতে এরূপই রয়েছে। একমাত্র হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছাড়া আর কাউকেও আমি এরূপভাবে পড়তে শুনি নাই। তাওরাতেও এটাই রয়েছে যে, সূর্য কালো বর্ণের কাদায় অস্তমিত হয়।

১. এ হাদীসটি ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অতএব, সত্য হচ্ছে সূর্য সত্যিই জমিনের কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যায়, যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন। ইবনে কাসির রহঃ বিশ্বাস করতেন সূর্য চতুর্থ আসমানে। এজন্য তার তাফসিরে গেলে সামান্য আপত্তি পেতে পারেন। সাহাবীদের কথা গুলো চতুর্থ আসমানে সূর্যের অবস্থানের মতামতের

বিরুদ্ধে যায়(এ সংক্রান্ত আরো সুদীর্ঘ হাদিস সামনে আসছে,ইনশাআল্লাহ)। তারা স্পষ্টভাবে সূর্যের কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্তগমনের কথা বর্ননা করেছেন। আর এটা সমতল জমিন ছাড়া অসম্ভব। অথচ আফসোসের বিষয়,আজকের অপবিজ্ঞান এবং অপবিদ্যা, যাদুশাস্ত্রের ভ্রান্ত মেটাফিজিক্স(Origin of existence) দ্বারা উম্মাহ এতটাই প্রভাবিত যে সেসবই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, এমনকি সেসবকে কুরআন সুন্নাহ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে ও সমন্বয় করতে চেষ্টা করে!! আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পাশাপাশি এমন কিছু দলিল আছে যা সন্দেহাতীতভাবে যমীনকে সমতল প্রমান করে:

Thauban reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Allah drew the ends of the world near one another for my sake. And I have seen its eastern and western ends....

[Sahih Muslim 41:6904]

It was narrated from Sahl bin Sa'd As-Sa'idi that the Messenger of Allah said: "There is no (pilgrim) who recites the Talbiyah but that which is to his right and left also recites it, rocks and trees and hills, to the farthest ends of the earth in each direction, from here and from there."

[Sunan Ibn Majah 4:25:2921]

সূর্যের কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্ত যাবার আরও সুস্পষ্ট তথ্যবহুল দলিল নিম্নোল্লিখিত হাদীসেঃ

Imam Tabari who cites traditions from Muhammad and his companions:

The other report, referring to a different concept, is what I was told by Muhammad b. Abi Mansur- Khalaf b. Wasil- Abu Nu'aym- Muqatil b. Hayyan- Ikrimah: One day when Ibn `Abbas was sitting (at home or in the mosque), a man came to him and said: Ibn `Abbas, I heard Ka'b, the Rabbi, tell a marvelous story about the sun and the moon. He continued. Ibn `Abbas who had been reclining sat up and asked what it was. The man said: He suggested

that on the Day of Resurrection, the sun and the moon will be brought as if they were two hamstrung oxen, and flung into Hell. `Ikrimah continued. Ibn `Abbas became contorted with anger and exclaimed three times: Ka'b is lying! Ka'b is lying! Ka'b is lying! This is something Jewish he wants to inject into Islam. God is too majestic and noble to mete out punishment where there is obedience to Him. Have you not heard God's word: "And He subjected to you the sun and the moon, being constant" — referring to their constant obedience. How would He punish two servants that are praised for constant obedience? May God curse that rabbi and his rabbinate! How insolent is he toward God and what a tremendous fabrication has he told about those two servants that are obedient to God! He continued. Then he said several times: We return to God. He took a little piece of wood from the ground and started to hit the ground with it. He did that for some time, then lifting his head he threw away the little piece of wood and said: You want me to tell you what I heard the Messenger of God say about the sun and the moon and the beginning of their creation and how things went with them? We said: We would, indeed, May God show mercy unto you. He said: When the Messenger of God was asked about that ,
he replied : When God was done with His creation and only Adam remained to be created, **He created two suns from the light of His Throne** *. His foreknowledge told Him that He would leave here one sun, so He created it as (large as) this world is from east to west. His foreknowledge also told Him that He would efface it and change it to a moon; so the moon is smaller in size than the sun. But both are seen as small because of the sun's altitude and remoteness from the earth.*
He continued: ***If God had left the two suns as He created them in the beginning, night would not have been distinguishable from day****. A hired man then would not know until when he should labor and when he should receive his wages. A person fasting would not know until when he must fast. A woman would not know how to reckon the period of her impurity. The*

Muslims would not know the time of the pilgrimage. Debtors would not know when their debts become due. People in general would not know when to work for a livelihood and when to stop for resting their bodies. The Lord was too concerned with His servants and too merciful to them (to do such a thing). ***He thus sent Gabriel to drag his wing three times over the face of the moon, which at the time was a sun. He effaced its luminosity and left the light in it.*** *This is (meant by) God's word:* ***"And We have made the night and the day two signs. We have blotted out the sign of the night, and We have made the sign of the day something to see by."*** *He continued. The blackness you can see as lines on the moon is a trace of the blotting. God then created for the sun a chariot with 360 handholds from the luminosity of the light of the Throne and entrusted 360 of the angels inhabiting the lower heaven with the sun and its chariot, each of them gripping one of those handholds. He entrusted 360 of the angels inhabiting (the lower) heaven with the moon and its chariot, each of them gripping one of those handholds.*
Then he said: For the sun and the moon,
He created easts and wests (positions to rise and set) on the two sides of the earth and the two rims of heaven, 180 SPRINGS IN THE WEST OF BLACK CLAY – THIS IS (MEANT BY) GOD'S WORD: " He found it setting in a muddy spring," meaning by "muddy (hami'ah)" black clay - and 180 springs IN THE EAST LIKEWISE OF BLACK CLAY, bubbling and boiling like a pot when it boiled furiously*. He continued.*
Every day and night, the sun has a new place where it rises and a new place where it sets . *The interval between them from beginning to end is longest for the day in summer and shortest in winter. This is (meant by) God's word: "The Lord of the two easts and the Lord of the two wests," meaning the last (position) of the sun here and the last there. He omitted the positions in the east and the west (for the rising and setting of the sun) in between them. Then He referred to east and west in the plural, saying; "(By) the Lord of the easts and wests." He mentioned the number of all those springs (as above).*

He continued. ***God created an ocean three***
farsakhs (18 kilometers) removed from heaven. Waves contained, it stands in the air by the command of God. No drop of it is spilled. All the oceans are motionless, but that ocean flows at the rate of the speed of an arrow. It is set free to move in the air evenly, as if it were a rope stretched out in the area between east and west. The sun, the moon, and the retrograde stars RUN IN ITS DEEP SWELL .
THIS IS (MEANT BY) GOD'S WORD: ***" Each swims in a sphere ."*** *"The sphere" is the circulation of the chariot IN THE DEEP SWELL OF THAT OCEAN . By Him Who holds the soul of Muhammad in His hand! If the sun WERE TO EMERGE FROM THAT OCEAN, it would burn everything on earth, including even rocks and stones, and if the moon were to emerge from it, it would afflict (by its heat) the inhabitants of the earth to such and extent that they would worship gods other than God . The exception would be those of God's friends whom He would want to keep free from sin.*

[ইমাম ইবনে জারির তাবারির ইতিহাস]

উপরের এ হাদীসে অনেকগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা মেলে। আল্লাহ চাঁদ সূর্য উভয়কেই সৃষ্টি করেন দুটি সূর্য হিসেবে। উভয়ের একই বৈশিষ্ট্যের ফলে রাত দিন আলাদা করা মুশকিল হয়ে ছিল। এজন্য জিব্রাইল(আঃ) এর দ্বারা চাঁদের উপর কালিমা লেপন করে আলো কমিয়ে রাতের উপযোগী করা হয়।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নিম্নতম আসমানে চাঁদ ও সূর্যের জন্য কক্ষপথ নির্ধারন করেছেন। আসমানী সমুদ্রের কক্ষপথে চাঁদ ও সূর্যের জন্য ৩৬০ জন করে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন যারা চাঁদ সূর্যকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ সমতল পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে ১৮০টি করে উত্তপ্ত কালো পানির জলাশয় তৈরি করেছেন, চাঁদ সূর্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্তগমন করে, তেমনি ১৮০টির মধ্যে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উদিত হয়। শীত ও গ্রীষ্মে উদয়াচল ও অস্তাচলে সূর্যের উদয় অস্তের স্থান পরিবর্তন করে, এতে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে কমে। এজন্য আল্লাহ বলেনঃ
"তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তালয়ের মালিক।"

(আর রহমান; আয়াত ১৭)

"আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয় আমি সক্ষম।"

(আল মা'আরিজ; আয়াত ৪০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমানে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দড়ির ন্যায় পানির কক্ষপথ নির্মান করেন। এতে পানির গতি ধনুকের তীরের ন্যায় । চাঁদ-সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রসমূহ এ কক্ষপথে সন্তরনশীল।

অপর এক হাদীসঃ

Ibn `Abbas said that `Ali b. Abi Talib said to the Messenger of God : You are like my father and my mother! You have mentioned the course of the retrograde stars (al-khunnas) by which God swears in the Qur'an, together with the sun and the moon, and the rest. Now, what are al-khunnas? The Prophet replied: `Ali, they are five stars: Jupiter ( al-birjis ), Saturn ( zuhal ), Mercury ( `utarid), Mars (bahram), and Venus (al-zuhrah). These five stars rise and run like the sun and the moon and race with them together . All the other stars are suspended from heaven as lamps are from mosques, and circulate together with heaven praising and sanctifying God with prayer. The Prophet then said: If you wish to have this made clear, look to the circulation of the sphere alternately here and there. It is the circulation of heaven and the circulation of all the stars together with it except those five . Their circulation today is what you see, and that is their prayer. Their circulation to the Day of Resurrection is as quick as the circulation of a mill because of the dangers and tremors of the Day of resurrection. This is (meant by) God's word: "On a day when the heaven sways to and fro and the mountains move. Woe on that day unto those who declare false (the Prophet's divine message)."

He continued. When the sun rises, it rises upon its chariot FROM ONE OF THOSE SPRINGS accompanied by 360 angels with outspread wings . They

draw it along the sphere, praising and sanctifying God with prayer, according to the extent of the hours of night and the hours of day, be it night or day. When God wishes to test the sun and the moon, showing His servants a sign and thereby asking them to stop disobeying Him and to start to obey, the sun tumbles from the chariot AND FALLS INTO THE DEEP OF THAT OCEAN, which is the sphere. When God wants to increase the significance of the sign and frighten His servants severely, all of the sun falls, and nothing of it remains upon the chariot.

That is a total eclipse of the sun, when the day darkens and the stars come out . When God wants to make a partial sign, half or a third or two-thirds of it fall into the water, while the rest remains upon the chariot,

this being a partial eclipse. It is a misfortune for the sun or for the moon. It frightens His servants and constitutes a request from the Lord (for them to repent). However this may be, the angels entrusted with the chariot of the sun divide into two groups, one that goes to the sun and pulls it toward the chariot, and another that goes to the chariot and pulls it toward the sun, while at the same time they keep it steady in the sphere, praising and sanctifying God with prayer, according to the extent of the hours of day or the hours of night, be it night or day, summer or winter, autumn or spring between summer and winter, lest the length of night and day be increased in any way. God has given them knowledge of that by inspiration and also the power for it. The gradual emergence of the sun or the moon FROM THE DEEP OF THAT OCEAN covering them which you observe after an eclipse (is accomplished by) all the angels together who, after having brought out all of it, carry it (back) and put it upon the chariot . They praise God that He gave them the power to do that. They grip the handholds of the chariot and draw it in the sphere, praising and sanctifying God with prayer.

Finally, they bring the sun to the west . Having done so; ***THEY PUT IT INTO THE SPRING, and the sun falls from the horizon of the sphere INTO THE SPRING .***

Then the Prophet said, expressing wonder at God’s creation: How wonderful is the divine power with respect to something than which nothing more wonderful has ever been created!... By Him Who holds the soul of Muhammad in His hand! Were those people not so many and so noisy, all the inhabitants of this world would hear the loud crash made by the sun falling when it rises and when it sets ... ***Whenever the sun sets, it is raised from heaven to heaven by the angels’ fast flight, until it is brought to the highest, seventh heaven, and eventually is underneath the Throne. It falls down in prostration, and the angels entrusted with it prostrate themselves together with it. Then it is brought down to heaven. When it reaches this heaven, dawn breaks. When it comes down FROM ONE OF THOSE SPRINGS, morning becomes luminous . And when it reaches this face of heaven, the day becomes luminous.***
(The History of Al-Tabari: General Introduction and From the Creation to the Flood , translated by Franz Rosenthal [State University of New York Press (SUNY), Albany, 1989], volume 1, pp. 232-238; bold and capital emphasis ours)

উপরের এ হাদিসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহনের বিবরন দেওয়া হয়েছে। চাঁদ সূর্যের কক্ষপথে ফেরেশতারা যখন রথ থেকে চাঁদ সূর্যকে আসমানের অতল সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেয় তখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহন হয়। অর্ধাংশ ডুবিয়ে দিলে তখন অর্ধ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহন হয়, তেমনি পূর্নরূপে ডুবিয়ে দিলে তখন পূর্ন চন্দ্র/সূর্য গ্রহন। দিনশেষে সারা আকাশ ঘুরে ফেরেশতারা সূর্যকে ১৮০টি কর্দমাক্ত জলাশয়ের যেকোন একটিতে ফেলে দেয়, অর্থাৎ তখন সূর্যাস্ত হয়। সূর্যাস্তের পর সূর্য একটির পর আরেকটি আসমান অতিক্রম করে সপ্তম আসমানে পৌছে আল্লাহর আরশের নিচে সিজদায় পড়ে। পরবর্তীতে উদয়ের অনুমতি নিয়ে পূর্বদিক দিয়ে উদিত হয়।

যমীনের এক প্রান্তে অস্তগমনের পর সিজদা,অনুমতি প্রার্থনা এবং অপর প্রান্তে পৌছে উদিত হতে সূর্য এত অল্প সময় ব্যয় করে যে, কখনো এমন হয় না যে যমীনের একদিকে সূর্যাস্তের পর অপর দিকে সূর্যোদয়ে বিলম্ব হয় বা অন্ধকার হয়ে থাকে। যে আল্লাহ মিরাজের রাতে নবী(সাঃ)কে সশরীরে সাত আসমান ভ্রমন করিয়ে আনেন কোনরূপ সময় ব্যয় ছাড়াই, তার পক্ষে বিনা

কালক্ষেপনে বা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সূর্যকে যমীনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ।

The Sun: Never Cease nor Disappear

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رَسَولُ الله ﷺ سُئِل:

هَذِه المَغَارِبُ مِن أينَ تَغرُبُ؟ وهَذِهِ المَطَالِعُ مِـــن أيـــنَ تَطلُـــعُ؟

فقَالَ ﷺ: **"هي علي رَسلِهَا لا تَبرَحُ وَلَا تَزُول، تَغرُبُ عَن قَومٍ وَتَطلُعُ عَلى قَومٍ، وتَغرُبُ عَن قَومٍ وَتَطلُـــع، فَقَـــومٌ يَقُولُـــونَ غَربَت، وَقَومٌ يَقُولُونَ طَلَعَت".**

Ibn `Abbâs ﷺ narrated that the Prophet ﷺ was asked,

"Where does the sun set, and where does it rise from? The Messenger of Allâh ﷺ answered, ***"It is going in a (nonstop) regular motion; it does not cease or disappear[1]. It sets in one place and rises in another, and sets in another place and rises elsewhere and so on. So, some people would say the sun has set and others would say it has just risen (at the same moment)."[2]***

[1] The Prophet ﷺ means that it does not disappear anywhere as they thought that it sets in a certain location, and rises again from that place.

[2] Reported by Imâm Abî Is-hâq al-Hamadhânî in *"Musnad Imâm Abî Is-haq al-Hamadhânî"*.

একটা প্রশ্ন আসে, সূর্যের কক্ষপথ প্রথম অথবা চতুর্থ আসমানে হলে কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্তগমনের পর যমীনের নিচে দিয়ে আরশের নিচে সিজদা দিতে কিভাবে যায়? আরশ তো সপ্তম আসমানের উপরে...।

এর উত্তর বেশ কিছু হাদিসে আলাদাভাবে দেওয়া আছে।

সাত আসমান ও যমীন কুরসির ভেতর। কুরসির উপর আরশ। আরশ সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছে। তাই যমীনের নিচে গেলেও সূর্য আরশের নিচেই আছে।হয়ত, আসমানের প্রান্তভাগ যমীনের নিচে এমনভাবে আছে যে সূর্যাস্তের সাথে সাথে সে একেক আসমানের স্তর ভ্রমন করতে থাকে। সেগুলো হয়ত এরূপ যে পরস্পরের মাঝে দূরত্ব কম।সূর্যাস্তের পর এরূপ সাত আসমান ভ্রমন করে আরশের নিচে যাবার কথা কিছু হাদীসে এসেছে। বিষয়টা আমরা যেভাবে বর্ননা করব সেরকম নাও হতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি সব কিছুই হাদীসের বর্ননা অনুযায়ীই হয়, তবে সেটা

আমাদের আকলী জ্ঞানের বাইরে। মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কোন কিছু না বুঝে আসার মানে এই নয় যে ওটা ঐরূপ নয়। কুরআন সুন্নাহর ব্যাপারে আমাদের উচিৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে "শুনলাম এবং মানলাম"। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

মানচিত্রের বাইরের দেশ-মহাদেশঃ আল ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ-

অস্তাচলের নিকটে অবস্থানকারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ইবনে কাসির(রহ.) অসাধারণ কিছু আনেন যার অস্তিত্ব প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর ম্যাপ ও মডেলে অনুপস্থিত।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ وَجَدَ عِنْدَ هَا قَوْمًا ۬ؕ

অর্থাৎ যুলকারনাইন তথায় একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পান। সেখানে একটি বড় শহর ছিল যার ছিল বারো হাজার দরজা। সেখানে কোন গোলমাল ও শোরগোল না হলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তথাকার লোকদের সূর্য অস্ত যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়াও মোটেই বিস্ময়কর নয়। সেখানে যুলকারনাইন একটি বড় সম্প্রদায়কে বসবাস করতে দেখতে পান। আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপরও তাঁকে বিজয় দান করেন। এখন এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ছিল যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। তিনি আদল ও ঈমানের উপরই থাকলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ "যারা এখনও কুফরী ও শিরকের উপরই রয়ে যাবে তাদেরকে আমি শাস্তি দেবো, হত্যা ও ধ্বংস দ্বারা অথবা তামার পাত্রকে কঠিনভাবে গরম করে তাদেরকে ওর উপর নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা গলে যাবে। কিংবা সেনাবাহিনীর হাতে তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি প্রদান করা হবে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। অতঃপর যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। এর দ্বারা কিয়ামতের দিনও প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকার্যাবলী সম্পাদন করবে তাদের জন্যে প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলবো।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে শুধু অস্তাচলের বিবরণ নয়,উদয়াচলের বর্ননাও দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন।
অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

(১৮:৮৯-৯১)

প্রকৃত ঘটনা যে এমনই সেটা আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু আফসোসের বিষয়, আজকের মোডারেট ও মর্ডানিস্ট মুসলিমরা তা বিশ্বাস করে না। আজ এরা কাফিরদের মনগড়া ও যাদুশাস্ত্রের মিথ্যা বুলিসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আজ ওরা বিশ্বাস করে না জমিন সমতল এবং আসমান জমিনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ, যাদেরকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহর তাফসিরে কিছু অদ্ভুত মনুষ্যজাতির বর্ননা এসেছে যারা সূর্যের উদয়াচলে বাস করে।
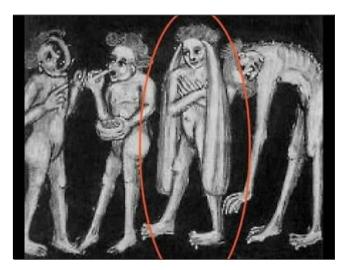
এদের শারীরিক গড়নের অস্বাভাবিকতার বর্ননা শুনে অনেকের কাছেই কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হবে। এসব আল্লাহরই বৈচিত্রময় সৃষ্টি।

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির উল্লেখ করেনঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন যে, যুলকারনাইন পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করেন। পথে যে সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ হতো, তাদেরকে তিনি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন। তারা স্বীকার করলে তো ভালই, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। আল্লাহর ফজলে তাদের উপর বিজয় লাভ করে তিনি তাদেরকে নিজের অধীনস্থ করতঃ তথাকার ধন-সম্পদ, গৃহ পালিত পশু, খাদেম প্রভৃতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেন। বাণী ইসরাঈলের খবরে রয়েছে যে, তিনি একহাজার ছয় শ' বছর জীবিত ছিলেন এবং বরাবরই ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর দ্বীনের তবলীগের কাজ চালিয়ে যান। সাথে সাথে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তনও বিস্তৃত হয়। সূর্য উদিত হওয়ার স্থানে যখন তিনি পৌঁছেন তখন সেখানে দেখতে পান যে, একটি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু তথাকার লোকেরা প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর মত ছিল। না তারা ঘরবাড়ী তৈরী করে, না তথায় কোন গাছপালা রয়েছে, না রৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন কিছু সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের দেহের রঙ ছিল লাল এবং তারা বেঁটে আকৃতির লোক ছিল। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল মাছ। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে নেমে যেতো এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো। এটা হযরত হাসানের (রাঃ) উক্তি। হযরত কাতাদার (রঃ) উক্তি এই যে, সেখানে কিছুই উৎপন্ন হতো না। সূর্য উদিত হওয়ার সময় তারা পানিতে চলে যেতো এবং সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর তারা তাদের দূরবর্তী ক্ষেত খামারের দিকে ছড়িয়ে পড়তো। সালমার (রঃ) উক্তি এই যে, তাদের কান ছিল বড় বড়। একটা কান দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করতো আর একটি বিছিয়ে দিতো। কাতাদা (রঃ) বলেন, তারা ছিল অসভ্য ও বর্বর। ইমাম ইবনু জারীর (রঃ) বলেন যে, সেখানে কখনো কোন ঘরবাড়ী এবং প্রাচীর নির্মিত হয় নাই। সূর্যোদয়ের সময় ঐ লোকগুলি পানিতে নেমে যেতো। সেখানে কোন পাহাড় পর্বতও নেই। অতীতে কোন এক সময় তাদের কাছে এক সেনাবাহিনী আগমন করে। তারা তথাকার লোকদেরকে বলেঃ "দেখো, তোমরা সূর্যোদয়ের সময় বাইরে চলে যেয়ো না।" তারা বললোঃ "না, এটা হতে পারে না, আমরা বরং রাতে রাতেই এখান থেকে

চলে যাবো।" তখন ঐ সেনাবাহিনী তাদেরকে বললোঃ "আচ্ছা বলতো, এই চক্চকে হাড়গুলির ঢেরীটা কিরূপ?" উত্তরে তারা বললোঃ "পূর্বে এখানে এক সেনাবাহিনী এসেছিল। সূর্যোদয়ের সময় তারা এখানেই অবস্থান করেছিল। ফলে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিল। এগুলি তাদেরই অস্থি।" একথা শোনা মাত্রই এই সেনাবাহিনী সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'প্রকৃত ঘটনা এটাই, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।' তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের কোন কাজ, কোন কথা এবং কোন চালচলন আল্লাহ তাআ'লার অজানা ছিল না। যদিও তাঁর সৈন্য সংখ্যা অনেক ছিল এবং যমীনের প্রতিটি অংশে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন,

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাঈনে এসেছেঃ

where it rises, he found it rising on a folk, namely, Negroes (zanj), for whom We had not provided against it, that is, [against] the sun, any [form of] cover, in the way of clothing or roofing, as their land could not support any structures; they had underground tunnels into which they would disappear at the rising of the sun and out of which they would emerge when it was at its highest point [in the sky until, when he reached the rising of the sun, the place]

(তাফসীর জালালাঈন-১৮:৯০)

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا
قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

আবার তিনি এক পথ ধরলেন।
অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।
তারা বললঃ হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্যে কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন।

[কাহাফ:৯২-৯৪]

ইয়াজুজ মাজুজদের ভূখন্ড আজও একটি অমিমাংসিত রহস্য। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ কুরআন হাদীসের দলিল বাদ দিয়ে আকলি জ্ঞান ব্যবহার করে অদেখা জগতের ব্যপারে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে,এজন্য এটাকে ঘিরে আরো বেশি কল্পনা এবং বিচিত্র মনগড়া তত্ত্ব গড়ে উঠছে। নিম্নোল্লিখিত সুদীর্ঘ হাদিসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ননার পাশাপাশি, ঐ অঞ্চলে বসবাসকারীদের কথা উল্লেখ

এসেছে। উদয়াচলে বসবাসকারীরা হচ্ছে আদ জাতির অবশিষ্ট বেঁচে যাওয়া কওম,তাদের শহরের নাম ,জাবালাক। অস্তাচলের বাসিন্দারা হচ্ছে সামূদ জাতির মধ্যে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট কওম যারা সালিহ(আঃ) এর উপর ঈমান এনেছিল।তাদের শহরের নাম ,জাবারস।

উভয় শহরের প্রবেশের জন্য দশ হাজার দরজা আছে,প্রত্যেক দরজায় ১০০০০ অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যরা পাহাড়ারত আছে। এই শহরগুলোর পিছনে তাফিল,মানসাক ও তারিস নামের আরো তিন জাতি বসবাস করে। তাদের পূর্বে বসবাসকারী জাতি হচ্ছে ইয়াজুজ-মাজুজ। মিরাজের রাতে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কে জীব্রাঈল(আঃ) উদয়াচল-অস্তাচলের শহর এবং ইয়াজুজ মাজুজসহ আরও তিন জাতির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আদ ও সামূদ জাতির অবশিষ্ট ওই কওম তাওহীদের আহব্বানে সাড়া দিয়েছিল।কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ এবং আরো তিন জাতি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে।

হাদিসটি নিম্নরূপ:

Abu Dharr said: I was sitting behind the Apostle of Allah who was riding a donkey while the sun was setting. He asked: Do you know where this sets? I replied: Allah and his Apostle know best. He said: It sets in a spring of warm water.

Then he said: For the sun and the moon, He created easts and wests (positions to rise and set) on the two sides of the earth and the two rims of heaven, 180 springs in the west of black clay – this is (meant by) God's word: "He found it setting in a muddy spring," meaning by "muddy (hami'ah)" black clay – and 180 springs in the east likewise of black clay, bubbling and boiling like a pot when it boiled furiously. He continued. Every day and night, the sun has a new place where it rises and a new place where it sets. The interval between them from beginning to end is longest for the day in summer and shortest in winter. This is (meant by) God's word: "The Lord of the two easts and the Lord of the two wests," meaning the last (position) of the sun here and the last there. He omitted the positions in the east and the west (for the rising and setting of the sun) in between them. Then He referred to east and west in the plural, saying; "(By) the Lord of the easts and wests." He mentioned the number of all those springs (as above).

He continued. God created an ocean three farsakhs (18 kilometers) removed from heaven. Waves contained, it stands in the air by the command of God. No drop of it is spilled. All the oceans are motionless, but that ocean flows at the rate of the speed of an arrow. It is set free to move in the air evenly, as if it were a rope stretched out in the area between east and west. The sun, the moon, and the retrograde stars run in its deep swell. This is (meant by) God's word: "Each swims in a sphere." "The sphere" is the circulation of the chariot in the deep swell of that ocean. By Him Who holds the soul of Muhammad in His hand! If the sun were to emerge from that ocean, it would burn everything on earth, including even rocks and stones, and if the moon were to emerge from it, it would afflict (by its heat) the inhabitants of the earth to such an extent that they would worship gods other than God. The exception would be those of God's friends whom He would want to keep free from sin. [...]

He continued. When the sun rises, it rises upon its chariot from one of those springs accompanied by 360 angels with outspread wings. They draw it along the sphere, praising and sanctifying God with prayer, according to the extent of the hours of night and the hours of day, be it night or day. [...] Finally, they bring the sun to the west. Having done so; they put it into the spring there, and the sun falls from the horizon of the sphere into the spring.

Then the Prophet said, expressing wonder at God's creation: How wonderful is the divine power with respect to something than which nothing more wonderful has ever been created! This is (meant by) what Gabriel said to Sarah: "Do you wonder about God's command?" It is as follows: ***God created two cities, one in the east, and the other in the west. The inhabitants of the (68]***
city in the east belong to the remnants of the 'Ad and are descendants of those 'Ad who werebelievers, while the inhabitants ofthe city in the west

belong to the remnants of the Thamud and are descendants of those who believed in Salih 456 The name of the city in the east is Margisiya in Syriac and jabalq in Arabic, and the name of the city in the west is Barjisiya in Syriac and jabars

in Arabic.457 Each city has ten thousand gates, each a farsakh (6 kilometers) distant from the other. Ten thousand guards equipped with weapons alternate each day as guards for each of these gates; after that (one day, those guards) will have no (more) guard duty until the day the Trumpet will be blown 458 By Him Who holds the soul of Muhammad in His hand! Were those people not so many and so noisy, all the inhabitants of this world would hear the loud crash made by the sun falling when it rises and when it sets. Behind them are three nations, Mansak, Tafil, and Taris, and before them are Yajuj and Majuj.459 Gabriel took me to them during my night journey from the Sacred Mosque to the Farthest Mosque.'I called on Yajuj and Majuj to worship God, but they refused to listen to me. Gabriel then took me to the inhabitants of the two cities. I called on them to follow the religion of God and to worship Him. They agreed and repented. They are our brothers in the (true) religion. Those of them who do good are together with those of you who do good, and those of them who do evil are together with those of you who do evil. Gabriel then took me to the three nations. I called on them to follow the religion of God and to worship Him. They disapproved of my doing so. They did not believe in God and considered His messengers liars. They are in the Fire together with Yajuj and Majuj and all those who were disobedient to God. *Whenever the sun sets, it is raised from heaven to heaven by the angels' fast flight, until it is brought to the highest, seventh heaven, and eventually is underneath the Throne. It falls down in prostration, and the angels entrusted with it prostrate themselves together with it. Then it is brought down from heaven to heaven. When it reaches this heaven, dawn breaks. When it comes down from one of those springs,*

morning becomes luminous. And when it reaches this face of heaven, the day becomes luminous.

[History of Imam Tabari]

ড্রোন আর কাল্পনিক স্যাটেলাইটের এই যুগে পৃথিবীকে বলা হয় হাতের মুঠোয়,ইন্টারনেটের ম্যাপে মুহুর্তের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তের ম্যাপ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও ইয়াজুজ মাজুজ জাতির খোঁজ নেই। খুঁজে পাওয়া যায় না সেই লোহার প্রাচীর, যেটা যুলকারনাঈন নির্মান করেছিলেন। তাই কখনো রাশিয়া, কখনো উজবেকিস্তান, কখনো চীন,মোঙ্গলিয়া,তুরস্কে খুঁজে বেড়ানো....কখনো ইহুদী,কখনো তুর্কী কখনো মোঙ্গলদের ইয়াজুজ মাজুজ বানিয়ে দেওয়া! শেষমেশ এটাকে মিথলজির আওতায় ফেলা হয়েছে। কেউ কেউ এও ধারনা করে হয়ত এই জাতি গুহায় লুকিয়ে আছে,যারজন্য তাদের কাল্পনিক স্যাটেলাইট এবং ড্রোন খুজে পায় না। অথচ ইয়াজুজ মাজুজদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গোটা মানবজাতিকে দশভাগ করা হলে ইয়াজুজ মাজুজরাই নয়ভাগ! তাছাড়া এরা প্রত্যেকে হাজার সন্তান রেখে মারা যায়। কাতাদা (রঃ) বলেন, তারা পৃথিবীর ২৪০০০০ ফারসাখ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করে যা কিনা তার সময়ের হিসাবে সাধারন মানবজাতির চেয়ে অনেক বেশি(প্রায় ১০গুন) আয়তনের এলাকা। ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন যমীনকে যদি ৬ ভাগে ভাগ করা হয় তবে ৫ ভাগই ইয়াজুজ মাজুজদের দখলে!

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- "দশ ভাগে আল্লাহ পাক সৃষ্টিকে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। বাকী একটি ভাগে অবশিষ্ট সকল সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগ দিন-রাত বিরামহীন আল্লাহর আদেশ মতে কাজ করে চলেছে। একটি ভাগ আল্লাহ পাক নবী রাসূলদের কাছে প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অতঃপর সাধারণ সৃষ্টিকে আবার দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে নয়টি ভাগে জিন তৈরি করেছেন, একভাগে আদম সন্তান। অতঃপর আদম সন্তানকে আল্লাহ দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে সৃষ্টি করেছেন ইয়াজূজ-মাজূজ, আর অবশিষ্ট একভাবে সকল মানুষ।"

(মুস্তাদরাকে হাকিম)

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন- আমি ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কে নবীজীকে জিজ্ঞেস করলে নবীজী বললেন- ইয়াজূজ এক জাতি আর মাজূজ আরেক জাতি। এদের প্রত্যেক জাতির ভেতরে-

ও আবার চার লক্ষ জাতি বিদ্যমান। এদের একজন মারা যাওয়ার পূর্বে একহাজার সশস্ত্র ঔরস সন্তান রেখে যায়। বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! এরা দেখতে কেমন? বললেন- তিন ধরনের মানুষ তাদের মধ্যে আছে। কিছু আছে আরুয বৃক্ষের মত লম্বা। (আরুয শামের প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষটি একশ বিশ গজ লম্বা হয়) এদের বিরুদ্ধে কোন লৌহ/কৌশল কাজে আসে না। অপর দল, যারা এক কান মাটিয়ে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। হাতি, ঘোড়া, গাঁধা, উট, শুকর- যা-ই সামনে পায় খেয়ে ফেলে। এমনকি নিজেদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকেও খেয়ে ফেলে। তাদের সম্মুখদল শামে এবং পশ্চাতদল খোরাছানে থাকবে। টাইবেরিয়ান লেক সহ প্রাচ্যের সকল নদী তারা নিমিষেই চুষে ফেলবে।-”

(তাবারানী)

খালেদ বিন আব্দুল্লাহ্ আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা নবী করীম (সা:) বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যান্ডেজ বাধাবস্থায় ছিলেন। বললেন- তোমরা তো মনে কর যে, তোমাদের কোন শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়; বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে ইয়াজূজ-মাজূজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপরিসর বর্ম...

[মুসনাদে আহমদ, তাবারানী]

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন- ইয়াজূজ-মাজূজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে-তাউল, তারিছ এবং মাস্ক...

[তাবারানী]

ইয়াজুজ মাজুজদের নিয়ে আলোচিত সুপরিচিত হাদিস উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি। ইয়াজুজ মাজুজরা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের মধ্যকার জাতিভেদে বিভিন্ন আকারের ও বর্নের। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ বা মহাদেশের কোন কিছুই আজকের আধুনিক যুগে এসে আমরা খুঁজে পাইনা। মানচিত্রে তাদের অবস্থান না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, যেখানে সূর্যের উদয়াচল-অস্তাচলের স্থানগুলোকেই আড়ালে রাখা হয়েছে। ওরা তো সত্যকে বদলে

দিয়ে একদমই বিকল্প হেলিওসেন্ট্রিক স্পেস বেজড সৃষ্টিতত্ত্ব রচনা করেছে! যেখানে আদ ও সামূদের কওমের ধ্বংসাবশেষ অধ্যুষিত শহরগুলোই মানচিত্রের বাহিরে রাখা হয়েছে সেখানে তাদের আশপাশে বসবাসকারী ইয়াজুজ মাজুজ ও আরও তিন জাতির অস্তিত্ব মানচিত্রে আশাই করা যায় না। অনেকের কাছে মানচিত্র থেকে মহাদেশ বাদ ফেলাটা খুব অসম্ভব মনে হয়, অথচ খুব সহজেই এটা করা যায়। মাত্র তিনটি মহাদেশ দিয়েও গোলাকার পৃথিবীর মডেলটিকে মুড়ে দেওয়া সম্ভব। দেখুনঃ https://www.youtube.com/watch?v=Mys2-94ySUI

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব
[নক্ষত্রমালা ও ছায়াপথ]

পর্ব-৯

নক্ষত্রমালা:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন একদম ছয়দিনের শেষ প্রহরে শুক্রবারে।অথচ প্রচলিত বিজ্ঞান আমাদের শেখায় তারকা, গ্রহ(কথিত) সবকিছু এলোমেলোভাবে সৃষ্টি হয় বিগব্যাং এর দ্বারা। ওরা এক স্থানে বলে প্রথম তারকাটির জন্ম ১০০মিলিয়ন বছর পূর্বে। ওরা সূর্যকেও ওদের বিলিয়ন মিলিয়ন তারকার একটি হিসেবে বিবেচনা করে। এই তারকা সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবী তথা কথিত গ্রহ সৃষ্টিরও অনেক আগে। তাদের ভাষায় এটা হচ্ছে কস্মোলজিক্যাল এভ্যুল্যুশন[১]।

কাফিরদের একটা বাংলা ওয়েবে তারকা এবং গ্রহ সৃষ্টির মেইনষ্ট্রিম সায়েন্স স্বীকৃত প্রক্রিয়া লিখেছেঃ

''গ্রহ বা গ্রহানু সৃষ্টিতত্ত্ব জানার আগে সূর্য কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা জেনে রাখা ভালো। আমাদের

সূর্য সৃষ্টি হয় সৌর নেবুলা থেকে। আর সৌর নেবুলা সৃষ্টি হয় সুপারনোভা বিস্ফোরণ মাধ্যমে।

সূর্যের চেয়ে তিন গুণ বেশি ভরের নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনের সংযোজন বিক্রিয়ায় তৈরি হয় হিলিয়াম, হিলিয়ামের সংযোজনে তৈরি হয় কার্বন এবং সেই কার্বনের সংযোজনে তৈরি হয় লোহ। লোহা তৈরির মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীণ বিক্রিয়াসমূহের পরম্পরার পরিসমাপ্তি ঘটে, কারণ এর পরের বিক্রিয়াটি তাপশোষী। এমনই এক সময়ে নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ বহির্মুখী চাপ যথেষ্ট পরিমাণ কমে যাওয়ায় এটি আর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, ফলে নক্ষত্রে ঘটে এক প্রচণ্ড অন্তস্ফোটন (Implosion)। নক্ষত্রটির বেশিরভাগ ভরই এর কেন্দ্রে সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর গ্যাসীয় বাতাবরণটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবলবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাই সুপারনোভা বিস্ফোরণ হিসেবে পরিচিত। এই ধরনের বিস্ফোরণে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় এবং সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রটি সাময়িকভাবে পুরো ছায়াপথের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কেন্দ্র ছাড়া অবশিষ্ট অংশটুকু বা আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলাকণার মেঘ অর্থাৎ যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তা নেবুলায় পরিণত হয়।

একইভাবে সৌর নেবুলা সৃষ্টি হয়েছিল। যা প্রায় ১ আলোকবর্ষ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এরপর এই বিশাল আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলাকণার মেঘের ঘূর্ণনবেগ বাড়ার সাথে সাথে এটি সংকুচিত হতে শুরু করলো। ফলে আস্তে আস্তে মেঘের আকৃতি ছোট হতে থাকে । এটি চ্যাপ্টা আকৃতির সাথে সাথে প্রায় ১০০ জ্যোতির্বিদ্যার একক (১ জ্যোতির্বিদ্যার একক= ১৪৯৬০০০০০ কি.মি) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে যায়।

নীহারিকার মেঘের কেন্দ্র আশেপাশের অন্য অংশ হতে বেশি ঘনত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত সংকুচিত হতে থাকে। সেখানেই তৈরি হয়ে থাকে আমাদের প্রোটোসূর্য। ধীরে ধীরে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এটি হতে দৃশ্যমান আলো নির্গত হতে থাকে । এরপরে তাপমাত্রা আরও অনেক বাড়ার পর নিউক্লিয় বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সৃষ্টি হয়ে যায় আমাদের সূর্য । আমাদের সূর্য মেঘটির কেন্দ্রের স্থান দখল করে ছিল। এরপর আশেপাশের সকল বস্তু চাকতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে। আশেপাশের সকল বস্তু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করে। তখন অনুবীক্ষণিক ধূলিকণার বস্তুগুলো একে অপরকে আরও বেশি আকর্ষণ করতে শুরু করে। স্বল্প ভররের বস্তু হতে অধিক ভরের বস্তুর সৃষ্টি হতে থাকে। আস্তে আস্তে বস্তুগুলো বড় হতে হতে একসময় গ্রহাণুতে রূপান্তর হয়ে পড়ে। এর থেকেও বড়গুলো গ্রহে পরিণত হয়। আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলো ঠিক এভাবেই সৃষ্টি হয়।'[২]

সুতরাং শয়তানের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী সর্বপ্রথম তারকার সৃষ্টি হয় অতঃপর অনেকপরে কথিত গ্রহ-উপগ্রহ। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সর্বপ্রথম পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন,সাতটি পৃথিবী একের উপর আরেকটি সমতল দ্বীপ সদৃশ। এরপর আমাদের উপরে গম্বুজাকৃতির আসমান এবং এভাবে মোট সপ্ত আসমান, অতঃপর শুক্রবার শেষ প্রহরে চাঁদ সূর্য,তারকারাজি সৃষ্টি করেন। তারকারাজিকে দুনিয়ার নিকটতম আকাশে গেঁথে দেন।

I was told by Musa b. Harun-'Amr b. Hammad-Asbat-al-Suddi-Abu Malik and Abu SalihIbn 'Abbas. Also (al-Suddi)-Murrah al-Hamdani-'Abdallah b. Masud and some (other) companions of the Prophet (comment?ing on): "Then[....]Friday. **Friday-yawm al-jum'ah -is thus called because on it, God put together fl-m-) the creation of the heavens and the earth and "revealed in every heaven its command."375 He continued: In every heaven, He created its (special) angels as well as its (special) oceans, the mountains with hail,376 and what (man) does not know.377 He then adorned the lower heaven with the stars and made them an ornament and guard to guard against the Satans.**378 [....]

[ইবনে জারির তাবারির ইতিহাস]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা

[৪১:১২]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করে দেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলো যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে এবং ঐ শয়তানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা ঊর্ধ জগতের কিছু শুনবার উদ্দেশ্যে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং ওগুলো সব দিক হতে ঐ শয়তানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা রবিবার ও সোমবারে যমীন সৃষ্টি করেন। পাহাড় পর্বত এবং সমুদয় উপকারী বস্তুকে সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে। বুধবারে গাছ-পালা, পানি, শহর এবং আবাদী ও অনাবাদি অর্থাৎ জনপদ ও মরু প্রান্তর সৃষ্টি করেন। সুতরাং এটা হলো চার দিন।" এটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবারে তিন ঘন্টা বাকী থাকা পর্যন্ত নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র এবং ফেরেশতামণ্ডলী সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় ঘন্টায় প্রত্যেকটি জিনিসের উপর বিপদ আপতিত করেন যার থেকে লোক উপকার লাভ করে থাকে। তৃতীয় ঘন্টায় তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, তাঁকে বেহেশতে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইবলীসকে হুকুম করেন হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার এবং পরিশেষে তাকে সেখান হতে বের করে দেন।" ইয়াহূদীরা বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এরপর কি হলো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।" তারা বললোঃ "আপনি সবই ঠিক বলেছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেননি। তা হলো এই যে, অতঃপর তিনি আরাম গ্রহণ করেন।" তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ -
فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"(৫০ ঃ ৩৮-৩৯)[১]

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, শরীআতের দলিল অপবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একেবারেই বিপরীতের। শুধু তাই না, এই বিজ্ঞান সূর্যকে নক্ষত্র মনে করে। অন্যদিকে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী নক্ষত্র ও সূর্য সম্পূর্ন ভিন্ন সৃষ্টি। আল্লাহ তারকারাজিকে সম্পূর্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন তিনটি উদ্দেশ্যেঃ

১.আসমানের সৌন্দর্যের জন্য।

২.আসমানের তারকা দেখে যমীনের উপর পথ চেনার নির্দেশক হিসেবে এবং

৩.বিতাড়িত শয়তানের থেকে আকাশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপনাস্ত্ররূপে।

এর বাহিরে তারকারাজির অন্য কোন কাজ নেই। বর্তমান বিজ্ঞান নক্ষত্রের ব্যপারে যা বলে, তা সুস্পষ্ট মিথ্যা ছাড়া আর কিছু না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নির্দেশনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি

[আনআমঃ৯৭]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তিনি তোমাদের জন্যে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন–যেন তোমরা ওগুলোর সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই তারকাগুলো এক তো হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়তঃ এগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে প্রহার করা হয় এবং তৃতীয়তঃ এগুলোর মাধ্যমে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চেনা যায়। পূর্ববর্তী গুরুজনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তারকারাজি সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি কেউ মনে করেন যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া আরো উদ্দেশ্য রয়েছে তবে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং কুরআনের আয়াতের উপর বাড়াবাড়ি করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে লোকেরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্য ও ন্যায়কে চিনে নিয়ে অসত্য ও অন্যায়কে পরিহার করে।

অন্যত্র বলেনঃ

وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

এবং তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারা ও মানুষ পথের নির্দেশ পায়[নাহলঃ১৬]

আল্লাহ বলেনঃ

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ

শপথ নক্ষত্র শোভিত আকাশের[বুরুজঃ১]

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি।

وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে

[আস ছফফাতঃ৬-১০]

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা তিনি সুশোভিত করেছেন। بِزِيْنَةٍ ও إِضَافَتْ উভয়ভাবেই পড়া হয়েছে। উভয় অবস্থাতেই একই অর্থ হবে। আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ যমীনকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

অর্থাৎ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" (৬৭ ঃ ৫) আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ - وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ - إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ -

অর্থাৎ "আমি আকাশে রাশিচক্র বানিয়েছি এবং ওকে দর্শকদের চোখে সৌন্দর্যময় জিনিস করেছি। প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে ওকে রক্ষিত রেখেছি। যে কেউ কোন কথা চুরি করে শুনবার চেষ্টা করে তার পশ্চাদ্ধাবন করে এক তীক্ষ্ণ অগ্নিশিখা।" (১৫ ঃ ১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আসমানকে হিফাযত করেছি প্রত্যেক দুষ্ট ও উদ্ধত শয়তান হতে। ফলে তারা উর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। চুরি করে শুনবার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর জন্যে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তারা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না। আল্লাহ্র শরীয়ত ও তকদীর বিষয়ের কোন আলাপ-আলোচনা তারা শুনতেই পারে না। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো আমরা ... حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ (৩৪ ঃ ২৩) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে দিয়েছি।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ যেই দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় সেই দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নি নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্যে এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাদের জন্যে পরকালের স্থায়ী শাস্তি তো বাকী রয়েছেই যা হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ -

অর্থাৎ "আমি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।"(৬৭ ঃ ৫)

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ হ্যাঁ, তবে যদি কোন জ্বিন ফেরেশ্তাদের কোন কথা শুনে তার নীচের কাউকেও বলে দেয় তবে দ্বিতীয়জন তার নীচের অপরজনকে তা বলার পূর্বেই জ্বলন্ত অগ্নি তার পিছনে ধাবিত হয়। আর কখনো

কখনো তারা সে কথা অপরের কানে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং এ কথাই যাদুকররা বর্ণনা করে থাকে।

ثَاقِبٌ শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেয্ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে শয়তানরা আকাশে গিয়ে বসতো এবং অহী শুনতো। ঐ সময় তাদের উপর তারকা নিক্ষিপ্ত হতো না। সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা বেশী করে বানিয়ে নিয়ে যাদুকরদেরকে বলে দিতো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবুওয়াত লাভ করলেন তখন তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা সেখানে

গিয়ে কান পাতলে তাদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হতো। যখন তারা এই নতুন ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে জানালো তখন সে বললোঃ "নতুন বিশেষ কোন জরুরী ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।" সুতরাং সংবাদ জানার জন্যে সে তার দলবলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলো। ঐ দলটি হিজাযের দিকে গেল। তারা দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নাখলার দু'টি পাহাড়ের মাঝে নামাযে রত আছেন। তারা এ খবর ইবলীস শয়তানকে জানালে সে বললোঃ "এই কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।" এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ নিম্নের আয়াতগুলোর তাফসীরে আসবে যেগুলোতে জ্বিনদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। আয়াতগুলো হলোঃ

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا-وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا-وَاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا-

অর্থাৎ "এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে; কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্যে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না যে, জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।"(৭২ ঃ ৮-১০)

আল্লাহ সূরা ফুরকানে বলেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র

[২৫:৬১]

সূরাঃ ফুরকান ২৫ ২৭৭ পারাঃ ১৯

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপক ক্ষমতা এবং উচ্চ মর্যাদার কথা বলছেন যে, তিনি আকাশে রাশিচক্র বানিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বড় বড় তারকাও হতে পারে, আবার পাহারা দেয়ার বুরূজও হতে পারে। প্রথম উক্তিটিই বেশী প্রকাশমান। বড় বড় তারকা দ্বারাও এই বুরূজই উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

অর্থাৎ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সূরা হিজরে ইরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি।

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ

আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।

কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড

[১৫:১৬-১৮]

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, এই উঁচু আকাশকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত রয়েছে। যে কেউই এটাকে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখবে সেই মহা শক্তিশালী আল্লাহর বহু বিস্ময়কর কাজ এবং শিক্ষণীয় বহু নির্দশন দেখতে পাবে। 'বুরূজ' দ্বারা এখানে নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

٦ ٩

অর্থাৎ "কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতিময় চন্দ্র।" (২৫ঃ ৬৯) আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা সূর্য ও চন্দ্রের মন্‌যিলকে বুঝানো হয়েছে। আতিয়্যা' (রঃ) বলেন, বুরূজ হচ্ছে ঐ স্থানসমূহ যেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শয়তানদেরকে প্রহার করা হয়, যাতে তারা ঊর্ধ্ব জগতের কোন কথা শুনতে না পারে। যে সামনে বেড়ে যায় তার দিকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড বেগে ধাবিত হয়। কখনো তো নিম্নবর্তীর কানে ঐ কথা পৌঁছিয়ে দেয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোন কোন সময় এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তাআ'লা আকাশে কোন বিষয় সম্পর্কে ফায়সালা করেন তখন ফেরেশতামণ্ডলী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজেদের ডানা ঝুঁকাতে থাকেন, যেন তা পাথরের উপর যিঞ্জীর। অতঃপর যখন তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায় তখন তারা (পরস্পর) বলাবলি করেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন?" উত্তরে বলা হয়ঃ "তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ও মহান।" ফেরেশ্‌তাদের কথাগুলি গুপ্তভাবে শুনবার উদ্দেশ্যে জ্বিনরা উপরে উঠে যায় এবং এইভাবে তারা একের উপর এক থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত সাফওয়ান (রাঃ) তাঁর হাতের ইশারায় এইভাবে বলেন যে, ডান হাতের অঙ্গুলীগুলি প্রশস্ত করে একটিকে অপরটির উপর রেখে দেন। ঐ শ্রবণকারী জ্বিনটির কাজতো কখনো কখনো ঐ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড খতম করে দেয় তার নীচের সঙ্গীর কানে সেই কথা পৌঁছানোর পূর্বেই। তৎক্ষণাৎ সে জ্বলে-পুড়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সে তার পরবর্তীকে এবং তার পরবর্তী তার পরবর্তীকে ক্রমান্বয়ে পৌঁছে থাকে এবং এইভাবে ঐ কথা যমীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর তা গণক ও যাদুকরদের কানে এসে পড়ে। তারপর তারা এর সাথে শতটা মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে। যখন তাদের কারো দু'একটি কথা যা ঘটনাক্রমে আকাশ থেকে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, সঠিকরূপে প্রকাশিত হয় তখন লোকদের মধ্যে তার বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার

আলোচনা হতে থাকে। তারা বলাবলি করেঃ "দেখো, অমুক লোক অমুক দিন এই কথা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ্' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

মাত্র তিনটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ নক্ষত্রদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজকের কল্পনাভিত্তিক কস্মোলজিক্যাল মিস্টিসিজমে নক্ষত্রের এসকল কাজ নেই। তাদের কাছে তারকাদের ভূমিকা আরো অনেক কিছু। এরা কখনো স্বীকৃতি দেয় না যে, নক্ষত্র শয়তানের বিরুদ্ধে উল্কা নিক্ষেপক হিসেবে কাজ করে, এরা তো উল্কা বলতে নক্ষত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কিছুকেই বোঝায় না। দ্বিতীয়ত, হেলিওসেন্ট্রিক এভার এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সে যেখানে সকল তারকা এদিক ওদিক ধাবমান, সেখানে তারকা দেখে পথ চেনার কথা কল্পনাও করা যায় না। কারন, এই কস্মোলজি অনুযায়ী প্রতিনিয়ত তারকারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করছে। এক শতাব্দী পর এক তারকা সম্পূর্ন হারিয়ে যাবে আবার নতুন কোন অজানা অচেনা তারকার উদয় ঘটবে। অথচ বাস্তবতা ঠিক তাই,যা রহমান আল্লাহ বলেছেন। মানব সভ্যতার আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত তারকাদের অবস্থান/কক্ষপথ অপরিবর্তিত আছে। চলমান তারকারা সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একই দূরত্ব ও অবস্থানে থেকে পৃথিবীকে আবর্তন করছে। এটা প্রমান করে আল্লাহর কথাই সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আল্লাহ কখনোই পরিবর্তনশীল কোন কিছুকে পথের দিশা রূপে সৃষ্টি করতেন না যদি নক্ষত্ররা সত্যিই অবস্থান পরিবর্তন করত(যেমনটা আজকের বিজ্ঞান বলে)। আজকের বিজ্ঞান অনুযায়ী, নক্ষত্ররা হচ্ছে এককেটি সূর্য, এদের প্রত্যেকের চারদিকে পৃথিবীর মত কিন্তু গোলাকার কিছু মাটি/পাথরের দলা ঘুরতে থাকে, তাদের পরিভাষায় সেসব হচ্ছে গ্রহ। সূর্য তথা প্রত্যেক নক্ষত্রের কাজ হচ্ছে, তাদের চারপাশের গ্রহ গুলোয় আলোদান।এরা হচ্ছে এককেটা জগতের সকল শক্তির উৎস! আমাদের উপর চক্রশীল সূর্যও নাকি একটা নক্ষত্র। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চাদঁ সূর্যকে তারকাদের থেকে আলাদা উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন সময়ের হিসাবের জন্য এবং একটি নিদর্শন হিসেবে, এটা আদৌ কোন নক্ষত্র নয়। অন্যদিকে নক্ষত্রদেরকে আল্লাহ ভিন্ন উদ্দেশ্য ও কাজ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন,আমরা উপরে তা আলোচনা করেছি। আল্লাহ যখন ইউসুফ(আঃ) এর স্বপ্নের বর্ননা দিলেন তখন চাঁদ-সূর্যের কথা নক্ষত্রদের থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। নক্ষত্ররা আসমানের সমুদ্রের কক্ষপথে সন্তরনরত চাঁদ সূর্যের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র এবং অল্প আলোযুক্ত প্রদীপমালা। আল্লাহ বলেনঃ**إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ**

যখন ইউসুফ পিতাকে বললঃ পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সুর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি । [ইউসুফঃ৪]

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবীদের স্বপ্ন আল্লাহ তাআ'লার ওয়াহী হয়ে থাকে। তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এখানে এগারোটি নক্ষত্র দ্বারা হযরত ইউসুফের (আঃ) এগারোটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। আর সুর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তাঁর পিতা মাতাকে রাজ-সিংহাসনে বসান এবং তাঁর এগারোটি ভাই তার সামনে সিজদাবনত হয়। ঐ সময় তিনি বলেনঃ "হে পিতঃ! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক ওটা সত্যে পরিণত করেছেন।"

হযরত জা'বির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে বুসতানা' নামক একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি নবীর (সঃ) নিকট এসে বলেনঃ "হে মুহাম্মদ (সঃ)! যে এগারটি নক্ষত্র হযরত ইউসুফকে (আঃ)

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সিজদা করেছিল ওগুলির নাম আমাকে বলে দিন।" বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁর একথা শুনে নবী (সঃ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আকাশ হতে অবতরণ করে তাঁকে তারকা গুলির নাম বলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ লোকটিকে ডেকে বলেনঃ "তারকাগুলির নাম তোমাকে বলে দিলে তুমি ঈমান আনবে তো?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, নিশ্চয়।" নবী (সঃ) বললেনঃ "ওগুলির নাম হচ্ছেঃ (১) জিরইয়ান, (২) ত'রিক, (৩) দিয়াল, (৪) যুল কানফাত, (৫) কা'বিস, (৬) অসাব, (৭) আমূদান, (৮) ফালীক, (৯) মিসবাহ, (১০) যরূহ এবং (১১) ফারাগ।" তখন ইয়াহূদী আ'লেমটি বলে উঠলেনঃ "আল্লাহর শপথ! ঐ নক্ষত্রগুলির এই নামই বটে।[১]

আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন তাঁর স্বপ্নের কথা তাঁর পিতার নিকট বর্ণনা করেন তখন তাঁর পিতা হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁকে বলেনঃ এটা সত্য স্বপ্ন। পরবর্তীকালে আল্লাহ এটা পূর্ণ করে দেখাবেন। তিনি বলেন যে, সুর্য দ্বারা তাঁর পিতা এবং চন্দ্র দ্বারা তাঁর মাতাকে বুঝানো হয়েছে।[২]

আধুনিক অপবিজ্ঞান দৃশ্যমান নক্ষত্রসমূহকে গ্রহ বা প্ল্যানেট বানিয়েছে। এরা গ্রহ বলতে বোঝায় পৃথিবীর মত জগৎ। মঙ্গল,বুধ,শুক্র,শনি,বৃহস্পতি প্রভৃতি নক্ষত্রগুলোকে গ্রহ বানিয়েছে, এমনকি সেখানে যাবার মিথ্যা দাবী আর কল্পনায় জনগনকে ডুবিয়ে রেখেছে। তাদের মতে এরকম আরো বিলিয়ন মিলিয়ন গ্রহ সমগ্র মহাকাশে বিরাজমান। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এসব গ্রহের অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই। ওরা যাদেরকে গ্রহ বলে, তারা মূলত চলমান নক্ষত্র। এ কথা হাদিসেও আছে। আলি(রাঃ) একদিন আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কে প্রশ্ন করেন ঐ সমস্ত তারকাদের ব্যপারে, কুরআনে যাদের শপথ আল্লাহ করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ খুন্নাস বলেছেন। খুন্নাসের ব্যপারে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলেন সেসব হচ্ছে ৫টি 'তারকা'। সেগুলো হলো, বৃহস্পতি, শনি,বুধ,মঙ্গল,শুক্র। আমাদেরকে আজকে বিজ্ঞান এদেরকে 'গ্রহ' বলতে শেখায় অথচ নবী(সাঃ) শিখিয়েছেন তারকা। এই পাচঁটি এমনই তারকা যারা চাঁদ সূর্যের ন্যায় উদিত হয় এবং অস্ত যায়। এরা ছাড়া বাকি তারকারা আসমানে চক্রাকারে ঘুরছে। এদের এই ঘূর্ননই হচ্ছে আল্লাহর প্রার্থনা।

Ibn 'Abbas said that 'Ali b. Abi Talib said to the Messenger of God: You are

like my father and my mother! You have mentioned the course of the retrograde stars (al-khunnas) by which God swears in the Qur'an,449 together with the sun and the moon, and the rest. Now, what are al-khunnas? The Prophet replied: 'Ali, they are five stars: Jupiter (al-birjis), Saturn (zuhal), Mercury ('utarid), Mars (bahram), and Venus (al-zuhrah). These five stars [661
rise and run like the sun and the moon and race with them together. All the other stars are suspended from heaven as lamps are from mosques, and circulate together with heaven praising and sanctifying God with prayer. The Prophet then said: If you wish to have this made clear, look to the circulation of the sphere alternately here and there. It is the circulation of heaven and the circulation of all the stars together with it except those five. Their's'
circulation today is what you see, and that is their prayer. Their circulation to the Day of Resurrection is as quick as the circulation of a mill because of the dangers and tremors of the Day of Resurrection. This is (meant by) God's word: "On a day when the
heaven sways to and fro and the mountains move. Woe on that day unto those who declare false (the Prophet's divine message). 11453

[History of Tabari]

আসমানে সৃষ্ট গতিশীল পানির কক্ষপথে চাঁদ-সূর্যের সাথে বুধ, শুক্র,শনি বৃহস্পতি, মঙ্গল তারকারা সন্তরন করে। সেসব চাঁদ সূর্যের মত ফালাকে আবর্তিত হয়ে অতঃপর অস্তগমন করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই পাঁচ তারকাদের ব্যাপারে বলেনঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়[তাকভীরঃ১৫-১৬]

বড় আশ্চর্যের বিষয়,এ যুগের মুসলিমরা কাফিরদের বিকৃত শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে এই

তারকাদেরকে গ্রহ বলে মেনে নিয়েছে। আজ এরা বিশ্বাস করে এই পাচ তারকায় অবতরন করা যায়। কোন কোনটি তাদের কল্পনানুযায়ী বাসযোগ্য! ভবিষ্যতে সেখানে বসতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখে! কাফিররা যেসব মিথ্যার প্রচার করে সেসবকে কুরআন সুন্নাহর মানদণ্ড দ্বারা যাচাই ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি যেকোন কালের চেয়ে এ যুগে মাত্রা ছাড়িয়েছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যা বলেছেন সেটাই সত্য। জুমসেন্সড ক্যামেরা,টেলিস্কোপ দিয়ে কথিত গ্রহদেরকে তারকাদের মতই মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়। অন্য নক্ষত্রদের সাথে এসকল কাল্পনিক গ্রহদের খুব বেশি পার্থক্য নেই। আপনি বিশ্বাস করেন যে, কোন মানুষ জ্বলন্ত প্রদীপমালার উপর অবতরন করতে পারে,কিংবা বসবাসের চিন্তা করতে পারে! এই অসম্ভব চিন্তা/কল্পনার মধ্যেই কাফিররা আজ মানুষকে ডুবিয়ে রাখছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তারকাদেরকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। কখনো কাওকাব,নজম,বুরুজ,খুন্নাস,তারিক্ক,সাকিব ইত্যাদি। হয়ত আল্লাহ এদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করেছেন। কোন তারকা উজ্জ্বল, কোনটি চক্রশীল ওয়ান্ডারিং স্টার,কোনটা রেট্রোগ্রেডিং স্টার,কোনটা স্থির,কোন কোন তারকা আসমানের প্রহরীস্বরূপ,কোনটা দিনের বেলায় লুকিয়ে যায়, রাতে প্রকাশ করে। অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত বিজ্ঞানপন্থী মুসলিমদের অধিকাংশ এসব বিভিন্ন নামের পার্থক্যের সুযোগ ব্যবহার করে সেগুলোকে প্ল্যানেট বা গ্রহ বলে ব্যাখ্যা করে। অনেক আলিম/দাঈরাও এটা বলতে চায় যে কাওকাব মানে হচ্ছে গ্রহ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে

কাওয়াকিব(কাওকাব) শব্দটি সূরা ইউসূফের ৪ নং আয়াতে ব্যবহার করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যপারে আসা হাদিসে জনৈক ইহুদী আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কে ইউসুফ(আঃ) কে সিজদা করা 'নক্ষত্রদের' নাম জিজ্ঞেসা করেন। ওই হাদিসে আদৌ সেসব নক্ষত্রদের দ্বারা গ্রহ বোঝানো হয়নি(হাদিসটি উপরে সূরা ইউসুফের ৪নং আয়াতের নিচে দেয়া আছে)। বরং স্পষ্টভাবে নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। হিব্রু ও আরবি ভাষায় কাওকাব মানে তারকা বা নক্ষত্র। এর দ্বারা বিশেষ স্থির heavenly bodies-ও বোঝায়। সকল প্রকার তারকা বা নক্ষত্রই নুজুম কিন্তু সকল নুজুমকে কাওকাব/কাওয়াকিব বলা যায় না। সকল তারকাকে নুজুম বলা যায় কিন্তু সকল তারকা তারিক/শিহাব/সাকিব/বুরুজ নয়। সৃষ্টিকর্তা কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নক্ষত্রদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দে বলেছেন, সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। কোন মানুষ সুস্পষ্টভাবে সুনিশ্চিতভাবে আকলী জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কিছুই বলতে পারবে না। কেননা প্রত্যেক নক্ষত্রের আচরণ-বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই জানা আছে। আজকে যারা মর্ডান সুডো সায়েন্সের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে আল্লাহর বলা শব্দ গুলোকে কাফিরদের চিন্তাধারার সাথে মেলায়, তারা অবশ্যই ভুল করছে। একলোক শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদকে(হাফিঃ) নজম ও কাওকাবের ব্যপারে প্রশ্ন করেন। শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিঃ) উত্তরে কাফিরদের কাছে থেকে আসা প্ল্যানেটারি নোশনের সাথে কুরআনের মধ্যস্থতা করলেন। এমনভাবে উত্তর করলেন যাতে সায়েন্টিফিক কমিউনিটিও না কষ্ট পায়, আবার রিলিজিয়াস কমিউনিটিও কষ্ট না পায়। এজন্য একদিকে বললেনঃ

"As for limiting the word “najm” and using it only to refer to huge heavenly bodies that have fixed locations in the sky, are burning and emit light by themselves, such as the sun, and using the word “kawkab” to refer to solid heavenly bodies that are not burning, such as the planets of the solar system, this is modern astronomical terminology. There is nothing wrong with adopting and using this terminology, as there is no problem with the terminology itself, but it is wrong to judge the language of the Holy Quran by the terminology of later eras. Rather what we must do is understand the Holy Quran in accordance with the Arabic language, because that is the language in which the Quran was revealed. Whoever disagrees with that is like one who understands the word sayyaarah in the verse “And there came a caravan of travellers [sayyaarah]; they sent their water-drawer” [Yoosuf 12:20] as referring to the vehicle that is known nowadays in which people

ride and travel by mechanical means [sayyaarah in modern Arabic means "car"] then raises an objection against the Quran by saying that cars were not invented at the time of Yoosuf (peace be upon him), so how can cars be mentioned here?! "[৩]

তার কথা হচ্ছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অনুযায়ী তথ্য/পরিভাষাকে গ্রহন করায় কোন দোষ নেই(!), কিন্তু কুরআনকে বুঝতে হবে কুরআন নাযিলের সময়ের প্রেক্ষাপটে যা বুঝানো হয়েছে আরবি ভাষায়, তার উপর। তিনি আরবি শব্দের 'গাড়ি'র উদাহরন দিয়েছেন। ১৪০০ বছর আগে যেই মেকানিক্যাল চাকাওয়ালা বাহন ছিল সেটাকে যে শব্দে ডাকা হত, সে শব্দ দ্বারাই আজ গাড়িকে ডাকা হয়। মানুষ প্রাচীন শব্দকে আধুনিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এমতাবস্থায় তার মতে কোনভাবেই কাউকে বলা উচিত না যে, কুরআনে কেন গাড়ির কথা আসল, গাড়ি তো ১৪০০ বছর আগে আবিষ্কৃত হয় নি!

তিনি চমৎকারভাবে সমন্বয় করলেন বৈজ্ঞানিক শব্দ গ্রহন এবং ইসলামের মধ্যে। কাফিরদের থেকে আসা বিশ্বাসগত শিক্ষা বা পরিভাষাকে গ্রহন করাতে দোষ নেই, কিন্তু কুরআনকে বুঝবার জন্য ওই নবোদ্ভাবিত বিদ্যা বা শিক্ষাকে ব্যবহার করা যাবে না! অদ্ভুত প্যারাডক্সিক্যাল কথা!

বিজ্ঞানপন্থীদের আরেক মিথ্যা দাবী হচ্ছে ,বিলিয়ন ট্রিলিয়ন (কাল্পনিক)গ্রহ-নক্ষত্র কাল্পনিক সীমাহীন মহাশূন্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সমস্ত নক্ষত্রদের দ্বারা শুধু প্রথম আসমানকে সুশোভিত করেছেন। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী তারকারা শুধুই নিকটবর্তী আসমানে তথা প্রথম আসমানে এর বাইরে নয়। গ্রহ বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমরা রাতের আসমানে মিটমিট করে যাদের জ্বলতে দেখি, তাদের সবাই প্রথম আসমানে ভাসমান নক্ষত্র।
আল্লাহ তাবারাকা তা'য়ালা সূরা মুলকে ইরশাদ করেনঃ
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি

[৬৭:০৫]

অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু চলাফেরা করে এবং কতকগুলো স্থির থাকে।

১. অন্য জায়গায় এই রিওয়াইয়াতটিই হযরত কাতাদাহ (রঃ)-এর নিজের উক্তি বলে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর ঐ নক্ষত্রগুলোর আরো একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন যে, ওগুলোর দ্বারা শয়তানদেরকে মারা হয়। ওগুলো হতে অগ্নি শিখা বের হয়ে ঐ শয়তানদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, এ নয় যে, স্বয়ং তারকাই তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। শয়তানদের জন্যে তো দুনিয়ায় এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন সূরা সাফফাতের শুরুতে রয়েছেঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ - لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ - إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ -

অর্থাৎ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে তারা ঊর্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে– বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।" (৩৭ঃ ৬-১০)

হযরত কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শয়তানদের মার এবং (তিন) পথ প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে ফেলে আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে।"[১]

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি[ছফফাতঃ৬]

সুতরাং, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন আজকের কাল্পনিক বিজ্ঞান আর আমাদের শাশ্বত সত্য ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে বৈপরীত্য এবং সাংঘর্ষিকতা। দুয়ের মধ্যে জ্ঞানগত ব্যবধান আকাশ পাতালের।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তারকারাজির পতনের স্থানের(অস্তাচল) কথা বলেছেন। আধুনিক অপবিজ্ঞানকে গ্রহণকারী মুসলিমরা আনন্দের সাথে বলছে এটাই ব্ল্যাকহোল। কুরআন বিজ্ঞানময়! কুরআনে ১৪০০ বছর আগে ব্ল্যাকহোলের কথা বলা হয়েছে যা হাবল টেলিস্কোপে এখন দেখানো হচ্ছে(৪)। অথচ সত্য হচ্ছে এসব ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব কম্পিউটার এনিমেশন, বই পুস্তক আর কল্পনার বাইরে নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কি ব্ল্যাক হোলের কথাই বলেছেন?! কখনোই না।

আল্লাহ এর দ্বারা খুন্নাস তারকাদের কথা বলেছেন যারা উদিত ও এবং অস্ত যায়। আল্লাহ ওদের অস্তাচলের শপথ করেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়[আন নাজমঃ-১]

হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টবস্তুর যেটার ইচ্ছা সেটারই কসম খেতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো কসম খেতে পারে না।"[১]

নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফজরের সময় সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা যুহ্‌রা নামক তারকা উদ্দেশ্য। যহ্‌হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওটা ঝরে গিয়ে শয়তানের দিকে ধাবিত হওয়া।

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ উক্তিটির ভাল ব্যাখ্যা হতে পারে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই বাক্যটির তাফসীর হলোঃ শপথ কুরআনের যখন তা অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতটি হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলোর মতইঃ

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ـ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ـ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ـ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ـ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ـ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ـ

অর্থাৎ "আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"(৫৬ ঃ ৭৫-৮০)

সুতরাং এই আয়াতটি নিচের আয়াতের মতই সমার্থক(ইমাম ইবনে কাসিরও তাই বলেছেন) যে আয়াত দ্বারা আজকের বিকৃত চিন্তার মুসলিমরা ব্ল্যাকহোল বুঝিয়ে থাকে।

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি[ওয়াক্বিয়াহ-৭৫]

مَوَاقِعِ দ্বারা مَنَازِل উদ্দেশ্য। হাসান (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন ঐগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ তারকাগুলোকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে মুশরিকদের আকীদা বা বিশ্বাস ছিল যে, অমুক অমুক তারকার কারণে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সকল নক্ষত্রদেরকে নির্বাপিত করবেন,সেগুলো ঝরে পড়বে আসমান গা থেকে।

আল্লাহ বলেনঃ

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

অতঃপর যখন নক্ষত্রসমুহ নির্বাপিত হবে[মুরসালাতঃ৮]

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ

যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,[ইনফিতারঃ২]

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ

যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে(তাকভীর:২)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ-এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ অর্থাৎ সূর্য আলোহীন হবে। আওফী (রঃ) বলেনঃ অর্থাৎ আলো চলে যাবে। আরো অন্যান্য গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ সূর্যের আলো যেতে থাকবে এবং উপুড় করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে একত্রিত করে নিষ্প্রভ করে দেয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর উত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত হবে এবং আগুন লেগে যাবে।

হযরত আবূ মরিয়ম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ সম্পর্কে বলেনঃ "সূর্যকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১] অন্য একটি হাদীসে সূর্যের সাথে চাঁদেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীসটি দুর্বল। সহীহ্ বুখারীতে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে জড়িয়ে নেয়া হবে। ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ-এর মধ্যে আনয়ন করেছেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করাই ছিল বেশী যুক্তিযুক্ত। অথবা এখানে ওখানে উভয় স্থানে আনয়ন করলেই তাঁর অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন এরূপ হবে তখন হযরত হাসান (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ওদের অপরাধ কি?" তখন হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ আমি হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি এর মধ্যে কথা তুলছো? কিয়ামতের দিন সূর্যের এ অবস্থা হবে, সমস্ত নক্ষত্র বিকৃত হয়ে খসে পড়বে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

অর্থাৎ "যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। জনগণ বাজারে থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে। তারপর নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। এরপর অকস্মাৎ পর্বতরাজি মাটিতে ঢলে পড়বে এবং যমীন ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করবে। মানব, দানব ও বন্য জন্তুসমূহ সবাই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। যেসব পশু মানুষকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো তারা মানুষেরই কাছে নিরাপত্তার জন্যে ছুটে আসবে। মানুষ এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তারা তাদের প্রিয় ও মূল্যবান গর্ভবতী উষ্ট্রীর খবর পর্যন্তও নেবে না। জ্বিনেরা বলবেঃ আমরা যাই, খবর নিয়ে আসি, দেখি কি

হচ্ছে; কিন্তু তারা দেখবে যে, সমুদ্রেও আগুন লেগে গেছে। ঐ অবস্থাতেই যমীন ফেটে যাবে এবং আকাশ ফাটতে শুরু করবে। সপ্ত যমীন ও সপ্ত আকাশের একই অবস্থা হবে। একদিক থেকে গরম বাতাস প্রবাহিত হবে, যে বাতাসে সব প্রাণী মারা যাবে।[১]

উপরে দেখতে পাচ্ছেন হাদিসটি, যেখানে ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন, সূর্যকে নিষ্প্রভ করে উপুর করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হবে। নক্ষত্রদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। এর দ্বারা প্রমান হয়,আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে অপবিজ্ঞান যা বলে তা মিথ্যা। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র বিজ্ঞান অনুযায়ী পৃথিবীর তুলনায় বিলিয়ন মিলিয়ন গুন বড়। এত বড় যে পৃথিবীকে নক্ষত্রদের সামনে একটা বিন্দুর সমতুল্যও মনে হবে না।এদেরকে পৃথিবীর উপর পতনের কথা কল্পনাও করা যায় না। এর সমপর্যায়ের ভাবনা এরূপ যে কোন এক বিন্দু বালির উপর গোটা পৃথিবীকে ফেলার কথা বলা। কিন্তু সাহাবীদের(রাঃ) আকিদা এটাই যে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন এদেরকে পৃথিবীর ভূমিতে ফেলে দেবেন। সকল নক্ষত্রদেরকে সমুদ্রে ফেলে নিষ্প্রভ করবেন। এটা প্রমান করে সত্যিকারের সৃষ্টিজগতের প্রকৃতি। এটা সাহাবীদের আকিদা যে, নূনের পৃষ্ঠদেশে সমতলভাবে বিছানো যমীনের বিশালতার তুলনায় চাঁদ সূর্য, নক্ষত্ররা অনেক অনেক ছোট। এদের প্রত্যেককে একত্রে সমুদ্রে নিক্ষেপ সম্ভব। আল্লাহ স্বয়ং এদের খসে/ঝড়ে পড়ার কথা বলেছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে সমুদ্রে ফেলে নিষ্প্রভ করে দেবেন। তারপর আল্লাহ পশ্চিমা বায়ু প্রেরণ করবেন, তা সেগুলোকে আগুনে ইন্ধনরূপে নিক্ষেপ করবে।

এসব বর্ণনা প্রমাণ করে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বিশেষ

Source:Al Bidaya Wan Nihaya

ছায়াপথ-আকাশগঙ্গা

ছায়াপথের ব্যপারে কাফির মুশরিকদের শেখানো আকিদা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লক্ষকোটি তারকা গ্রহ-নক্ষত্র সমস্তকিছুর ধারক। এটা ধূলিকণা, গ্যাস,প্লাজমা,কৃষ্ণবস্তু দ্বারা গঠিত। এগুলো হাজার হাজার আলোকবর্ষের দৈর্ঘ্যপ্রস্ত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। সমগ্র মহাকাশে এরকম বিলিয়ন মিলিয়ন ছায়াপথ আছে। প্রতিটা ছায়াপথ আবার মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র ধারন করে। প্রত্যেক ছায়াপথ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে প্রচন্ড গতিতে(ঘন্টায় মিলিয়ন বিলিয়ন কিলোমিটার) মহাশূন্যের অজানা গন্তব্যে এদিক ওদিক ছুটে চলছে[৫]।

অথচ ছায়াপথের ব্যপারে ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ন ভিন্ন।ছায়াপথ হচ্ছে আসমানের একটি দরজা। কিয়ামতের সময় এই দরজা থেকেই বিদীর্ণ হওয়া শুরু হবে।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন এবং এ সময় তিনি বলেন যে, যদি তাঁদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে নবুওতের শিক্ষার কিছুটাও অবশিষ্ট থাকে তবে অবশ্যই তারা আমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পত্রে তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে ছায়াপথ, রংধনু এবং ঐ ভূখণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যাতে স্বল্প সময় ব্যতীত কখনো সূর্য পৌছেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পত্র ও দূত এসে পৌছলে মু'আবিয়া (রা) বললেন, এ তো এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবো বলে এ যাবত কখনো আমি কল্পনাও করিনি। কে পারবেন এর জবাব দিতে? বলা হলো, ইব্‌ন আব্বাস (রা) পারবেন। ফলে মু'আবিয়া (রা) হিরাক্লিয়াসের পত্রটি গুটিয়ে ইব্‌ন আব্বাসের নিকট পাঠিয়ে দেন। জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) লিখেন ঃ রংধনু হলো, পৃথিবীবাসীর জন্য নিমজ্জন থেকে নিরাপত্তা। ছায়াপথ আকাশের সে দরজা, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হবে আর যে ভূখণ্ডে দিনের কিছু সময় ব্যতীত কখনো সূর্য পৌছেনি; তাহলো সাগরের সেই অংশ যা দু'ভাগ করে বনী ইসরাঈলদেরকে পার করানো হয়েছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত এ হাদীসের সনদটি সহীহ।

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, আজকের উম্মাহ কতটা জঘন্যভাবে নব্যুয়তের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কাফিরদের কাল্পনিক অসত্য শিক্ষাকে গ্রহন করে নিয়েছে! বর্তমান যুগের আলিম, দাঈ এবং গায়রে আলিম সমস্ত মুসলিমের কাছে প্রশ্ন, কাফিরদের শিক্ষার কোন বিষয়টা তাদের নিকট নব্যুয়তের শিক্ষার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য, চাকচিক্যপূর্ন এবং উত্তম বলে মনে হয়েছে, যার দরুন তারা কাফির-মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদা ও শিক্ষাকে গ্রহন করে নিয়েছে?!

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ ''তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরন করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তেও ঢুকে, তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি ইয়াহুদী ও নাসারাদের কথা বলছেন? নবী (সাঃ) বললেন, তবে আর কার কথা?''

বুখারী ৩৪৫৬; মুসলিম ৬৬৭৪-(৬/২৬৬৯)

''ইয়াহুদি ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহন করো। বল- আল্লাহর দেখানো পথই সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও ওদের ইচ্ছা অনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ হতে রক্ষা করার মতো কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না''

[বাকারাহ ২/১২০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, যে তিনি আমাদের মত অতি স্বল্পসংখ্যক অধমকে হক্ককে চেনার এবং মান্য করার তাওফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

রেফা:

১)
https://www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/splash.html
https://www.universetoday.com/54756/what-is-the-big-bang-theory/
https://www.space.com/13352-universe-history-future-cosmos-special-report.html
https://phys.org/news/2018-06-planet-formation-star-maturity.html
http://www.bigbangcentral.com/galaxy_page.html

২)
http://www.atheistbangla.com/2018/09/how-earth-created.html

৩)

https://islamqa.info/en/answers/243871/meteorites-and-shooting-stars-may-be-called-stars-nujoom-and-heavenly-bodies-kawaakib-in-arabic

৪)
https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/Mahfuzhappy/29261752

৫)
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/ছায়াপথ

বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ
https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

[দিবা-রাত্রি]

পর্ব-১০

দিবা রাত্রি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অনন্য এক নিদর্শন। আল্লাহ দিনকে কর্মের জন্য এবং রাত্রিকে করেছেন নিদ্রার সময়।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً

আমি রাত্রি ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিস্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি

(১৭:১২)

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বড় বড় ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, দিবস ও রজনীকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সৃষ্টি করেছেন। রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন আরামের জন্যে এবং দিবসকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্যে। মানুষ যেন ঐ সময় কাজকর্ম করতে পারে, শিল্পকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে পারে। আর পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমনের ফলে মানুষ সপ্তাহ, মাস ও বছরের গণনা জানতে পারে, যাতে লেন দেন, পারস্পরিক কার্যকলাপে, ঋণে,

মেয়াদের এবং ইবাদতের কাজকর্মে সুবিধা হয়। যদি সময় একটাই থাকতো তবে বড়ই কঠিন হয়ে পড়তো। সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু রাতই রেখে দিতেন। কারো ক্ষমতা হতো না যে, সে দিন করতে পারে। আর যদি তিনি সর্বদা দিনই রেখে দিতেন তবে কার এমন ক্ষমতা ছিল যে, সে রাত্রি আনতে পারে? মহান আল্লাহর ক্ষমতার এই নিদর্শনগুলি শুনবার ও দেখবার যোগ্যই বটে। এটা একমাত্র তাঁরই রহমত যে, তিনি বিশ্রাম ও শান্তির জন্যে রাত্রি বানিয়েছেন এবং দিবসকে বানিয়েছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্যে। এ দু'টি পর্যায়ক্রমে একে অপরের পরে আসতে রয়েছে, যাতে কৃজ্ঞতা প্রকাশ ও উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণকারী সফলকাম হতে পারে। তাঁরই হাতে রয়েছে পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমন। তিনি রাত্রির পর্দা দিনের উপর এবং দিনের পর্দা রাত্রির উপর চড়িয়ে থাকেন। সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই আয়ত্বাধীনে রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের নির্দিষ্ট সময়ের উপর চলতে রয়েছে। ঐ আল্লাহ পরাক্রমশালী ও চরম ক্ষমাশীল। তিনি আরামদায়ক বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত রেখেছেন, এটা তাঁরই নির্ধারিত পরিমাণ যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। রাত্রিকে অন্ধকার ও চন্দ্রের প্রকাশের দ্বারা চেনা যায় এবং দিবসকে আলোক ও সূর্যোদয়ের দ্বারা জানা যায়। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই উজ্জ্বল ও আলোকময়। কিন্তু এ দু'টির প্রতিও তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন যেন প্রত্যেকটিকে চিনতে পারা যায়। সূর্যকে উজ্জ্বল ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় তিনিই করেছেন। মনযিল সমূহ তিনিই নির্ধারণ করেছেন যাতে হিসাব ও বছর জানা যায়। আল্লাহ তাআ'লার এই সৃষ্টি সত্য (শেষ পর্যন্ত)। কুরআন কারীমে রয়েছেঃ "(হে নবী সঃ!) তারা তোমাকে চন্দ্রের (প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, তুমি বলে দাও, এই চন্দ্র সময় নির্ধারক যন্ত্র বিশেষ, মানুষের জন্যে এবং হজ্জের জন্যে (শেষ পর্যন্ত)।"

রাত্রির অন্ধকার সরে যায় এবং দিনের ঔজ্জ্বল্য এসে পড়ে। সূর্য দিনের লক্ষণ এবং চন্দ্র রাত্রির আলামত। আল্লাহ তাআ'লা চন্দ্রকে কিছু কালিমাযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি রাত্রির নিদর্শন চন্দ্রকে সূর্যের তুলনায় কিছুটা অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছেন। তাতে তিনি এক প্রকারের কলংক লেপন করেছেন। ইবনুল কাওয়া (রঃ) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "চন্দ্রের মধ্যে এই কালিমা কিরূপ?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এরই বর্ণনা নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ "আমি রাত্রির নিদর্শন অর্থাৎ চন্দ্রের মধ্যে অস্পষ্টতা নিক্ষেপ করেছি (অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছি) এবং দিনের

❑ ২১

নিদর্শন অর্থাৎ সূর্যকে করেছি অধিকতর উজ্জ্বল, এটা চন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর এবং অনেক বড়। দিন ও রাত্রিকে আমি দু'টি নিদর্শনরূপে নির্ধারণ করেছি। তাঁর সৃষ্টিই এইরূপ।"

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে (২৫:৬১)

যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্যে তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে। এটা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর ব্যবস্থাপনা যে, দিবস ও রজনী একের পরে এক আসছে ও যাচ্ছে। যেমন তিনি বলেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ -

অর্থাৎ "তিনি তোমাদের জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে একে অপরের অনুগামীরূপে বানিয়েছেন।" (১৪ ঃ ৩৩) আরো বলেনঃ

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

অর্থাৎ "রাত দিনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি ওকে কামনা করে।" (৭ ঃ ৫৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা।" (৩৬ ঃ ৪০)

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তিনিই ভুমন্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু'দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শণ রয়েছে, যারা চিন্তা করে

(১৩:৩)

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১৬:১২)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে

(৩:১৯০)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবু ও কি তোমরা বুঝবে না?

(২৩:৮০)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অর্ন্তদৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে (২৪:৪৪)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে

(২৫:৪৭)

আল্লাহ রাত ও দিনের মধ্যে কোনটিকে আগে সৃষ্টি করেন তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। একদল বলেন, দিনের সৃষ্টির পূর্বে রাত ছিল,অপর একদল আলিমদের মত সবার প্রথমে

দিন বা রাত কোনটিই ছিল না,শুধু ছিল আল্লাহর নূরের আলো। তাদের কেউ কেউ বলেন আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আলো এবং আঁধার। তাদের মতে পানি,আরশ,কলম সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ আলো আঁধারকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন।

ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তাহলো-আলো ও অন্ধকার। তারপর দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে তিনি অন্ধকারকে কালো আঁধার রাতে এবং আলোকে উজ্জ্বল দিবসে পরিণত করেন।

আঁধারে পূর্বে আলো ছিল,

According to 'Ali b. Sahl-al-Hasan b. Bi1a1420 -Hammad b. Salamah -Abu 'Abd al-Salam al-Zubayr421-Ayyub b. 'Abdallah al-Fihri 22 -Ibn Masud: With your Lord there is neither night nor day. The light of the heavens comes from the light of His face. The measure of each of those days of yours is twelve hours with Him.

[History of Imam Tabari]

ইবনে আব্বাস(রাঃ) এবং কতিপয় প্রাচীন আলিমদের মতে সৃষ্টিজগতের প্রথমে রাত্রি বা আধার ছিল। কারন আসমান ও যমীনসমূহ ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল।

দল! তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদত করছো কেন? প্রথমে আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিতভাবে ছিল। একটি অপরটি হতে পৃথক ছিল না। আল্লাহ তাআ'লা পরে ওগুলিকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছেন। যমীনকে নীচে ও আসমানকে উপরে রেখে উভয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করতঃ অত্যন্ত কৌশলের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সাতটি যমীন ও সাতটি আসমান বানিয়েছেন। যমীন ও প্রথম আসমানের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা রেখেছেন। আকাশ হতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্ন করেন। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস তিনি পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। এই সমুদয় জিনিস, যে গুলির প্রত্যেকটি, কারিগরের একচেটিয়া ক্ষমতা ও একত্ব প্রমাণ করে না কি? এ লোকগুলি নিজেদের সামনে এসব কিছু বিদ্যমান পাওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি করেই শির্‌ক পরিত্যাগ করছে না।

فَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ ۞ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

অর্থাৎ "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই তাঁর (আল্লাহর) অস্তিত্বের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, তিনি এক।"

হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনু আব্বাসকে (রঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "পূর্বে রাত ছিল, না দিন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ

"প্রথমে যমীন ও আসমান মিলিত ও সংযুক্ত ছিল। তা হলে এটাতো প্রকাশমান যে, তাতে অন্ধকার ছিল। আর অন্ধকারের নামইতো রাত। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, পূর্বে রাতই ছিল।"

Ibn Bashshar-'Abd al-Rahman (b. Mahdi)-Sufyan (al-Thawri)- his father B -'Ikrimah-Ibn 'Abbas: Asked whether the night existed before the day, (Ibn 'Abbas?) replied: ***Don't you see! When the heavens and the earth weie compressed, 409 was there anything but darkness between them? This is meant for you to realize that the night existed before the day.***

According to al-Hasan b. Yahya410 -'Abd al-Razzag41 -(Sufyan) al-Thawri-his father-'Ikrimah-Ibn 'Abbas: ***The night is before the day****. Then he said: "The two were compressed, and We then split them apart."412*

[History Of Tabari Vol:1]

এটা মানতে কোন অসুবিধা নেই যে সর্বপ্রথম সৃষ্টিজগতে অন্ধকার বিদ্যমান ছিল। ইবনে আব্বাস(রাঃ) ও ইবনে মাসুদ(রাঃ) এর বর্ননার হাদিসটির মধ্যে কোন সাংঘর্ষিকতা নেই, কারন হয়ত ইবনে আব্বাস(রাঃ) আসমান যমীনের মধ্যস্থিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে এমনটা বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান যমীনের মধ্যে জ্যোতি তথা দিবালোকের উন্মেষ ঘটান যমীন ও আসমানকে সৃষ্টির পর। অথচ তখনও যমীনকে সমতলে বিস্তৃত করা হয়নি, পাহাড়গুলোকেও স্থাপন করা হয়নি,চাঁদ-সূর্যকেও সৃষ্টি করা হয়নি। যেমনটা আল্লাহ বলেনঃ

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا

তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا

এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا

তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন,

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন(৭৯:২৮-৩২)

অন্ধকার রাত্রে চমকিত ও উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ঐ আকাশের গায়ে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি অন্ধকার কৃষ্ণকায় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। দিনকে উজ্জ্বল এবং আলোকমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। জমীনকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন। পানি এবং খাদ্যদ্রব্যও তিনি বের করেছেন। সূরা হা-মীম সাজদায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকাশের পূর্বেই জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে যমীনের বিস্তৃতিকরণ আকাশ সৃষ্টির পরে ঘটেছে। এখানে এটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

এটা প্রমান করে, দিন চাঁদ ও সূর্যের থেকে স্বাধীন।আলো ও আধারের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই। হয়ত আল্লাহ রাতকে দিনের পূর্বে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ দিনের আলোর পূর্বে রাত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ

সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (৬:১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমানের নিচে জ্যোতি বিনির্গত করেন বুধবারে বা চতুর্থ দিনে। সেটা শুধুই আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর। যমীনে পর্বত প্রোথিতকরন এবং সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্রমালা সৃষ্টির বহু আগেই দিবালোকের ব্যবস্থা করেন।

This we were told by Hannad b. al-Sari-Abu Bakr b. 'Ayyash-Abu Sa'd al-Baqqal-'Ikrimah Ibn 'Abbas-the Prophet. As transmitted by Abu Hurayrah, the Prophet said: God created light on Wednesday.426

This I was told by al-Qasim b. Bishr and al-Husayn b. 'Ali-IIajjaj b. Muhammad-Ibn Jurayj Ismail b. Umayyah-Ayyub b. Khalid-'Abdallah b. Rafi'-Abu Hurayrah-the Prophet: God created light on Wednesday.

He created the light on Wednesday. I was told this by al-Qasim b. Bishr b. Ma'ruf and al-Husayn b. 'All al-Suda'i-Hajjaj-Ibn Surayj-Ismail b. Umayyah-Ayyub b. Khalid-Abdallah b. Rafi', the mawla of Umm Salamah-Abu Hurayrah-the Prophet.

[History of imam Tabari]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বৃহস্পতিবার উপরে উত্থিত ধুম্রকুঞ্জ থেকে সলিড আসমানে পরিনত করে স্তরে স্তরে সজ্জিত করেন।

Thursday: He created on it the heavens, which were compressed but then were split,373 as I was told by Musa b. Harun- 'Amr b. Hammad-Asbat-al-Suddi-Abu Malik and Abu Salih Ibn 'Abbas. Also (al-Suddi)-Murrah al-Hamdani-'Abdallah b. Masud and some (other) companions of the Prophet (commenting on): "Then He stretched out straight toward heaven, which was smokei374 -that smoke came from the water 's breathing- and made it into one heaven . Then He split (this one heaven) into seven heavens on two days, Thursday and Friday.

According to al-Muthanna-Abu Salih ('Abdallah b. Silih) -Abu Ma'shar-Sa'id b. Abi Said-'Abdallah b. Salim: God created the heavens on Thursday and Friday, and He finished in the last hour of Friday, in which He created Adam in haste. This is the hour in which the Hour will come.

[History of Imam Tabari]

যেহেতু বৃহস্পতিবার আসমানকে সাত স্তরে সুসজ্জিত করা হয় সেহেতু চাঁদ সূর্য নক্ষত্রদের অস্তিত্ব এর আগে কল্পনা করা যায় না। শুক্রবারের শেষ প্রহরে তিনঘন্টা বাকি থাকতে চাঁদ সূর্য নক্ষত্র সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং ছয়দিনের প্রায় শেষ ৩ দিন অর্থাৎ বুধবার থেকে সূর্যোদয় ছাড়াই রাত দিন আবর্তিত হয়।

As transmitted on (Ibn 'Abbas') authority, (the Prophet) said: God created the sun, the moon, the stars, and the angels on Friday, until three hours

remained of it.

Abu Bakr b. 'Ayyash-Abu Said (!) al-Baggal-`Ikrimah-Ibn 'Abbas-the Prophet: On Thursday He created heaven. On Friday He created the stars, the sun, the moon,[...]

[History of Imam Tabari]

ইমাম ইবনে জারির তাবারি রহিমাহুল্লাহ এ ব্যপারে আসা হাদিসের ব্যপারে বলেনঃ
Abu Ja'far (al-Tabari) says: Regarding this, the correct statement, in our opinion, is the one of those who said : God created the earth on Sunday. He created the heaven on Thursday, and He created the stars and the sun and the moon on Friday. (We consider it correct) because of the soundness of the report mentioned by us earlier on the authority of Ibn 'Abbas from the Messenger of God. The tradition transmitted to us on the authority of Ibn 'Abbas is not impossible .[......]

[History of Imam Tabari]

এই হাদিস গুলো প্রমান করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান যমীনে সর্বপ্রথম অন্ধকারের সৃষ্টি করেন এবং এরপরে আলো সৃষ্টি করেন। চতুর্থদিনে এতে জ্যোতিবিনির্গত করেন। অতঃপর সৃষ্টিকার্য সমাপ্তের শেষ প্রহরে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সূর্যের সৃষ্টির পূর্বে প্রায় ৩০০০ বছরের মত সময় যাবৎ দিবারাত্রি আবর্তিত হত। এতে এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় প্রভাত রশ্মির উন্মেষে সূর্যের ভূমিকা নেই, যেটা হেলিওসেন্ট্রিক প্যাগান কস্মোলজি শিক্ষা দেয়। দিবা-রাত্রি সূর্যের থেকে স্বাধীন। প্রায় ৩০০০ হাজার বছর এজন্যই বলছি যে আল্লাহর সৃষ্টিকার্যের ছয়দিনের একদিন=আমাদের হিসাবের ১০০০ বছর। সুতরাং বুধ থেকে শুক্র পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ বছর।
According to Ibn Humayd-Hakkam392 -'Anbasah393 -Simak394 -'Ikrimah-Ibn 'Abbas, commenting on: God "created the heavens and the earth in six days"395 -of which each day is like "one thousand years of your counting."396

[History of Imam Tabari]

অতএব,দিনরাত্রি আল্লাহর স্বতন্ত্র বিস্ময়কর সৃষ্টি। দিবারাত্রি সূর্য-চন্দ্রের ন্যায় ফালাকে আবর্তন করে। চন্দ্র সূর্যের আগে যেতে পারে না, দিন রাত্রির আগে যেতে পারে না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরন করছে।আল্লাহ বলেনঃ

لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে(৩৬:৪০)

আর রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারে না, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাত্রে। রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে এসে পড়ে। একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, না বিশৃংখলার আশংকা আছে। এমন হতে পারে না যে, দিনই থেকে যাবে, রাত্রি আসবে না এবং রাত্রি থেকে যাবে, দিন আসবে না। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিবস ও রজনী নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসেম (রঃ)-এর উক্তি এই যে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ফালাকে এগুলো যাওয়া আসা করছে। কিন্তু এটা বড়ই গারীব এমনকি মুনকার বা অস্বীকৃত উক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি হচ্ছে চরখার ফালাকের মত। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা যাঁতার পাটের লোহার মত।

আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (২১:৩৩)

আমরা গত পর্বে চন্দ্র সূর্যের সমান্তরাল অবস্থানে থেকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ফালাকে আবর্তনের কথা উল্লেখ করেছিলাম। উপরের আয়াত দুটি এর কথাই বলে। বিষয়টা শুধু চাঁদ সূর্য নয় দিবা-রাত্রির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দিন রাত্রিও চাঁদ সূর্যের মত একে অন্যের পিছনে সন্তরণরত। আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।(৭:৫৪)

আয়াতে উল্লিখিত চাঁদ সূর্য, দিন রাত্রিকে একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা প্রমানের অনেকে বৃথা চেষ্টা চালাবেন,তাদেরকে বলি, চাদের সাথে রাতের এবং সূর্যের উপর দিনের নির্ভরশীলতা বোঝানো হলে ক্রমধারা এরূপ হত যেঃ চাঁদ-সূর্য এবং রাত্রি-দিন অথবা দিন-রাত্রি এবং সূর্য-চন্দ্র। কিন্তু আল্লাহ ক্রমধারা বজায় রাখেন নি। অর্থাৎ এর মানে দাঁড়ায় সবগুলি একে অন্যের থেকে স্বাধীন। দিন-রাত্রির সমান্তরালে(একের পিছনে আরেকটির) আবর্তনের দৃশ্য পর্যবেক্ষণযোগ্য। দিন রাত্রির পাশাপাশি অবস্থানের দৃশ্য একটি সমুদ্রে অবস্থানকারী জাহাজ থেকে কেউ একজন ধারন করে। এতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় একদিকে দিনের গোধূলির আলো অন্যদিকে রাতের নিকষ আঁধারের চাদর। প্রচলিত বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা নেই। তবে কুরআন সুন্নাহ ফেনোমেনার মূল কারন সম্পর্কে বলে। দেখুনঃ

https://m.youtube.com/watch?v=xdBR3tDXyVw

আল্লাহই দিন ও রাত্রিকে একটিকে অন্যটির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। আল্লাহ বলেনঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর

(৩:২৭)

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত

(৫৭:৬)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্য দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন

(২২:৬১)

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ
তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়

(৩৫:১৩)

وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ
তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়

(৩৬:৩৭)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন?(৩১:২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ রাত্রিকে কিছু ছোট করে দিবসকে বাড়িয়ে দেয়া এবং দিবসকে কিছু ছোট করে রাত্রিকে বাড়িয়ে দেয়া আমারই কাজ। শীতের দিনে রাত্রি বড় ও দিন ছোট এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হওয়া আমারই শক্তির প্রমাণ। চন্দ্র-সূর্যের চক্র ও আবর্তন আমারই আদেশক্রমে হয়ে থাকে। এগুলো নির্ধারিত স্থানের দিকেই চলে। নিজ স্থান থেকে এতোটুকুও এদিক ওদিক যেতে পারে না।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত(৫৭:৬)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে, আর তিনি অন্তর্যামী।" অর্থাৎ মাখলূকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটানো তাঁরই কাজ। স্বীয় হিকমতের মাধ্যমে তিনি এ দু'টির হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনো দিন বড় করেন ও রাত্রি ছোট করেন এবং কখনো রাত্রি বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনো দুটোকেই সমান করে দেন। কখনো করেন শীতকাল, কখনো করেন গ্রীষ্মকাল এবং কখনো করেন বর্ষাকাল, কখনো বসন্তকাল, আর কখনো শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সুর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল(৩৯:৫)

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং শাসনকর্তা। দিবস ও রজনীর পরিবর্তনও তাঁরই হুকুমে হচ্ছে। তাঁর নির্দেশক্রমে দিনরাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির পর অপরটি আসে না এমন কোন সময়ই হয় না। মহান আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে না। তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

এটা সেই আয়াত যেটা দ্বারা আলিমদের একদল কাফিরদের বলা গোলাকৃতি পৃথিবীর অসত্য ধারনাকে সত্যায়ন করতে দলিল বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এই আয়াতে পৃথিবীর আকৃতির ব্যপারে কিছুই বলে না। যেটা বলে সেটা দিবা রাত্রির আবর্তন।
শাইখ ইবনে উসাইমীন(রহঃ) বলেনঃ
The earth is round, based on the evidence of the Qur'an, reality, and scientific views. The evidence of the Qur'an is the verse in which Allah, may He be exalted, says (interpretation of the meaning):
"He created the heavens and earth for a true purpose; He wraps the night around [yukawwir] the day and the day around the night"*[az-Zumar 39:5].*
The word ***yukawwir*** *(translated here as "wraps around" means to make something round, like a turban. It is well-known that night and day follow one another on earth, which implies that the Earth is round, because if you wrap one thing around another thing, and the thing that it is wrapped around is the Earth, then Earth must be round.*

Fataawa Noor 'ala ad-Darb

ইবনে উসাইমীন (রহঃ) যে সাইন্সের অনুসরন করেছেন সেটা তিনি প্রথমেই স্পষ্ট করেই বলেছেন। এই বিজ্ঞান ঘেষা বিশ্বাসকে ভ্যালিড করতে কুরআনের সূরা যুমারের ৫ নং আয়াতকে ব্যবহার করেছেন। তার যুক্তি হচ্ছে Yukawwir শব্দটি দ্বারা কোনরূপ বর্তুলাকৃতিকে(sphericity) নির্দেশ করে। যদিও এখানে যমীনের ব্যপারে কিছুই বলা হচ্ছে না, তিনি জোড় করে যমীনের দিকে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

আমরা উপরে দলিলগুলোকে উল্লেখ করেছি যে দিবারাত্রি আসমানের ফালাকে সন্তরনশীল(21:33)। হাদিসে যে আধাঁরের পর্দা সঞ্চালনের কথা এসেছে সেটাও আসমানের তরঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ দিবারাত্রির আলো আঁধার আসমানের সাথে সম্পর্কিত। আমরা বিগত পর্বগুলোয় আসমানের গম্বুজাকৃতির ব্যাপারে আসা শারঈ দলিল গুলো উল্লেখ করেছি। গম্বুজাকৃতি বা ডোম স্ট্রাকচার একটি সেমি স্ফেরিক্যাল স্ট্র্যাকচার। অর্থাৎ অর্ধবর্তুলাকার। এই অর্ধবর্তুলাকার ছাদে দিন রাত্রির আলো-আঁধারি একে অপরকে মুড়িয়ে(wrapping) দেয় বা আচ্ছাদিত করে। Vaulted Dome shaped আসমানের কার্ভাচারের উপরে দিন রাত্রির আচ্ছাদনের বর্ননার জন্য সবচেয়ে যথার্থ শব্দ Yukawwir(Wrap), যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ আয়াতে ব্যবহার করেছেন। এখানে যমীনের সাথে কোনরূপ সম্পর্কই নেই। এজন্য এই আয়াতকে পৃথিবী গোলাকার হবার সম্ভাব্য দলিল হিসেবেও গ্রহন করার বিষয়টি খুব অবাক করে। তারা আসমান বাদ দিয়ে যমীনকে মনে করেছে, যদিও যমীনের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। এই আয়াতটিকে দলিল হিসেবে শুধু উসাইমীন(রহঃ) একা নন, তার পূর্বে ইবনে হাযমও নিয়েছেন। বিস্তারিতঃ
https://islamqa.info/en/answers/118698/consensus-that-the-earth-is-round

আল্লাহ যেরূপে আলোকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন তদ্রুপ অন্ধকারকেও। সুদীর্ঘ এক হাদিসে রাত্রি আবর্তনের ব্যাপারে বর্ননা এসেছে। ফেরেশতারা একটা সুবিশাল আধারের পর্দাকে আসমানের তরঙ্গের ভেতরের কক্ষপথে টেনে নিয়ে যায়। অতঃপর যার উপর দিয়ে সেটা অতিক্রম করে তাকে সে আচ্ছন্ন করে। ফেরেশতারা সেই পর্দাকে যমীনের উপর দুই প্রান্তে গিয়ে টেনে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে যায়। এভাবে প্রতিদিন রাত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত নির্ধারিত সংখ্যক আধারের চাদর পশ্চিমে পৌছানোর কাজে রত থাকবে। হাদিসটিঃ
Ibn 'Abbas said that 'Ali b. Abi Talib said to the Messenger of God: You are like my father and my mother! [.........] He continued. In the east, God places a veil of darkness on the seventh ocean according to the number of nights from the day God created this world until the day when this world will be cut off.At sunset, an angel entrusted with the night comes and grabs a handful of the veil's darkness. He then moves toward the west,all the time gradually releasing some of the darkness through the interstices of his fingers, watching out for the twilight. When the twilight has disappeared, the angel releases all the darkness. He then spreads out his two wings. They

reach the two sides of the earth and the two rims of heaven and pass outside in the air as far as God wishes. The angel drives the darkness of the night with his wings, praising and sanctifying God with prayer, until he reaches the west. When he has reached the west, morning dawns from the east. The angel puts together his wings, then puts together the parts of the darkness one by one in his palms, then grabs in one palm as much of the darkness as he had taken from the veil (of darkness) in the east, and places it in the west on the seventh ocean. From there comes the darkness of the night. When the veil is transported (completely) from east to west, [70] the Trumpet is blown, and this world comes to its end. The luminosity of the day comes from the east, and the darkness of the night comes from that veil . The sun and the moon always continue this way from rising to setting, and on to their being raised to the highest, seventh heaven and their being held underneath the Throne[......]

[History of Imam Tabari]

অতএব এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে রাত্রির আধাঁর আল্লাহরই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। হয়ত এজন্যই বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রাতকে আচ্ছন্নকারী আবরণ বলেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

রাত্রিকে করেছি আবরণ।(৭৮:১০)

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ 'আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ।' অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার ও কৃষ্ণতা জনগণের উপর ছেয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا

অর্থাৎ "শপথ রজনীর যখন সে ওকে আচ্ছাদিত করে।" (৯১ ঃ ৪) আরব কবিরাও তাঁদের কবিতায় রাত্রিকে পোশাক বা আবরণ বলেছেন।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, রাত্রি শান্তি ও বিশ্রামের কারণ হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি দিবসকে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে (উপযোগী) করেছি।' অর্থাৎ রাত্রির বিপরীত দিনকে আমি উজ্জ্বল করেছি। দিনের বেলায় আমি অন্ধকার দূরীভূত করেছি যাতে তোমরা ওর মধ্যে জীবিকা আহরণ করতে পার।

আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

وَاللَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ

শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৯২:১-২)

وَاللَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَاهَا

শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে,[৯১:৩-৪]

রাত্রি যখন সূর্যকে ঢেকে দেয় এবং চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ইয়াযীদ ইবনে যী হামামাহ (রঃ) বলেন যে, যখন রাত্রি আসে তখন আল্লাহ জাল্লাজালালুহু বলেনঃ আমার বান্দাদেরকে আমার এক বিপুলাকার মাখলুক ঢেকে দিয়েছে। কাজেই মাখলুক বা সৃষ্টিজগত যখন রাত্রিকে ভয় করে তখন রাত্রির স্রষ্টাকে আরো বেশী ভয় করা উচিত।[১]

অন্ধকারকে যেরূপে আল্লাহ যমীনের উপর ছড়িয়ে দেন। হয়ত আলোর ক্ষেত্রেও তদ্রুপ কিছু একটা ঘটে। আল্লাহ ভাল জানেন। পশ্চিমের অর্থোডক্স ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাস করে দিনের আলো তৈরি হয় একটি বিশেষ গ্যাসের কারনে।দেখুনঃ https://m.youtube.com/watch?v=3GZhj9BbIXc

ওদের কাছে এ বিশ্বাসের দলিল হচ্ছে বিকৃত তাওরাতের প্রথম দিকের কিছু ভার্স। এগুলো হচ্ছে ইহুদীদের নিকট আসা সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানের উৎস যা তারা আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর জীবদ্দশায় তার নব্যুয়তের সত্যয়নের পরীক্ষায় ব্যবহার করত। তারা আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বর্ননার সাথে সাদৃশ্যতা পেয়ে আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর কথার সত্যতার স্বীকৃতি দিত। এখান থেকেই কিতাব বিকৃত করে ওরা sabbath এর প্রথা চালু করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা রবিবার ও সোমবারে যমীন সৃষ্টি করেন। পাহাড় পর্বত এবং সমুদয় উপকারী বস্তুকে সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে। বুধবারে গাছ-পালা, পানি, শহর এবং আবাদী ও অনাবাদি অর্থাৎ জনপদ ও মরু প্রান্তর সৃষ্টি করেন। সুতরাং এটা হলো চার দিন।" এটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবারে তিন ঘন্টা বাকী থাকা পর্যন্ত নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র এবং ফেরেশতামণ্ডলী সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় ঘন্টায় প্রত্যেকটি জিনিসের উপর বিপদ আপতিত করেন যার থেকে লোক উপকার লাভ করে থাকে। তৃতীয় ঘন্টায় তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, তাঁকে বেহেশতে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইবলীসকে হুকুম করেন হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার এবং পরিশেষে তাকে সেখান হতে বের করে দেন।" ইয়াহূদীরা বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এরপর কি হলো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।" তারা বললোঃ "আপনি সবই ঠিক বলেছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেননি। তা হলো এই যে, অতঃপর তিনি আরাম গ্রহণ করেন।" তাদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ -

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ -

অর্থাৎ "আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"(৫০ ঃ ৩৮-৩৯)[১]

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আর ঐ দিনটি ছিল শনিবার। ঐ দিনের নামটিই তারা يَوْمُ السَّبْتِ রেখে তবে ছেড়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবনদান করতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"(৪৬ ঃ ৩৩)

ইহুদীদের তাওরাতে উল্লিখিত এ ভার্সগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে প্রায় শতভাগ সঙ্গতিপূর্ণ। এটা এরূপ যেন গোটা বিষয়টার সারমর্ম একত্রে দেওয়া। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে আসা কুরআন ও সুন্নাহর সকল দলিল সামনে রাখলে দেখলে মনে হবে, এটা যেন তাওরাতে আসা সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই পুনরায় বলছে। আমরা বিগত পর্বগুলোয় যার আলোচনা বিশদভাবে করছি, সেটাই যেন ওখানে আছে। তাওরাতে এই ভার্সগুলো নিম্নরূপঃ

א1 בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ. In the beginning God created the heaven and the earth.

ב2 וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלֹהִים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם. Now the earth was unformed and void, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God hovered over the face of the waters.

ג3 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר. And God said: 'Let there be light.' And there was light.

ד4 וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאוֹר, כִּי-טוֹב; וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים, בֵּין And God saw the light, that it was good; and God divided the light from

הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ.

the darkness.

ה וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם, וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה; וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם אֶחָד. {פ}

5 And God called the light Day, and the darkness He called Night. And there was evening and there was morning, one day. **{P}**

ו וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמָּיִם, וִיהִי מַבְדִּיל, בֵּין מַיִם לָמָיִם.

6 And God said: 'Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.'

ז וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים, אֶת-הָרָקִיעַ, וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ, וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ; וַיְהִי כֵן.

7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament; and it was so.

ח וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָרָקִיעַ, שָׁמָיִם; וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם שֵׁנִי. {פ}

8 And God called the firmament Heaven. And there was evening and there was morning, a second day. **{P}**

ט וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל-מָקוֹם אֶחָד, וְתֵרָאֶה, הַיַּבָּשָׁה; וַיְהִי כֵן.

9 And God said: 'Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear.' And it was so.

י וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לַיַּבָּשָׁה אֶרֶץ, וּלְמִקְוֵה הַמַּיִם קָרָא יַמִּים; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

10 And God called the dry land Earth, and the gathering together of the waters called He Seas; and God saw that it was good.

יא וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע, עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינוֹ, אֲשֶׁר זַרְעוֹ-בוֹ עַל-הָאָרֶץ; וַיְהִי-כֵן.

11 And God said: 'Let the earth put forth grass, herb yielding seed, and fruit-tree bearing fruit after its kind, wherein is the seed thereof, upon the earth.' And it was so.

יב וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע, לְמִינֵהוּ, וְעֵץ עֹשֶׂה-פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעוֹ בוֹ, לְמִינֵהוּ; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

12 And the earth brought forth grass, herb yielding seed after its kind, and tree bearing fruit, wherein is the seed thereof, after its kind; and God saw that it was good.

יג וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם שְׁלִישִׁי. {פ}

13 And there was evening and there was morning, a third day. **{P}**

יד וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם, לְהַבְדִּיל, בֵּין הַיּוֹם וּבֵין הַלָּיְלָה; וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמוֹעֲדִים, וּלְיָמִים וְשָׁנִים.

14 And God said: 'Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years;

טו וְהָיוּ לִמְאוֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם, לְהָאִיר עַל-הָאָרֶץ; וַיְהִי כֵן.

15 and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth.' And it was so.

טז וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים, אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים: אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל, לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם, וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה, וְאֵת הַכּוֹכָבִים.

16 And God made the two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night; and the stars.

יז וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים, בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם, לְהָאִיר, עַל-הָאָרֶץ.

17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

יח וְלִמְשֹׁל, בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה, וּלְהַבְדִּיל, בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

18 and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness; and God saw that it was good.

יט וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם רְבִיעִי. {פ}

19 And there was evening and there was morning, a fourth day. **{P}**

তাওরাতের সাথে সৃষ্টিতত্ত্বের এই সাদৃশ্যতা খুবই স্বাভাবিক,ইহুদীরা যখন আল্লাহর রাসূল(সাঃ) কে এ ব্যপারে প্রশ্ন করছিল,তখন তারা তাদের কিতাবের সাথে সাদৃশ্যতা পেয়ে সত্যতার স্বীকৃতি দিচ্ছিল। আমরা বিকৃত তাওরাতেও দেখতে পাচ্ছি যে , আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির পরই আলো আধারের সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তীতে বুধবার(চতুর্থদিনে) আবারো দিনরাত্রিকে সৃষ্টি করেন। এটা দিবালোককে সূর্যের থেকে স্বাধীন সাব্যস্ত করে।আল্লাহ আলো আধার, দিন রাত্রি আসমানে সূর্যের সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করেছিলেন। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

আসমানে প্রভাতের(দিবালোকের শুরু) গোধূলির আলো আল্লাহর স্বতন্ত্র সৃষ্টি। বিষয়টা পর্যবেক্ষনযোগ্য।প্রত্যুষের আলোকপ্রভা পুরা আকাশের হোরাইজনে বিস্তৃত থাকে। শুধু পূর্বেই না পশ্চিম দিকের দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত সেটা লক্ষ্য করা যায়,যদিও এ অবস্থার প্রায় আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর সূর্য উদিত হয়।দিবালোকের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করা যায় সূর্যগ্রহনের সময় এবং ঘন মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিমুখর দিনে। সূর্য সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে, এমনকি আসমানের যে অংশে সূর্যের অবস্থান, সেখানের সাথে বিপরীত দিকের আলোকজ্জলতা একই রকমের থাকে।এটা প্রমান করে দিবালোকের স্বতন্ত্র আলো সূর্যের চেয়ে অধিক বিস্তৃত। সূর্য তো সামান্য মেঘের আড়ালেই ঢাকা পড়ে যায়। অধিকন্তু সূর্যের আলো লোকাল।এরকম অনেক প্রমান আছে যে সূর্যের ঠিক নিচের মেঘের উপর সার্কুলার হটস্পট দেখা যায়(এসব নিয়ে 'জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিতে' আলোচনা গত হয়েছে)। সূর্যের ন্যায় চাঁদও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আলোসহ হারিয়ে যায়।তখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে চাদের সামান্য আলোও মেঘের আশপাশ থেকে দেখা দেখা যায় না।যেন চাঁদ ওঠেই নি। পূর্নিমার চাঁদের আলোকেও মেঘলা আকাশ ঢেকে দিয়ে অন্ধকার করে দেয়,তখন অন্ধকার ছাড়া কিছুই থাকেনা কারন রাত্রির আবরন সর্বত্র বিরাজ করে কিন্তু দিনের বেলায় ঘন মেঘের আড়ালে প্রখর সূর্য ঢাকা পড়লেও দিবসের আলো রাত্রির ন্যায় অন্ধকার হতে দেয় না,নূন্যতম গোধূলি/সুবহে সাদিকের ন্যায় আলো টিকে থাকে। সূর্যকে আল্লাহ মূলত হিসাবের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দিন সৃষ্টি এর কাজ নয়, তবে দিবালোক আরো প্রখর এবং উজ্জ্বল করে সূর্যরশ্মি। আল্লাহ বলেনঃ

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ(৬:৯৬)

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ এ সবকিছু আল্লাহ্ই করে থাকেন যিনি হচ্ছেন এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছ? সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কারও ইবাদত করার কারণ কি? আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই। যেমন তিনি অত্র সূরার শুরুতেই বলেছেনঃ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ অর্থাৎ "তিনিই অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন।" (৬ঃ ১) অর্থাৎ তিনি দিনের আলোকের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারকেও বের করেছেন, আবার তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনের আলোকে বের করেছেন যা সারা প্রান্তকে উজ্জ্বলময় করে দিয়েছে। রাত্রি শেষে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং উজ্জ্বল দিন প্রকাশিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ- অর্থাৎ "রাত্রি দিনকে ঢেকে ফেলে।" (৭ঃ ৫৪) এইভাবে মহান আল্লাহ্ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলো সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্যেই তিনি বলেন যে, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে ফেড়ে বের করে থাকেন। রাতকে তিনি বিশ্রামকাল করেছেন যেন সমুদয় জিনিস তাতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে। যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَالضُّحٰى - وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى- অর্থাৎ "কসম দিনের আলোকের এবং রাত্রির, যখন তা প্রশান্ত হয়।" (৯৩ঃ ১-২) তিনি আরও বলেছেনঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বিভিন্ন স্থানে দিন ও রাত্রির শপথ করেছেন, যেগুলো দিবারাত্রিকে স্বতন্ত্র সৃষ্টি হিসেবে নির্দেশ করে। আল্লাহ বলেনঃ

وَالضُّحَى

শপথ পূর্বাহ্ণের,

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়(৯৩:১-২),

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
শপথ নিশাবসান ও
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
প্রভাত আগমন কালের(৮১:১৭-১৮)
وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ
শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়,
وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়

(৭৪:৩৩-৩৪)

আল্লাহ চাইলেই এই দিন বা রাত্রিকে কিয়ামত পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারেন। রাতকে এরূপ কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করলে নরওয়ে, সাইবেরিয়ার মত মধ্যরাতে সূর্য দেখার ঘটনা ঘটতে পারে। তেমনি দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত লম্বা করলে হয় চাঁদ সূর্যকে নিয়মিত আবর্তিত হতে দেখা যাবে কিন্তু সূর্যাস্তের পরেও গোধূলির আলো বিদ্যমান থাকবে। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ

বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে ? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না ?

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর(২৮:৭১-৭৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা একটু চিন্তা করে দেখো তো, তিনি তোমাদের কোন চেষ্টা তদবীর ছাড়াই বরাবরই দিবস ও রজনীকে আনয়ন করতে রয়েছেন। যদি শুধু রাত্রিই থেকে যায় তবে তোমরা কঠিন অসুবিধার মধ্যে পড়ে যাবে, তোমাদের কাজ-কর্ম হয়ে যাবে বন্ধ এবং তোমাদের জীবন যাপন করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এমতাবস্থায় তোমরা এমন কাউকেও পাবে কি, যে তোমাদের জন্যে দিন আনয়ন করতে পারে? যার ফলে তোমরা আলোকের মধ্যে চলতে পার? অতঃপর নিজেদের কাজ-কর্মে লেগে যেতে পার? বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তোমরা আল্লাহর কথায় মোটেই কর্ণপাত কর না। অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যদি শুধু দিনই রেখে দেন তাহলেও তোমাদের জীবন তিক্ত ও দুঃখময় হয়ে যাবে। তোমরা হয়ে পড়বে ক্লান্ত, শ্রান্ত। বিশ্রামের কোন সুযোগ তোমরা পাবে না। এমতাবস্থায় এমন কেউ আছে কি, যে তোমাদেরকে রাত্রি এনে দিতে পারে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার? কিন্তু তোমাদের চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর দয়াপূর্ণ কাজগুলো দেখে কিছুই চিন্তা ভাবনা কর না, এটা বড়ই দুঃখপূর্ণ ব্যাপারই বটে।

এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই মেহেরবানী যে, তিনি তোমাদের জন্যে দিবস ও রজনী দু'টোরই ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনে কাজ-কর্মে ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতে পার। আর যিনি তোমাদের প্রকৃত মালিক, যিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আমাদের নিচেও আরো ছয়টি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ছয়টি সমতলে বিস্তৃত স্তর আছে। প্রত্যেকটিতে মাখলুক রয়েছে। সেখানে হয়ত চাঁদ সূর্য নেই, যেহেতু এমন কোন দলিল পাওয়া যায় না যেটা চাঁদ সূর্যকে একাধিক বলে। হয়ত নিচের যমীনগুলোতেও দিবারাত্রির আবর্তন ঘটে অথবা সেখানে আল্লাহ স্থায়ী গোধূলির আলোর(twilight) ব্যবস্থা রেখেছেন। ওয়া আল্লাহু আ'লাম।

আজকের সৌরজগত ভিত্তিক বিবর্তনবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদেরকে শেখায় দিনরাত্রি পৃথিবীর ঘূর্ননের কারনে সূর্যের আড়ালে চলে যাবার দরুন ঘটছে। এ কারনে অনেক মুসলিম অপবিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিকতা দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করে। কিন্তু তাদের প্রশ্নের জবাব সেইভাবেই সায়েন্টিফিক স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রেখে দেওয়া হয়। কোন এক মুসলিম প্রশ্ন করে,***'কেন কুরআনে রাতকে পর্দার ন্যায়***

টানার কথা আল্লাহ বলেছেন , যেখানে রাত্রিকে পৃথিবীর ঘূর্ননের দরুন হওয়া স্পেসের অন্ধকার বলা হয়?'
সেখানে অনেক মুসলিম বিচিত্র সায়েন্টিফিক উত্তর দিয়েছে। আপনারা দেখতে ভুলবেন না।

https://www.quora.com/Why-does-Quran-say-that-night-is-a-veil-pulled-over-day-by-Allah-when-night-is-just-the-darkness-of-space-as-seen-from-the-earth-due-its-rotation

আমি জানি আজকের এই পর্ব এমন একটি বিষয় নিয়ে লেখা যেটার সপক্ষে স্পষ্টভাবে সুদ্দি রহিমাহুল্লাহসহ আরো দু একজন আলিম/মুফাসসীরিন ছাড়া আর কেউ তেমন কিছু বলেন নি। কিন্তু আমাদের কাছে কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল আছে যা উপরে উল্লেখ করেছি। আমরা ঐ সমস্ত সম্মানিত আলিমদের ব্যপারে সচেতন যারা কিছু বিষয়ে অনুমান নির্ভর সামান্য ভিন্নমত পোষন করেছেন। এসব তথ্য সম্পূর্ন গায়েবের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, এর ব্যপারে আল্লাহই উত্তম জানেন। আল্লাহ যা আমাদের জানিয়েছেন এখানে তাই প্রকাশের চেষ্টা মাত্র। তাই এ বিষয়ে যেকোনরূপ ভুল ত্রুটির জন্য আল্লাহ আযযা ওয়াযালের নিকট বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করি। আফসোসের বিষয় হচ্ছে এ যুগের মানুষ আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন এবং সমস্ত আলামের মালিক সেই মহান প্রতিপালকের বলা সত্যিকারে সৃষ্টিতত্ত্বকে অবিশ্বাস করে। এ অবস্থা আজ অধিকাংশই কালেমা পড়া মুসলিমদেরও অবস্থা। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত দলিলভিত্তিক আর্টিকেল সিরিজ ব্যাধিহীন পবিত্র হৃদয়ের মুত্তাকী বান্দার জ্ঞানের জন্য উপকারী যারা রহমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্টি নিয়ে তাদাব্বুর করে। কলুষিত হৃদয়ের বান্দাদের জন্য এটা ক্ষতির কারনও হতে পারে যেহেতু তারা অপবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে এবং কাফিরদের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এখন হক্ক বিষয়ও ফিতনার কারন হতে পারে। কুরআন-সুন্নাহর কস্মোলজিক্যাল বিষয় এ পর্যন্ত অনেক মুসলিমের(ফাসিক/মুনাফিকের) এ্যাপোস্টেসির কারন হয়ে দাড়িয়েছে। এরকম অজস্র মুর্তাদ ঘুরছে যারা শুধুমাত্র অপবিজ্ঞানের সাথে সত্যিকারের জ্ঞানের রশ্মি কুরআনের বৈসাদৃশ্যতা দেখে কাফির হয়ে গেছে। এজন্য এসব আমভাবে যার তার কাছে প্রচার এবং এর কোন কিছুকে রেফারেন্স করে অহেতুক তর্ক বিতর্ক এড়ানোর জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করি।

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

[চলবে ইনশাআল্লাহ...]

বিগত পর্বগুলোর লিংকঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

[মেঘ-বৃষ্টি]

পর্ব-১১

পানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার এক মৌলিক সৃষ্টি। সৃষ্টি জগতের মূল হচ্ছে পানি। আল্লাহ বলেনঃ

"....এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।..."[২১:৩০]

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার মন খুব খুশী হয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আপনি আমাদেরকে সমস্ত জিনিসের মূল সম্পর্কে অবহিত করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আবূ হুরাইরা (রাঃ)! জেনে রেখো যে, সমস্ত জিনিস পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। [২]

১. এটা ইবনু আবি হা'তিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যখন আমি অপনাকে দেখি তখন আমার প্রাণ খুশী হয় ও চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আপনি আমাদেরকে প্রত্যেক জিনিস (এর মূল) সম্পর্কে খবর দিন।' তিনি বললেনঃ "প্রত্যেক জিনিস পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

আমাদের যমীনের তলদেশে, আসমানে সর্বত্রই পানির অতল সমুদ্র। এই পানির মধ্যে আল্লাহ বৈচিত্র রেখেছেন। সমস্ত পানিই একরকম নয়। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।

আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম(২৫:৫৪)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ

অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে।(৩২:৮)

শুধু মানুষই নয়, গোটা বিশ্বজগতের পূর্বে শুধু পানিই ছিল। অতঃপর আল্লাহ আসমান ও যমীনের মাঝে শূন্যস্থান তৈরি করেন, যমীনের নিচেও পানি, আসমানের উপরেও জলধি। আসমানের উপরিস্থিত পানি বিশেষ পবিত্র পানি যা বৃষ্টির পানির উৎস। এই পানির দ্বারা আল্লাহ যমীনে ফুল ফসল উদগত করেন।পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ মানুষকে সপ্তআসমানের উপরের সমুদ্র থেকে বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মৃতদেহ পুনর্গঠিত হবে। হাউজে কাওসারের পানিও আল্লাহর বৈচিত্র্যময় বিশেষ সৃষ্টি, যা কেউ পান করলে ২য় বার পিপাসার্ত হবে না। জাহান্নামীদের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্তদেরকে বিশেষ পানিতে নিক্ষেপ করা হবে যা তাদের ক্ষতবিক্ষত বিদগ্ধ দেহকে ঐরূপে পুনর্গঠিত করবে যেমনটা নদীর তীরের ঘাস গজিয়ে ওঠে।

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحيا أو الحياة (شك من أحد رجال السند) فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترأنها تخرج صفراء ملتوية أخرجه البخاري في 2 كتاب الإيمان: 15 باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ.) শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়?

(বুখারী পর্ব ২ : /১৫ হাঃ ২২, মুসলিম ১/৮২ হাঃ ১৮৪)
আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং ১১৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সুতরাং পানি আল্লাহর এক অনন্য মৌলিক সৃষ্টি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত স্বরূপ মেঘ-বৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকারকারী আধুনিক অপবিজ্ঞান মেঘ বৃষ্টির ব্যপারে এমন ব্যাখ্যা দেয় যাতে করে মনে হয় এই বৃষ্টি একদমই ন্যাচারাল ফেনোমেনা অথচ মেঘ-বৃষ্টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার একান্ত ইচ্ছাধীন। এছাড়াও অপবিজ্ঞানীরা মেঘবৃষ্টির ব্যাখ্যা হিসেবে 'পানিচক্র'কে দ্বার করিয়েছে। এটা একটা self sustaining cycle যেখানে ডিভাইন ডমিনিয়নের কোন প্রয়োজন নেই। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মেঘ-বৃষ্টির ব্যপারে একদমই ভিন্ন কিছু বলেছেন। এই বাস্তব জগতে বৃষ্টি আদৌ কোন ন্যাচারাল ফেনোমেনা নয়, এমন নয় যে একা একাই ঘটে। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নিজ অনুগ্রহে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষন করেন। অর্থাৎ এর ভেতর অলৌকিকতা রয়েছে। রহমান আল্লাহ বলেনঃ
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا
আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,
(৮০:২৫)

সত্যিই এতে আশ্চর্যের এবং অলৌকিকতার বিষয় আছে। কারন আল্লাহ সরাসরি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষন করেন। এমনটা না যে মেঘই পানির উৎস বা মেঘই পানি আকারে নেমে আসে,যেমনটা

অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে দেখা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে বলেছেন তিনি আসমান থেকে বর্ষণ করেন। মেঘ হচ্ছে যমীনের উপর পানিবাহী উট। এরা জমাট তরঙ্গায়িত আসমানি সমুদ্র থেকে ঝরা পানিকে ধারন করে আল্লাহর নির্দেশিত অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ এক সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাদের উপর মেঘরাশি প্রকাশিত হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের প্রশ্ন করেন : তোমরা জান এটা কি? তারা বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এটা হল যমিনের পানিবাহী উট। আল্লাহ তা'আলা একে এমন জাতির দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা তাঁর কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না এবং তাঁর কাছে মুনাজাতও করে না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : তোমাদের উপরে কি আছে তা জান? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বলেনঃ এটা হল সুউচ্চ আকাশ , সুরক্ষিত ছাদ এবং আটকানো তরঙ্গ।

[জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩২৯৮]

বৃষ্টিধারনকারী আসমানের ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

শপথ আসমানের যা ধারন করে বৃষ্টি (৮৬:১১)

Hennessy Commercial[৫]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই পানিপূর্ন আসমানি ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেন।
আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে

মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে(২:১৬৪)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান(২:২২)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুস্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান(১৮:৪৫)

এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ বারি বর্ষণের ক্ষেত্রে أَنزَلَ يُنَزِّلُ نَزَّلَ أَنزَلْنَا, يُنَزِّلُ প্রভৃতি অর্থাৎ 'নাযিল' শব্দ ব্যবহার করেন। নাযিল শব্দটি একইভাবে কুরআন ও হাদীদের(লোহা) ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন। এর দ্বারা এমন কিছুকে বোঝায় যেটা অপার্থিব(extraterrestrial) বা পৃথিবীর বাইরে থেকে পাঠানো হয়। বৃষ্টির ক্ষেত্রে এ শব্দের ব্যবহারের দ্বারা স্পষ্ট হয়, এই পানি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার বিশেষ রহমত,যা তিনি যমীনের উর্দ্ধলোক আসমান থেকে প্রেরণ করেন। সুতরাং এই বিশেষ পবিত্র পানির ভান্ডার আমাদের নাগালের মধ্যে দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমানেই তা অবতরণ করি।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভান্ডার নেই(১৫:২১-২২)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর বৃষ্টি বরাবর বর্ষিত হতেই আছে। হাঁ, তবে বন্টন আল্লাহ তাআ'লার হাতে রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। হাকীম ইবনু উয়াইনা (রঃ) হতেও এই উক্তিই বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ "বৃষ্টির সাথে এতো ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হন যাদের সংখ্যা সমস্ত মানবও দানব অপেক্ষা বেশী। তাঁরা বৃষ্টির এক একটি ফোঁটার খেয়াল রাখেন যে, ওটা কোথায় বর্ষিত হচ্ছে এবং তা থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লার ভাণ্ডার হচ্ছে কালাম বা কথা মাত্র। সুতরাং যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেনঃ 'হও, তখন হয়ে যায়'।"[১]

---

১. এ হাদীসটি বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আগনাব। তিনি খুব বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী নন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি মেঘমালাকে বৃষ্টি দ্বারা ভারী করে দিই। তখন তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। এই বাতাসই প্রবাহিত হয়ে গাছপালাকে সিক্ত করে দেয়। ফলে ওগুলিতে পাতা ও কুঁড়ি ফুটে ওঠে।" এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখানে رِيْحٌ لَوَاقِحَ বলা হয়েছে অর্থাৎ এর বিশেষণকে বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর বৃষ্টি শূন্য বায়ুকে বলা হয়েছে رِيْحٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ এর বিশেষণকে একবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টি পূর্ণ বায়ুর বিশেষণকে বহু বচনরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী ফলদায়ক হওয়া। বৃষ্টি বহন কম পক্ষে দু'টি জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়। বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তা আকাশ থেকে পানি উঠিয়ে নেয়, আর মেঘমালাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। এক বায়ু এমন হয় যা যমীনের উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করে। আর এক বায়ু মেঘমালাকে এদিকে ওদিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। আর এক বায়ু ওগুলিকে একত্রিত করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে নেয়। আর এক বায়ু ওগুলিকে পানি দ্বারা ভারী করে দেয়। আর এক বায়ু এমন হয় যে, তা গাছপালা ও বৃক্ষরাজিকে ফলদানকারী হওয়ার যোগ্য করে তোলে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দক্ষিণা বায়ু জান্নাত হতে প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং তাতে জনগণের উপকার লাভ হয়।"[১]

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

বলেছেনঃ “বাতাস সৃষ্টির সাত বছর পরে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে এক বায়ু সৃষ্টি করেছেন যা একটি দরজা দ্বারা বন্ধ করা আছে। ঐ দরজা দ্বারাই তোমাদের কাছে বায়ু পৌঁছে থাকে। যদি ঐ দরজাটি খুলে দেয়া হয় তবে যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিস ওলট পালট হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে ওর নাম হচ্ছে আযইয়াব। তোমরা ওকে দক্ষিণা বায়ু বলে থাকো।”[২]

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ‘আমি তোমাদেরকে তা পান করতে দিই।’ অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর মিষ্টি পানি বর্ষণ করি, যাতে তোমরা তা পান করতে পার এবং অন্য কাজে লাগাতে পার। আমি ইচ্ছা করলে ওকে

১. এ হাদীসটি ইমাম বনুজারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ দুর্বল।
২.এ হাদীসটি ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর আল হুমাইদী (রঃ) তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তিক্ত ও লবণাক্ত করে দিতে পারি। যেমন সূরায়ে ওয়াকিয়ার আয়াতে রয়েছেঃ “তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছো? তোমরাই কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?” আর এক জায়গায় রয়েছেঃ “তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মে উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাকো।”

وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ (ওর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই)। সুফ্ইয়ান সাওয়ারী (রঃ) এর ভাবার্থ করেছেনঃ “তোমরা ওকে আবদ্ধকারী নও।” আর এর ভাবার্থ এও হতে পারে। “তোমরা ওর রক্ষক নও। বরং আমিই তা বর্ষণ করি ও রক্ষা করে থাকি। আমি ইচ্ছা করলে ওটা যমীনে ঢুকিয়ে দিতে পারি। এটা শুধু মাত্র আমার করুণা যে, আমি ওকে বর্ষণ করি, রক্ষা করি, মিষ্ট করি এবং স্বচ্ছ ও নির্মল করি, যেমন তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জন্তু গুলিকে পান করাও। আর তা জমিতে সেচন কর, বাগান তৈরী কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার কর।”

আধুনিক অপবিজ্ঞান আমাদেরকে শেখায় দুনিয়ার যাবতীয় পানির উৎস এই কাল্পনিক মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানো গোলক পৃথিবীই। এখানে পানি নাযিল হবার মত কোন বিষয় ঘটে না, বরং এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কথিত পানির চক্রেরই ফসল, এই বর্ষন প্রক্রিয়ায় কোন অলৌকিকতা বা সৃষ্টিকর্তার করুনার মত কোন বিষয় নেই। এরা আজ নিজেরাই জলীয়বাষ্প তৈরিকারী যন্ত্রের দ্বারা এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৃষ্টি ঘটানোর কাজে সক্ষমতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ তারা তাদের থিওরি এবং প্রায়োগিক কার্যের মাধ্যমে বোঝাতে চায় যে এই বারি বর্ষণ সম্পূর্ন স্রষ্টার কর্তৃত্বহীন প্রাকৃতিক ঘটনা। বস্তুত, কাফিরদের বলা সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মূল বার্তাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আযযা ওয়াযালের অস্তিত্বের বিশ্বাসটিকেই ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া। ওরা রহমানের নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। আল্লাহ বলেনঃ

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।[৯:৩২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বৃষ্টির দ্বারা দুধরনের পানি বর্ষন করেন, একটা হচ্ছে আসমান থেকে সরাসরি রহমতের বারিধারা। আরেকটি হচ্ছে
যমীনের জলাধারগুলো থেকে শুষ্কবায়ুতে টেনে নেওয়া পানি।কিন্তু মূল পানির উৎস আসমানই। আজকের অপবিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে বর্ষণের জন্য অনেক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, এরা ঘন জলীয়বাষ্পকে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে কৃত্রিম বৃষ্টির সৃষ্টি করে বোঝাতে চায়, এই সৃষ্টিজগতের সমস্ত রহস্য তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে। তারা এর দ্বারা বৃষ্টিধারা প্রেরণে রহমান আল্লাহর নিয়ন্ত্রন এবং অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে চায়।নাসার এরকম এক রেইন মেশিন দিয়ে বৃষ্টিপাতের পর উপস্থাপক বলছিল,'এটা অনেকটা সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার অনুরূপ(playing God)'[১]। বস্তুত তারা যা করে সেটা মূল বারিধারার উৎস নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেন। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে একাধিক আয়াতে আসমান থেকে পানি বর্ষণের কথা বলেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا

তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি(২৫:৪৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেনঃ

হযরত খালিদ ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একদা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় জনগণ পানি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। তখন আমি বলি, এক প্রকার পানি হলো ঐ পানি যা আকাশ হতে বর্ষিত হয়। আর এক প্রকার পানি হলো ঐ পানি যা সমুদ্র হতে উত্থিত মেঘমালা পান করিয়ে থাকে। সমুদ্রের পানি উদ্ভিদ জন্মায় না, বরং আকাশ হতে বর্ষিত পানি উদ্ভিদের জন্ম দেয়।"[৩]

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষণ করেন তখনই যমীনে উদ্ভিদের জন্ম হয় অথবা সমুদ্রে মণিমুক্তা জন্ম হয়। অন্য কেউ বলেন যে, স্থলে গম ও সমুদ্রে মুক্তার সৃষ্টি হয়।

১. এটা মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সরাসরি আসমান থেকে পানি নাযিল করেন। এখানে কোনরূপ পার্স্পেক্টিভ বোঝানো হয় নি,যেমনটা আধুনিক অপবিজ্ঞানে বিশ্বাসী মুসলিমরা অপব্যাখ্যা করে থাকে। আল্লাহ আসমান থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন সেটা যমীনের জন্য রহমতস্বরূপ। এই পানিতে রহমান বিশেষ কিছু দিয়ে প্রেরণ করেন যা শুষ্কমৃতভূমিকে সঞ্জীবিত করে, এর দ্বারাই সকল প্রকার ফসল,গাছপালা জন্মায়। সাধারণ পানিতে হয় না।

অন্যান্য আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ একই কথা বলেছেন, অর্থাৎ তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেনঃ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি(৩১:১০)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি(২০:৫৩)

তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন।(১৩:১৭)

"...আর হে আমার কওম! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি ধারা প্রেরণ করবেন..."(১১:৫২)

পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম(১০:২৪)

আসমানি পানি পবিত্র,এতে আল্লাহ বিশেষ সঞ্জীবনীশক্তি দিয়েছেন যার দ্বারা আল্লাহ মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন, বৃক্ষ,তৃণলতা,ফল ফসল উদগত করেন। আসমানি পবিত্র পানি ছাড়া ফুল ফসল কিছুই উদগত হয় না, বস্তুত সেদিক থেকে ভাবলে সবকিছুর উপরে আল্লাহই সমস্ত প্রানীজগতের জন্য আসমান থেকেই রিযিক নাযিল করেন। এই বৃষ্টির পবিত্র ধারাই রিযক, যা দ্বারা আল্লাহ যমীনে সমস্ত ফল-ফসল উদগত করেন। আল্লাহ বলেনঃ

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে(৪৫:৫)

। প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করে থাকেন। রিযক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর দ্বারাই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে। শুষ্কভূমি সিক্ত হয় এবং তা হতে নানা প্রকারের শস্য উৎপাদিত হয়। দিবস ও রজনীতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা হাওয়া এবং পুবালী হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুষ্ক ও সিক্ত হাওয়া তিনিই প্রবাহিত করেন। কোন কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু মেঘকে পানিপূর্ণ করে। কোন কোন বাতাস রূহের খোরাক হয় এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যেও প্রবাহিত হয়ে থাকে।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন(১৪:৩২)

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলছেন যা তাঁর মাখলূকাতের উপর রয়েছে। আকাশকে তিনি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে রেখেছেন। যমীনকে উত্তম বিছানারূপে বিছিয়ে রেখেছেন। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীন থেকে সুস্বাদু ফল মূল, ফসলের ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচা তৈরী করে দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে নৌকাসমূহ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় চলাফেরা করছে এবং মানুষকে নদীর এক পার থেকে আর এক পারে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করছে। তারা এক জায়গার মাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে বেশ লাভবানহচ্ছে। আর এইভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। নদীগুলিকেও তিনি তাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তারা এর পানি নিজেরা পান করছে, অপরকে পান করাচ্ছে, জমিতে সেচন করছে, গোসল করছে, কাপড় চোপড় ধৌত করছে এবং এই ধরনের বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ -

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী। অর্থাৎ তারা দিন রাত্রি অবিরাম গতিতে চলতে রয়েছে, অথচ ক্লান্ত হচ্ছে না। আল্লাহ তাআ'লা আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।" (৩২ঃ ৪০)

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর(১৬:১০)

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে(১৬:৬৫)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ-সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ(৩৫:২৭)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়।(৫০:৯)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ট সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার(২২:৬৩)

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তাঁর আরও নিদর্শনঃ তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(৩০:২৪)

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ
বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্যবিচ্যুত সম্প্রদায়(২৭:৬০)

অপবিজ্ঞানের পানিচক্রের বৃষ্টিপাত প্রক্রিয়ায় কোন অলৌকিকতা কিংবা কোনরূপ তাৎপর্য নেই। বরং তারা সেটার তাৎপর্যহীনতা বোঝাতে নিজেরাই কৃত্রিমভাবে বৃষ্টির ব্যবস্থা করে, এর দ্বারা বোঝাতে চায় এতে কোনরূপ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব(Divine Intervention) নেই বরং এটা একদমই সাধারণ একটি ঘটনা। আমরাও বৃষ্টি ঘটাতে পারি! অথচ বাস্তবিকভাবে এই বর্ষণ প্রক্রিয়ায় ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন এবং উপদেশ নিহিত আছে।আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে(৬:৯৯)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ রয়েছে(৩৯ঃ২১)

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

অর্থাৎ "আমি আসমান হতে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি।"(২৫ ঃ ৪৮) এই পানি যমীন পান করে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর প্রয়োজন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায়। যে পানি যমীনের মালিন্যে লবণাক্ত হয়ে যায় তা লবণাক্তই থাকে। অনুরূপভাবে আকাশের পানি বরফের আকারে পাহাড়ের উপর জমে যায় যাকে পাহাড় শোষণ করে নেয়। অতঃপর ওর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়। প্রস্রবণ ও ঝরণার পানি জমিতে যায় যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রঙ এর, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং পরিশেষে কেটে নেয়া হয়। এতে কি জ্ঞানীদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ নেই? তারা এটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল ঐ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই ঐ লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুৎসতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে থাকে। উত্তম ঐ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেত্রের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ـ

অর্থাৎ "তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ এটা পানির ন্যায় যা বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (১৮ ঃ ৪৫)

আল্লাহ প্রদত্ত আসমানের রহমতের বৃষ্টিতে চিন্তাশীলদের জন্য পুনরুত্থান দিবসের বার্তা নিহিত আছে। যেভাবে আল্লাহ মৃত মৃত্তিকাকে সঞ্জীবিত করেন, সেভাবেই আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে সকল পচে গলে মাটিতে মিশে যাওয়া মৃতদেহগুলোকে আবারো পুনরায় গঠন করবেন। এজন্য আমাদের চোখের সামনে ঘটা বর্ষণের দৃশ্য গভীর তাৎপর্য বহন করে।

আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনি ভাবে মৃতদেরকে বের করব-যাতে তোমরা চিন্তা কর(৭:৫৭)

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ "যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে।" অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা যমীনের নিকটবর্তী হয়। ইরশাদ

হচ্ছে– سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ অর্থাৎ ঐ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি এবং ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করে ওকে পরিতৃপ্ত করি। যেমন তিনি বলেনঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا....

অর্থাৎ "তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে নির্জীব যমীন, আমি ওকে সঞ্জীবিত করেছি।" (৩৬ঃ ৩৩) এজন্যেই ইরশাদ হচ্ছে–

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ যেমন আমি যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর সঞ্জীবিত করি, তদ্রূপ দেহকেও মাটি হয়ে যাওয়ার পর কিয়ামতের দিন জীবিত করবো। আল্লাহ্ পাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টি বর্ষিত হতেই থাকবে এবং মানবদেহ কবর থেকে এমনিভাবে উঠতে থাকবে যেমনিভাবে ভূমিতে জীব অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের আয়াত কুরআন কারীমে বহু রয়েছে যে, তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করবেন। এগুলো তিনি কিয়ামত সংঘটনের দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম(৪১:৩৯)

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ
বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে(৫০:১১)

পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমানের সমুদ্র থেকে পবিত্র বৃষ্টি বর্ষণ করবেন,এখন বৃষ্টির দ্বারা যেভাবে কোন মৃত মৃত্তিকাকে আল্লাহ সবুজ তৃণভূমিতে পরিণত করেন তেমনিভাবে ঐদিনও আসমানের বিশেষ পানি দ্বারা বর্ষণের মাধ্যমে মাটিতে পচে মিশে যাওয়া মানুষের অস্থিমজ্জা ও মাংসগুলোকে রিজেনারেট করবেন এবং প্রাণসঞ্চার করবেন। প্রাচীন আরবের কাফিররা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও এই পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করত না। আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে(২২:৫)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون قال: أربعون يوما قال: أبيت قال: أربعون شهرا قال: أبيت قال: أربعون سنة قال: أبيت قال: ثم ينزل الله من السماء ماء، فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফূৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। [আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)]-এর এক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন শিরদাঁড়ার হাড় ছাড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। ক্বিয়ামাতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

[বুখারী পর্ব ৬৫ সূরা (৭৮) আন্-নাবা অধ্যায় হাদীস নং ৪৯৩৫; মুসলিম ২৯৫৫)
আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং ১৮৬৪
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় বর্নিত হয়েছে:

দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমত, এর দ্বারা পাহাড়ী মেষ সংক্রান্ত হাদীসে উল্লেখিত ঐ সমুদ্রই বুঝানো হয়েছে, যা আরশের নিচে অবস্থিত এবং যা সপ্ত আকাশের উপরে রয়েছে এবং যার নিচ ও উপরের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান, যতটুকু এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের। পুনরুত্থানের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এ সমুদ্র থেকেই বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাতে দেহসমূহ কবর থেকে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। রবী ইব্ন আনাস এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখছেন যে আল্লাহ আসমানের সমুদ্র থেকেই বর্ষণ করেন। কাফিরদের পানিচক্রই বৃষ্টিপাত প্রক্রিয়া বা উৎস নয়। কাফিরদের বর্ণিত আসমান যমীনের বর্ণনানুযায়ী আসমান মানে অনন্ত ভ্যাকুয়াম স্পেস, আর যমীন হচ্ছে সেই ভ্যাকুয়ামে উড়ে চলা একখণ্ড গোলক, এই কাল্পনিক গোলকধাঁধায় পানির উৎসের সংকট আছে। বৃষ্টির পানি কোন এক্সটারনাল সোর্স থেকে আসে না, তাদের কল্পনায়ও এটা সম্ভব না, কারন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরেই ভ্যাকুয়াম স্পেস, অন্যদিকে মাটির নিচেও পানির রিজার্ভ সীমিত। কাল্পনিক কয়েক স্তর নিচেই আগুন আর লাভায় পরিপূর্ণ।

এই কাল্পনিক জগতের পানি চক্র হচ্ছে সমুদ্র, নদী পুকুরের পানি সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ,অতঃপর বৃষ্টি। অর্থাৎ এটা একটা সেল্ফ সাস্টেইনিং সাইকেল। তাদের এই সাইক্লিক্যাল চিন্তা এসেছে আরো সুউচ্চ কুফরি আকিদার থেকে। সেটা এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়।

সত্যিকারের বিশ্বব্যবস্থায় করুণাময় মহান আল্লাহ স্বয়ং বৃষ্টিপাত ঘটান। আসমান থেকে আল্লাহ পরিমাণ বিহীন বৃষ্টি বর্ষণ করেন না,এমনও হয় না অপ্রয়োজনীয় বৃষ্টি কোথাও বর্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেক বৃষ্টির ফোঁটাও আল্লাহর হিসাবে রয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ
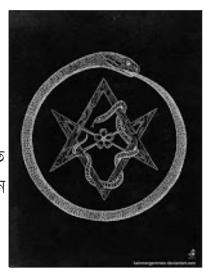
وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

এবং যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। আতঃপর তদ্দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। তোমরা এমনিভাবে উত্থিত হবে।(৪৩:১১)

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম(২৩:১৮)

এমনকি প্রত্যেক ফোঁটা বৃষ্টি আল্লাহর নির্দেশমতো যমীনে পৌছে দেওয়ার জন্য সে পরিমাণ ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হয়।

উকবা (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম উমার (রাঃ) বলেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) জানাযার জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় নবী (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে জিবরাঈল (আঃ)! আমি মেঘের বিষয়টি অবগত হতে পছন্দ করি।" তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ "আপনি মেঘের উপর নিযুক্ত এই ফেরেশতাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।" এ কথা শুনে মেঘের উপর নিযুক্ত ফেরেশতা বললেন, আমাদের কাছে মোহরকৃত একটা নির্দেশনামা আসে। তাতে নির্দেশ দেয়া থাকে– "অমুক অমুক শহরে পানি পান করাও। অমুক অমুক জায়গায় পানির ফোঁটা পৌছিয়ে দাও।"[১]

" With every raindrop there is an angel who descends with it until he places it where Allah has ordered "

[At Tabaree]

বৃষ্টি কোন অঞ্চলে খেয়ালখুশি মত হয় না(যেটা অপবিজ্ঞান আমাদেরকে বলে,কারন তাদের মতে বৃষ্টি ঐশ্বরিক কর্তৃত্বহীন প্রাকৃতিক ঘটনা), বরং সরাসরি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ঘটে। নিম্নোলিখিত হাদিসে সেটা সুস্পষ্টঃ

وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة، اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك ؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها، فقال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه . رواه مسلم

উক্ত রাবী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা করে নিল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।''

ফুটনোটঃ
(মুসলিম ২৯৮৪, আহমাদ ৭৮৮১)
রিয়াদুস সলেহিন, হাদিস নং ৫৬৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস।

সত্যিকারের বিশ্বব্যবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা Vaulted sky firmament এর উপরিস্থিত পানির সমুদ্র থেকে পবিত্র পানি নাযিল করেন। বলা যায় এটাই সকল পানির একমাত্র উৎস। (হাদিস অনুযায়ী)যমীনসমূহ পানির উপর ভাসমান দ্বীপ সদৃশ, অর্থাৎ উপরেও পানির ভাণ্ডার, নিচেও পানির অফুরন্ত ভাণ্ডার। শয়তান সবসময় অভাব, সংকীর্নতার ভয় দেয়, অথচ আল্লাহর করুনা অফুরন্ত এবং প্রাচুর্যপূর্ণ। আল্লাহ বলেনঃ

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।[২:২৬৮]

নিঃসন্দেহে শয়তান কাফিরদেরকে দিয়ে এমন সৃষ্টিতত্ত্বকে বর্ণনা করায় যেটা অভব ও হতাশাপূর্ণ। এমন কখনো হবে না যে ভূপৃষ্ঠের পানি শেষ হয়ে যাবে,যদি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা চান। বস্তুত সমস্তকিছু আল্লাহর করুণার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ
বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা?(৬৭:৩০)

নিশ্চয়ই কফিররা ভীষণ অকৃতজ্ঞ। এরা বৃষ্টিধারার ব্যপারে কোনরূপ অলৌকিকতাকে আরোপ করতে পছন্দ করে না। বরং এর ব্যপারে কুফরি বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এরই ধারাবাহিকতায় এরা নিষ্প্রাণ বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করে দেখিয়ে মানুষকে বোঝাতে চায় 'এখানে সৃষ্টিকর্তার কোন কর্তৃত্ব নেই, আমরাও পারি,আমরাও বৃষ্টিকে নামিয়ে আনতে সক্ষম(playing God)'। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ
তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি?
أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি বর্ষন করি?

لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৫৬:৬৮-৭০)

মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেনঃ দেখো, এটা বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাভুক্ত। কেউ কি মেঘ হতে পানি বর্ষাবার ক্ষমতা রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে মিষ্ট ও তিক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই তোমরা পেয়ে থাকো। এই পানিতে তোমরা গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, বাগানে সেচন করে থাকো এবং জীব-জন্তুকে পান করিয়ে থাকো। তবে তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না ওটাই কি তোমাদের জন্যে উচিত? রাসূলুল্লাহ (সঃ) পানি পান করার পর বলতেনঃ

الحمد لله الذى سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا

অর্থাৎ "ঐ আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা যিনি স্বীয় রহমতের গুণে আমাদেরকে সুমিষ্ট ও উত্তম পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের পাপের কারণে এই পানিকে লবণাক্ত এবং তিক্ত করেননি।"

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং সুস্পষ্ট দেখছেন শয়তান তার অনুসারীদের রেইনমেশিন দ্বারা বৃষ্টিপাত দেখানোর দ্বারা আল্লাহর সাথে কুফর করছে। এমনকি এও মুখে বলছে "It is like playing God![১]" যেখানে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন, এই বারিধারা মেঘ থেকে কি মানুষ নামিয়ে আনে নাকি আল্লাহ, সেখানে তারা দেখিয়েছে তারাও নামাতে সক্ষম। তবে ওরা যত চেষ্টাই করুক না কেন, এই বৃষ্টি আর আল্লাহর ভাণ্ডারের পবিত্র বারি এক নয়, কাফিরদের অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন দ্বারা তৈরি জলীয়বাষ্প মৃতভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ এটা শুধুই নিষ্প্রাণ তাৎপর্যহীন পানির নিম্নমুখী ধারা।

আল্লাহ আযযা ওয়াযাল আসমান থেকে যে পানি ডিসেন্ড করেন সেটাকে অস্বীকার করতে দেখা যায় এ যুগের অধিকাংশ মুসলিমদেরকে কারন এরা কাফিরদের আকিদা বা বিশ্বাসব্যবস্থাকে আপন করে নিয়েছে, শার'ঈ দলিল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এরা কাফিরদের দ্বারা শোষিত পৃথিবীর সাথে তাল মেলাতে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত গুলোর অপব্যাখ্যা করেছে যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে আসমান থেকে পানি নাযিল করবার কথা বলেছেন। আমরা এসংক্রান্ত অনেকগুলো আয়াত উপরে উল্লেখ করেছি। বিভ্রান্ত মুসলিমরা অপবিজ্ঞানের সাথে মেলাতে গিয়ে বলে আল্লাহর ওই আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে "উপরের দিক দিয়ে পানি বর্ষণ" অর্থাৎ এটাকে পার্স্পেক্টিভের ব্যপার বলে ব্যাখ্যা করছে। তারা এরূপ বলছে একারনে যে তারা কাফিরদের বলা সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আজ মুসলিমরা আন্তরিক বিশ্বাস রাখে না যে, আল্লাহ ৬ দিনে আসমান যমীনকে সৃষ্টি করেছেন বরং বিশ্বাস করে বিগব্যাং এর দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বাস করে পৃথিবী গোলক বল সূর্যের চারিপাশে মহাশূন্যে ঘুরছে। এই পৃথিবীর বাহিরে মহাশূন্য, বিজ্ঞান অনুযায়ী এই ভ্যাকুয়াম স্পেস থেকে পানি পৃথিবীর বায়ূমন্ডলের মধ্যে আসা হাস্যকর অযৌক্তিক কল্পনা। তাই আধুনিক মুসলিমরা আসমান থেকে পানি নাযিল হবার বিষয়টিকে অবিশ্বাস করে, এজন্য তারা যুক্তি ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়,কাফিরদের অপবিজ্ঞানকে ইসলামাইজ করে[৩]। রূঢ় সত্য হচ্ছে কাফিরদের শেখানো মুসলিমদের বিশ্বাসে আসমানের ধারণাই বাস্তব জগতে একদম ভুল। এরা সত্যের ধারে কাছেও নেই বরং কাফিরদের বলা কল্পনার জগতে বসবাস করে। আল্লাহ যমীনের উপর গম্বুজাকৃতির ছাদ থেকেই পানি বর্ষণ করেন। এ ব্যপারে আল্লাহ একদম স্পষ্টভাবে বলেন নূহ (আঃ) এর কওমের উপর গজবের ব্যপারে আসা আয়াতে। আল্লাহ ঐসময় আসমানের দরজাকে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য খুলে দেন। আল্লাহ বলেনঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ

তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে(৫৪:১১)

আকাশ হতে পানির দরযা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। না এর পূর্বে কখনো এতো বেশী পানি বর্ষিত হয়েছিল, না এর পরে কখনো এরূপ পানি বর্ষিত হয়েছে। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলিয়ে দেয়। সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আকাশের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং ওগুলো দিয়ে অনবরত পানি বর্ষিত হতে থাকে।

আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি(৬:৬)

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
আর নির্দেশ দেয়া হল-হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষনা করা হল, দুরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক(১১:৪৪)

حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي حسين وغيره، عن أبي الطفيل سأل ابن الكوا عليا عن المجرة، قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر

আবুত তুফাইল (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
ইবনুল কাওয়া (র) আলী (রাঃ)-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা হলো আসমানের প্রবেশদ্বার এবং নূহের বন্যায় প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশের ঐ দ্বারই খুলে দেয়া হয়েছিল (৫৪ : ১১ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)।

আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭৭১
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

অতএব এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান থেকেই বর্ষণ করেন। এই বিষয়টি কাফিরদের সমস্ত কুফরি বিকল্প তত্ত্বগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করে।
এ আসমান থেকে পানি নাযিলের বিষয়টি আকিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ১৪০০ বছর আগের মুশরিকরাও বিশ্বাস করত যে আল্লাহই আসমান থেকে পানি নাযিল করেন। আল্লাহ বলেনঃ
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না(২৯:৬৩)

অথচ আজ মুসলিম উম্মাহ ঐ কাফিরদের চেয়েও জঘন্য বিশ্বাস রাখে। এরা ঐশ্বরিক তাৎপর্যবিহীন পানিচক্রে[২] বিশ্বাস করে এবং বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া এবং সর্বোপরি গোটা সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত

কাফিরদের সমস্ত বিশ্বাসকে গ্রহন করে নিয়েছে। মা'আযাল্লাহ!

হাদিসে মেঘকে বলা হয়েছে যমীনের পানিবাহী উট।আসমান থেকে যে পানি বর্ষিত হয় বা শুষ্ক বায়ু আসমান থেকে যে পানি বয়ে আনে, মেঘ তা ধারন করে। *আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ এক সাথে বসা ছিলেন। হঠাৎ তাদের উপর মেঘরাশি প্রকাশিত হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের প্রশ্ন করেন : তোমরা জান এটা কি? তারা বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই বেশি ভালো জানেন। তিনি বললেনঃ এটা হল যমিনের পানিবাহী উট।*
[আত্ব তিরমীজিঃ৩২৯৮]

আল্লাহ বলেনঃ
فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا
অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের(৫১:২)
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি(৭৮:১৪)

অর্থাৎ পানিবাহী মেঘমালা থেকে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফেরেশতাগন জলধর মেঘের বোঝা বায়ুতে ভাসিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত অঞ্চলের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান।

ফেরেশতারা মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। হযরত মিকাঈল(আঃ) মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্বে আছেন। ফেরেশতাগন মেঘমালাকে আল্লাহর নির্দেশিত জনপদের হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান আমাদের আজ বলে মেঘ র‍্যান্ডমভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মেঘগুলোই বৃষ্টি আকারে নেমে আসে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে মেঘগুলো আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোথাও যায় না। সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থণার পর পর মেঘ আবির্ভূত হয়ে বৃষ্টিপাতের ঘটনা হাদিসে এসেছেঃ

حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا الوليد، قال حدثنا أبو عمرو، قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على

لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، وبعد الغد والذي يليه، حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي ـ أو قال غيره ـ فقال يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه، فقال " اللهم حوالينا، ولا علينا ". فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় কোন এক জুমু’আর দিন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুত্‌বা দিচ্ছিলিন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য দু’আ করুন। তিনি দু’ হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু’আ শেষে) তিনি দু’ হাত (এখনও) নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খণ্ড উঠে আসল। অতঃপর তিনি মিম্বার হতে নীচে নামেননি, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর দাড়ির উপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ক্রমাগত দু’দিন এবং পরবর্তী জুমু’আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু’আর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ী ঘর ধ্বসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু’আ করুন। তখন তিনি দু’ হাত তুললেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ্‌ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু’আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খণ্ডের দিকে ইশারা করছিলেন, আর সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকার পানি একমাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদীনার) চারপাশের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে, সে এ প্রবল বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৯৩৩
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বায়ুর মধ্যেও অনেক রকমের পার্থক্য তৈরি করেছেন। কিছু বাতাস মেঘকে বিদীর্ণ করে, কিছু বায়ু আসমান থেকে পানি বহন করে নিয়ে আসে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, বাতাস আট প্রকারের হয়ে থাকে। চারটি রহমতের ও চারটি যহমতের। রহমতের চারটি বাতাসের নাম হলোঃ নাশেরাত, মুবাশশারাত, মুরসালাত ও যারইয়াত। আর যহমত বা শাস্তির চারটি বাতাসের নাম হলোঃ আকীম, সারসার, আসেফ ও কাসেফ। এগুলোর মধ্যে প্রথম দু'টি বাতাস শুষ্ক অঞ্চল হতে প্রবাহিত হয়, দ্বিতীয় দু'টি প্রবাহিত হয় সামুদ্রিক অঞ্চল হতে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বাতাস অন্যের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ তা উত্থিত হয় অন্য যমীন হতে। যখন আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি বাতাসের দায়িত্বে নিয়োজিত দারোগাকে এই আদেশ করলেন। দারোগা বললোঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি কি বায়ুমণ্ডলের ভাণ্ডারের এতোটা ছিদ্র করে দিবো যে পরিমাণ ছিদ্র বলদের নাকের হয়?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "না, না তাহলে তো সমগ্র পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে। তাতো নয়, বরং অল্প একটু ছেড়ে দাও, যা আংটি পরিমাণ হবে।" ঐটুকু পরিমাণ বাতাস যখন ছাড়া হলো ও বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলো তখন যেখানে ওর ধাক্কা লাগলো সেখানকার সবকিছু ভূমি বরাবর হয়ে গেল। যে অঞ্চলের উপর দিয়ে ঐ বায়ু প্রবাহিত হলো ওর নাম নিশানা মিটিয়ে দিলো।"[1]

আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়(২৪:৪৩)

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে উঠে। তারপর ওগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয়ে যায় এবং একে অপরের উপর জমে যায়। তারপর ওগুলোর মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, যমীনকে তিনি যোগ্য করে তুলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বর্ষিতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

এই বাক্যে প্রথম مِنْ টি اِبْتِدَاء غَايَتْ -এর জন্যে, দ্বিতীয়টি تَبْعِيْض -এর জন্যে এবং তৃতীয়টি جِنْس -এর বর্ণনার জন্যে। এটা এই তাফসীরের উপর ভিত্তি করে যে, আয়াতের অর্থ করা হবেঃ শিলার পাহাড় আকাশে রয়েছে। আর যাঁদের মতে এখানে جَبَل বা 'পাহাড়' শব্দটি রূপক অর্থে 'মেঘ' রূপে ব্যবহৃত, তাঁদের নিকট দ্বিতীয় مِنْ টিও اِبْتِدَاء غَايَتْ -এর জন্যে এসেছে। কিন্তু ওটা প্রথম হতে বদল হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

পরবর্তী বাক্যের ভাবার্থ হচ্ছেঃ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা যেখানে বর্ষাবার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর রহমতে বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষে না। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানী করেন তার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, ওটা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি

মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়(৩০:৪৮)

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, তিনি বায়ু পাঠিয়ে দেন, আর তা মেঘমালাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়তো সাগর থেকে অথবা অন্য যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে হুকুম করে মেঘমালা আনয়ন করেন। অতঃপর রাব্বুল আলামীন মেঘকে আকাশে ছড়িয়ে দেন, বিস্তার করেন এবং অল্প থেকে বেশী করেন। এটা ঘটে থাকে যে, এক হাত বা দু'হাত মেঘ দেখা গেল, তারপর তা আকাশের চতুর্দিককে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এও দেখা যায় যে, সাগর হতে মেঘ উত্থিত হচ্ছে। এ বিষয়টিকেই এ আয়াতে اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ الخ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ঐ মেঘকে খণ্ড খণ্ড করে স্তরে স্তরে সাজানো হয় এবং পানিতে তা কালো হয়ে যায়। তারপর তা মাটির নিকটবর্তী হয়ে যায়। অতঃপর ঐ মেঘ হতে পানি বর্ষিত হয়। যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয় সেখানকার লোকের ফসল ফলে যায়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এরাই বৃষ্টি হতে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। পূর্ণ নৈরাশ্যের সময়, বরং নৈরাশ্যের পর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং স্থলভাগ জলময় হয়ে ওঠে। এখানে তাকীদ বা গুরুত্ব বুঝাবার জন্যেই قَبْلُ শব্দটিকে দুইবার আনা হয়েছে। 'هٖ' সর্বনামটি اِنْزَال -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এও হতে পারে যে, বাক্যের প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা বৃষ্টির চরম মুখাপেক্ষী ছিল। এবার তাদের আশা পূর্ণ হয়ে গেল।

পূর্বে তারা সময়মত বৃষ্টি বর্ষিত না হওয়ার কারণে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এই নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ মেঘ উঠলো ও বৃষ্টি বর্ষিত হলো। বৃষ্টির পানি চারদিকে জমে গেল এবং তাদের শুষ্ক ভূমি সিক্ত হয়ে উঠলো। দুর্ভিক্ষ প্রাচুর্যে পরিবর্তিত হলো। অথবা মাঠ শুষ্ক ছিল, ফসলবিহীন ছিল, এখন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে চতুর্দিকে সবুজ ফসল দেখা যেতে লাগলো।

তাই তো আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে ভূ-খন্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান(৩৫:৯)

وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا

মেঘবিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ
মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং(৭৭:৩-৪)

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে মেঘের গর্জন এবং বজ্রপাতের ব্যপারে কি বলে? বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা হচ্ছে এগুলো মেঘে মেঘে ঘর্ষণে সৃষ্ট বিদ্যুৎ এবং নিনাদ! অথচ হাদিসে এর ব্যাখ্যা একদমই ভিন্ন। বজ্রবিদ্যুতের ব্যপারে আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ
তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমালা(১৩:১২)

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, বিদ্যুৎও তাঁরই নির্দেশাধীন। একটি লোক হযরত ইবনু আব্বাসকে (রাঃ) বিদ্যুৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে তাকে বলেনঃ "বিদ্যুৎ হচ্ছে পানি।" পথিক ওটা দেখে কষ্ট ও বিপদের ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি

১. এ হাদীসটি গারীব-এর সনদে একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

বরকত ও উপকার লাভের আশায় জীবিকার আধিক্যের লোভ করে। ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে থাকে যা পানির ভারে যমীনের নিকটবর্তী হয়ে যায়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ বজ্রও তাঁর সপ্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।" বানু গিফার গোত্রের একজন শায়েখ নবীকে (সঃ) বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ তাআ'লা মেঘ সৃষ্টি করেন যা উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে।[১]

সম্ভবতঃ কথা বলা দ্বারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দ্বারা বিদ্যুৎ চমকানো উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সা'দ ইবনু ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআ'লা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং কথা হচ্ছে বজ্র। মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম (রঃ) বলেন "আমরা খবর পেয়েছি যে, বিদ্যুৎ হচ্ছে একজন ফেরেশতা যার চারটি মুখ রয়েছে। একটি মানুষের মত, একটি বলদের মত, একটি গাধার মত এবং একটি সিংহের মত। সে যখন লেজ নাড়ে তখন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে।"

সা'লিম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বজ্র ধ্বনি শুনতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা নিপাত করবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।"[২]

১. এটা ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে কিতাবুল আদাবে রিওয়াইয়াত করেছেন এবং ইমাম হাকিম (রঃ) স্বীয় 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

حدثنا بشر قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثني الحكم قال: حدثني عكرمة، أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، قال: إن الرعد ملك ينعق

بالغيث، كما ينعق الراعي بغنمه

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বজ্রধ্বনি শুনতে পেলে বলতেনঃ "মহাপবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলো"। তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যেমন রাখাল তার মেষপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭২৭
হাদিসের মান: হাসান হাদিস

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الله بن الوليد، وكان، يكون في بني عجل عن بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو قال " ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله " . فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال " زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر " . قالوا صدقت فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه قال " اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها " . قالوا صدقت . قال هذا حديث حسن صحيح غريب .

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, ইয়াহুদীরা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে রা'দ (মেঘের গর্জন) প্রসঙ্গে বলুন, এটা কি? তিনি বললেনঃ মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তার তাৎপর্য কি? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাঁকডাক। এভাবে হাঁকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি আমাদের বলুন, ইসরাঈল [ইয়াকুব ("আঃ)] কোন জিনিষ নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তিনি ইরকুন নিসা (স্যায়াটিকা) রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু উটের গোশত ও এর দুধ ছাড়া তার উপযোগী খাদ্য ছিল না। তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

সহীহ : সহীহাহ (১৮৭২)।

ফুটনোটঃ

আবু 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩১১৭

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

বিজ্ঞান আমাদের শেখায় বজ্রপাত যেকারও উপর পড়তে পারে, তারা এটাকে প্রাকৃতিক ঘটনা সাব্যস্ত করে। এর কারনও নাকি নিয়ন্ত্রনহীন প্রাকৃতিক ঐশ্বরিক তাৎপর্যবিহীন। অথচ আল্লাহ বলেন তিনিই এই বজ্রপাত দ্বারা তার ইচ্ছেমত আঘাত করেন।এটা সম্পূর্ন তার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রনাধীন। আল্লাহ বলেনঃ

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ

তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচছা, তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী(১৩:১৩)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'বজ্র ধ্বনি শুনে তোমরা আল্লাহর যিকর করবে। কেননা, আল্লাহর কসম! আল্লাহর যিকরকারীর উপর বজ্র পতিত হয় না।"[৩]

১. এটা ইমাম মা'লিক (রঃ) তার মুআত্তা এবং ইমাম বুখারী (রঃ) কিতাবুল আদাবে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অতএব বজ্র যেখানে সেখানে পতিত হয় না। যিকরকারীর উপর আল্লাহ তা পতিত করেন না। সুতরাং বিদ্যুৎ/বজ্রের ব্যপারে বিজ্ঞান যা বলে তার কিছুই গ্রহনযোগ্য নয়[৬]।

রঙধনুর ব্যপারে আধুনিক (অপ)বিজ্ঞান কি বলে[8]? এটা নাকি আলোর স্পেকট্রামের বিচিত্র রিফ্লেক্সন/রিফ্র্যাকশানের ফল। কিন্তু হাদিসে এসেছেঃ

حدثنا عارم قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: القوس: أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة: باب السماء الذي تنشق منه

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রংধনু হলো পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবনের পর নিরাপত্তার প্রতীক এবং ছায়াপথ হলো আকাশের একটি দরজা, যা থেকে আকাশ বিদীর্ণ হবে।

আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭৭২
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন এবং এ সময় তিনি বলেন যে, যদি তাঁদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে নবুওতের শিক্ষার কিছুটাও অবশিষ্ট থাকে তবে অবশ্যই তারা আমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পত্রে তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে ছায়াপথ, রংধনু এবং ঐ ভূখণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যাতে স্বল্প সময় ব্যতীত কখনো সূর্য পৌঁছেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পত্র ও দূত এসে পৌঁছলে মু'আবিয়া (রা) বললেন, এ তো এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবো বলে এ যাবত কখনো আমি কল্পনাও করিনি। কে পারবেন এর জবাব দিতে? বলা হলো, ইব্‌ন আব্বাস (রা) পারবেন। ফলে মু'আবিয়া (রা) হিরাক্লিয়াসের পত্রটি গুটিয়ে ইব্‌ন আব্বাসের নিকট পাঠিয়ে দেন। জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) লিখেন ঃ রংধনু হলো, পৃথিবীবাসীর জন্য নিমজ্জন থেকে নিরাপত্তা। ছায়াপথ আকাশের সে দরজা, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হবে আর যে ভূখণ্ডে দিনের কিছু সময় ব্যতীত কখনো সূর্য পৌঁছেনি; তাহলো সাগরের সেই অংশ যা দু'ভাগ করে বনী ইসরাঈলদেরকে পার করানো হয়েছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত এ হাদীসের সনদটি সহীহ।

নিঃসন্দেহে বৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিশাল রহমত। এটা আল্লাহর নাযিলকৃত এমন পবিত্র পানি, যার ভাণ্ডার মানুষের নাগালের মধ্যে নেই। এই পানিই মানব-দানব ও সমগ্র প্রানীকুলের রিযিকের মূল। আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত[৪২:২৮]

“And we have sent down from the heavens’ water that is blessed.” (Surah Qaf: Ayat 9).

সুতরাং বৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, আসমানের নাযিলকৃত পবিত্র বস্তু। অথচ এই রহমতের বৃষ্টিকে বর্ষিত হতে দেখে মাঝেমধ্যে আমরা অভিশম্পাত করি, বৃষ্টিকে গালি দেই! আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বারিধারা নেমে আসতে দেখলে কি করতেন?
সাহাবী আনাস রা. বলেন,
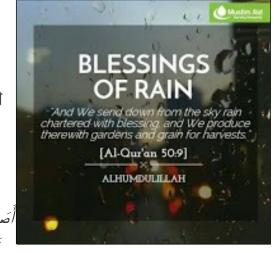
أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى»

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালে একবার বৃষ্টি নামল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর কাপড়ের কিয়দংশ উন্মোচন করলেন যেন শরীরে বৃষ্টির পানির স্পর্শ লাগে।
আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, কারণ তা তার মহান রবের কাছ থেকে মাত্রই এসেছে”।

[সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাতুল ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত। হাদিস নং ৮৯৮]

وعن أنس قال: أصابنا -ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطر، قال: فحسر ثوبه، حتى أصابه من المطر، وقال: «إنه حديث عهد بربه» رواه مسلم

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, একবার আমরা বৃষ্টিতে পড়লাম, তখন আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গেই ছিলাম । তিনি তাঁর (শরীরের কিছু অংশ হতে) কাপড় হটিয়ে নিলেন ফলে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়লো । তিনি বললেনঃ এটা তাঁর প্রতিপালকের তরফ থেকে (রহম স্বরূপ) প্রথম বৃষ্টি হিসাবে আসলো (সেই মৌসুমের) । [৫৫৫]

ফুটনোটঃ

[৫৫৫] মুসলিম , ৮৯৮ , আবু দাউদ ৫৯০০ , আহমাদ ১১৯৫৭ ।

বুলুগুল মারাম, হাদিস নং ৫১৯

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৃষ্টি হলেই তাঁর দাসী কে বলতেন, আমার ঘোড়ার জিন এবং কাপড়-চোপড় বের করে বৃষ্টিতে দাও। (যেন রহমতের বৃষ্টি এর উপর পড়তে পারে) এবং তিনি উপরের (সূরা ক্বাফ, আয়াত-৯) আয়াতটি পাঠ করতেন।

[আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২৪৫]

বৃষ্টির পানি সত্যিই একটু ভিন্ন, আপনি দেখবেন মৃতপ্রায় কোন গাছের উপর বৃষ্টির পানি পড়ার পর সেটা পুনরায় সতেজ হয়ে উঠেছে, যেন পুনরায় জীবন লাভ করেছে। চর্মরোগী কিংবা ঘামাচিতে আক্রান্তকে ব্যক্তিও বৃষ্টিতে ভিজলে খুব দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে দেখা যায়, যেন এই পানি শরীরের মৃত কোষগুলোকে সঞ্জীবিত করে। বৃষ্টির বর্ষণ মানে আল্লাহর রহমত বর্ষণ, এসময়ের দু'আকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

In a hadith of Sahl ibn Sa'd (Ra.) attributed to the Prophet (Pbuh) it is said, "There are two which will not be rejected: duaa at the time of azan and when it is raining."

(Sunnan Abu Dawood & Saheeh al-Jaami).

মাঝেমধ্যে আমরা বৃষ্টিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি তবুও বর্ষিত হতে দেখে অসন্তুষ্ট হই। কখনো কখনো বৃষ্টি আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও তা অন্য কোন প্রানীর জন্য প্রয়োজন হতে পারে।নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিমিতভাবে বর্ষণ করেন এবং তিনি কোন মাখলুকের ব্যপারে বেখবর নন। ছোট্ট পিপীলিকার ব্যপারেও নয়।

وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة ». رواه الدارقطني

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, নাবীদের মধ্যে একজন নাবী ইস্তিস্কার (সলাত) আদায়ের জন্য লোকজন নিয়ে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি পিপীলিকা দেখতে পেলেন। পিপড়াটি তার দুটি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। (অর্থাৎ পিপীলিকাটি বৃষ্টির জন্য দুআ করছে)। এ দৃশ্য দেখে উক্ত নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) লোকদেরকে বললেন, তোমরা ফিরে চলো। এ পিপড়াটির দু'আর কারণে তোমাদের দু'আ কবুল হয়ে গেছে। (দারাকুত্বনী)

[মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ১৫১০]

আজ মুসলিম হয়েও অধিকাংশ লোকই প্রাচীন মুশরিকদের চেয়ে নিকৃষ্ট বিশ্বাস রাখে মেঘ ও বর্ষণের বিষয়গুলোতে। এরা কাফিরদের গড়া ওয়াটার সাইকেলে বিশ্বাস রাখতে পছন্দ করে। সবকিছুকে মেক্যানিস্টিক কজ এ্যান্ড ইফেক্ট তৈরি করে নিয়েছে, মুসলিমরা এই Godless cause and effect কে ইসলামাইজ করতে বানিয়েছে এগুলো সবই আল্লাহ ঘটান। অর্থাৎ মু'তাযিলা/আশআরিদের ফিলোসফিক্যাল অকেশনালিজমে ঢুকে গিয়েছে। আপনি যদি কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেসা করেন, কিভাবে বৃষ্টি হচ্ছে(?) তারা এ কথা বলবে না যে আল্লাহ আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন। বরং তারা বলবে সূর্যের তাপে পানি জলীয়বাষ্প হয়ে ঘণীভূত হয়ে বৃষ্টি আকারে নামছে। এরা আমাদের আশপাশের বাস্তবতা(reality) এবং Divine dominion কে আলাদাভাবে দেখছে। দ্বীনকে প্র্যাক্টিক্যাল জগত থেকে গুটিয়ে মৌখিক বিশ্বাসের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করেছে। প্রাচীন মুশরিকরা বৃষ্টিপাতের কারন ব্যাখ্যা করত কোন নক্ষত্রের উদয় বা অস্তকে। তদ্রুপ আজকের মুসলিমরা মেক্যানিস্টিক ওয়াটার সাইকেলকে কারন হিসেবে দর্শায়। এরা ১৪০০ বছর আগের মু'মিনদের মত বলে না, আল্লাহ বৃষ্টি দিচ্ছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃজ্ঞতাই প্রকাশ করে থাকে। ইকারামা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বলে– "অমুক অমুক নক্ষত্রের আকর্ষণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।" যেমন একদা রাত্রিকালে বৃষ্টিপাত হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক যা বলেছেন তা তোমরা জান কি?" সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মুরসাল।

বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরূপে সকাল করে এবং কেউ সকাল করে আমাকে অস্বীকারকারীরূপে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে– 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে– 'অমুক অমুক তারকার আকর্ষণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।"

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে লেখা এই আর্টিকেল সিরিজের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক এবং গায়েবের সমস্তকিছুর আল্লাহর প্রতি একক মুখাপেক্ষীতা দর্শানো, মানুষকে আকিদাগত সুবিশাল ফাটলের ব্যপারে অবগত করা। আমরা মানুষকে এ কথা বলতে উৎসাহিত করি যে মেঘ বৃষ্টি বা যে কোন কিছু যাকে আমরা প্রাকৃতিক তাৎপর্যহীন ঘটনা বলে সাব্যস্ত করি তা সম্পূর্ন আল্লাহর ডমিনিয়নে এবং তার ইচ্ছা, নির্দেশে হয়ে থাকে। বলতে উৎসাহ করি যে, মেঘ-বৃষ্টি এমনি এমনিই হচ্ছে না বরং আল্লাহর করুনা অনুগ্রহ বা রহমত স্বরূপ তা আসমান থেকে নাযিল হচ্ছে।

মূলত অপবিজ্ঞান এবং ইসলামের আপোষকারী বিভ্রান্ত মুসলিমরা বজ্র-মেঘ-বৃষ্টিসহ অন্যান্য সকল

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে আসা কুরআন সুন্নাহরভিত্তিক বিবরণ শুনে খানিকটা বিব্রত হয়[৭]। কারন মাঝেমধ্যে সেসব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কুরআন সুন্নাহর সাথে মেলানো দুষ্কর হয়ে যায়। তাই তারা প্রথমেই হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সনদ সহীহ কিনা.. ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের চেষ্টা থাকে কোনভাবে মওযূ প্রমাণের। সেটা না পারলে কোন না কোন আলিমের রেফারেন্স টানেন যার সাথে (অপ)বিজ্ঞানের আপোষকরা সহজ। তারা যখন একেবারেই আপোষ করতে পারে না ঈমান ও কুফরের সাথে তখন আশ্রয় নেয় ফিজিক্যাল ও মেটাফিজিক্যাল দুধরনের এক্সপ্ল্যানেশনে। ফিজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন হিসেবে গ্রহন করে অপবিজ্ঞানকে আর মেটাফিজিক্যাল ব্যাখ্যা হিসেবে নেয় শার'ঈ দলিলকে। যদি দুইরকমের ব্যাখ্যা করে দুটোতেই বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ থাকে তাহলে হাদিসে 'নক্ষত্রের কারনে বৃষ্টিপাত হয়েছে' বললেও কেউ কাফির হবে না বা শিরক হবে না। কারন সেটাকে ফিজিক্যাল কারন আর মেটাফিজিক্যালি আল্লাহরই বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছেন বলে পার পাওয়া যাবে। এভাবে সমস্ত শরী'আতে কুফর শিরক সাব্যস্ত স্পষ্ট বিষয়কে হালাল/জায়েজ বা ইসলামাইজ করা সম্ভব। এগুলো আসলে ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের মুনাফিকি ব্যাখ্যা। মুনাফিকরা দুদিকেই থাকে। কাফিরদের সামনেও কুফর করে আবার ঈমানদারদের সামনে ঈমানের প্রকাশ ঘটায়। মেক্যানিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশনেও আমরা ফিজিক্যাল এবং মেটাফিজিক্সকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করতে পারিনা। যখন আল্লাহ পানিবাহী বায়ু চালনা করেন আমরা তখন সেটাকে এর underlying reason কে বাদ দিয়ে বাহ্যিক ঘটনাকে কারন সাব্যস্ত করতে পারি না,অর্থাৎ এক্ষেত্রে বলতে পারিনা যে 'পানিবাহী বায়ু মেঘকে পানি পূর্ন করেছে তাই বৃষ্টি হচ্ছে' বরং বলি আল্লাহই পানিবাহী বায়ু দ্বারা মেঘকে পূর্নকরে বৃষ্টি ঘটিয়েছেন। সুতরাং আমরা সরাসরি আল্টিমেট রিয়ালিটিকেই(ডিভাইন ইন্টারভেনশান) প্রাইমারি এবং আল্টিমেট কজ এন্ড ইফেক্ট হিসেবে প্রকাশ করি। এটাই ইসলাম শেখায়। এজন্য কোথাও সুনামি কিংবা এ জাতীয় 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে' আমরা 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়' না বলে বলি আল্লাহর শাস্তি কিংবা পরীক্ষা।

Ref:

১]

https://m.youtube.com/watch?v=VMjvybtX3TI

https://m.youtube.com/watch?v=_0eTXG39i4o

https://m.youtube.com/watch?v=v67nPTG3Pno

২]

https://m.facebook.com/notes/quran/পবিত্র-কোরআন-ও-বিজ্ঞানের-দৃষ্টিতে-বৃষ্টি-বা-পানি-

চক্র/828388863885478/

৩]

https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%9B%E0%A7%87--/74

https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE(Hail)-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%AA-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A7%9F--/73

http://the-scientific-quran.blogspot.com/2015/06/blog-post_54.html?m=1

https://sorolpath.wordpress.com/tag/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/

৪]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rainbow

৫]

https://m.youtube.com/watch?v=_faCEgNrrBE

৬]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thunder

https://www.scientificamerican.com/article/what-causes-thunder/

https://www.weatherwizkids.com/weather-lightning.htm

৭]

https://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A7%9F--/217

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

চলবে ইনশাআল্লাহ..

ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব

পর্ব-১২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ঋতুবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন গরম ও শৈত্যের। আধুনিক বিজ্ঞান গরম বা শৈত্যের কারন হিসেবে দেখায় কাল্পনিক গোলক পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণের সময় সূর্যালোকের পথ,দূরত্ব ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসাকে। অর্থাৎ (অপ)বিজ্ঞানীদের কাল্পনিক সৌরজগতের যেকোন কাল্পনিক গ্রহে উত্তাপ বা উষ্ণ আবহাওয়া এবং শৈত্য সম্পূর্নভাবে সূর্যের উপর নির্ভর করে। আমরা নাকি সূর্যের জন্যই গরম বা ঠান্ডা অনুভব করি। কিন্তু আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এ ব্যপারে কি বলেছেন?

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اشتكت النار إلى ربها، فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক।'

সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৬০
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

وحدثني عمرو بن سواد، وحرملة بن يحيى، - واللفظ لحرملة - أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن

ابن شهاب، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا . فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير ".

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নাম তার প্রভু আল্লাহর কাছে এ বলে ফরিয়াদ করল যে, তার এক অংশ আরেক অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামকে দু’বার শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একবার শীতকালে এবং আরেক বার গ্রীস্মকালে। তোমরা যে প্রচন্ড গরমের অনুভব করে থাকো তা এ কারণেই। (ই.ফা.১২৭৫, ই.সে.১২৮৮)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১২৮৮
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا حيوة، قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس . فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ".

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নাম অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে বলল, হে আমার প্রভু! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আমাকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিন। তাই আল্লাহ তা’আলা তাকে দুবার শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুমতি দান করলেন। একবার শীত মৌসুমে আরেকবার গ্রীষ্ম মৌসুমে। তোমরা শীতকালে যে ঠান্ডা অনুভব করে থাকো তা জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণ। আবার যে গরমে বা প্রচন্ড উত্তাপ অনুভব করে থাকো তাও জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে। (ই.ফা.১২৭৭, ই.সে.১২৯০)

সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১২৯০
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا . فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها " .

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) , থেকে বর্ণিতঃ:
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নাম তার প্রভুর নিকট অভিযোগ করে বললো, হে আমার রব! আমার একাংশ অপরাংশকে গ্রাস করেছে। তখন আল্লাহ তাকে দু’বার নিঃশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিলেনঃ একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা দুনিয়াতে যে ঠাণ্ডা অনুভব করো তা হলো জাহান্নামের হিম শীতলতা থেকে এবং যে গরম অনুভব করো তা হলো জাহান্নামের আগুনের উষ্ণতা থেকে।[৩৬৫১]

তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।
ফুটনোটঃ
[৩৬৪৯] [সহীহুল বুখারী ৫৩৭, ৩২৬০, মুসলিম ৬১৫, তিরমিযী ১৫৭, ২৫৯২, নাসায়ী ৫০০, আবূ দাঊদ ৪০২, আহমাদ ৭০৯০, ৭২০৫, ৭৪২৪, ৭৫৫৮, ৭৬৬৫, ৭৭৭০, ২৭৪৪৩, ৮৩৭৮, ৮৬৮৩, ৮৮৬১, ৮৮৮১, ৮৯৩৯, ২৭৪৯৪, ৯৬৩৯, ১০১২৮, ১০১৬০, ১০২১৪, ১১১০৪, মুয়াত্তা' মালিক ২৮২৯, দারিমী ১২০৭, ২৮৪৫। সহীহাহ ১৪৫৭।]

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪৩১৯
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আধুনিক বিজ্ঞানের হাজারো কুফরি তত্ত্বের একটি বিবর্তনবাদ। বিবর্তনবাদ মূলত একটি অকাল্ট কন্সেপ্ট যেটাকে মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞানেও সঞ্চালিত হয়েছে সাধারণ জনগণের আকিদাকে কুফরের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে। এই তত্ত্ব এমন বিশ্বাসব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে অগ্রাহ্য করা হয়। অর্থাৎ কোন কিছুই বুদ্ধিপ্রদীপ্ত স্বত্ত্বা কর্তৃক সৃষ্টি নয় বরং সবই প্রাকৃতিক উন্নয়নমুখী বিবর্তন। সমস্ত প্রানী একক অর্গ্যানিজম থেকে এসেছে। মানুষ

হয়েছে ছোট্ট ব্যাকটেরিয়া বা কীট বা এরকম প্রানী থেকে। এরপরে হাজার হাজার বছর পর ধীরে ধীরে মাছ জাতীয় প্রানী, মাছ থেকে সরীসৃপ জাতীয় প্রানী, এরপরে বানর, ধীরে ধীরে নিয়ানডার্থাল এরপরে লক্ষ লক্ষ বছর পর হোমোসেপিয়েন্স বা বর্তমান পূর্ণাঙ্গ মানুষ। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী কোন প্রানী কালের পরিক্রমায় ক্রমশ উন্নততর হতে থাকে। সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। এরা এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে মাইগ্রেট করে। ধরুন সাপ থেকে হাজার বছর পর অন্য কোন প্রজাতির প্রানীরও উদ্ভব হতে পারে। গরু থেকে নতুন কোন আকৃতির প্রানী, মানুষও তেমনি অন্যকোন প্রানীতে শিফট করতে পারে অথবা আকৃতি বা দৈহিক গঠন পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন কিছুতে রুপান্তর হতে পারে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা প্রতিটি প্রানীকে আলাদাভাবে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

পবিত্র তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন[৩৬:৩৬]

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর[আয যারিয়াতঃ৪৯]

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি[৭৮:৮]

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন[৪২:১১]

সুতরাং একক অর্গ্যানিজম থেকে ধীরে ধীরে হাজার প্রজাতি বা শ্রেনীর প্রানী সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পূর্ন মিথ্যা এবং সুস্পষ্ট কুফর। যেহেতু আল্লাহ এক প্রজাতির প্রানী থেকে অন্য প্রজাতির প্রানীতে রূপান্তরের কোন পথ করেন নি, তাই নূহ(আঃ) এর সময়কার মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে প্রত্যেক প্রজাতির প্রানীর একটি করে জোড়া নৌকায় তুলবার আদেশ

দিয়েছেন।আল্লাহ বলেনঃ

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ
অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জত হবে।[২৩:২৭]

حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ
অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভুপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদি দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।[১১:৪০]

সুতরাং এই বিবর্তনবাদের শয়তানি মতবাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আল্লাহ সর্বপ্রথম মানুষ তৈরি করে আদম আলাইহিসালামকে। তাকে সৃষ্টি করা হয় সরাসরি শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা। অতঃপর তার থেকে মা হাওয়াকে(আঃ) সৃষ্টি করেন। এরপর থেকে এ যুগল থেকে আল্লাহ মানব সন্তানকে সরাসরি সৃষ্টি করেন বীর্যের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত অব্যাহত। এরপরেও মানুষ মিথ্যা বিষয়ে(যেমনঃবিবর্তনবাদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কুফরি তত্ত্ব) বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে।
আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি[১৫:২৬]

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا
তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বললঃ তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি

থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর পূর্নাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে?[১৮:৩৭]

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?[১৬:৭২]

সুতরাং বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বানর থেকে মানব সৃষ্টির কথা অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছু না। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী তো শুরুর দিকে মানুষ ভাষাহীন অসভ্য গুহাবাসী ছিল। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আদি মানব মানবীকে সৃষ্টির শুরুতেই পোষাকের ব্যবস্থা করেছেন, যা শয়তান অনাবৃত করার রাস্তা করে দেয়। আল্লাহ বলেনঃ

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতেরঅন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

হে বনী-আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি- যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, , যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।[৭:২৬-২৭]

আল্লাহ স্বয়ং পিতা আদমকে(আঃ) ভাষা ও বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তাকে এমনকি এমন সব জ্ঞানও আল্লাহ তাকে দিয়েছেন যা ফেরেশতাদের কাছেও অজানা। আল্লাহ বলেনঃ

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।

قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।

قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর![২:৩১-৩৩]

সুতরাং এটা প্রমাণ করে বিবর্তনবাদ অনুযায়ী শুরুর দিকে পোষাক ও ভাষাহীন অসভ্য প্রানীতুল্য মানবজাতির গুহায় বসবাস এবং আগুন জ্বালানোর শিক্ষার মাধ্যমে সভ্যতার বিকাশের গল্প; যা আজ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ন মিথ্যা এবং ইসলামের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ প্রথম মানবকেই পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সভ্যতার পরিপূর্ণ জ্ঞান দানের পরেই দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। আল্লাহ সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম(আঃ) কে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। তার উচ্চতা ছিল ৬০ হাত।

حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه 32] ، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى

الآن "

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও। ঐ ফেরেশতা দলের প্রতি সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ সেটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। অতঃপর আদম ('আঃ) (ফেরেশতাদের) বললেন, "আস্‌সালামু 'আলাইকুম"। ফেরেশতামন্ডলী তার উত্তরে "আস্‌সালামু 'আলাইকা ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ" বললেন। ফেরেশতারা সালামের জওয়াবে "ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম ('আঃ)–এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে।

(৬২২৭, মুসলিম ৫১/১১ হাঃ ২৮৪১, আহমাদ ৮১৭৭) (আ.প্র. ৩০৮০, ই.ফা. ৩০৮৮)
সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩২৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم على صورته، وطوله ستون ذراعا، ثم قال: اذهب، فسلم على أولئك - نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورته، فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن "

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
নবী (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা আদম (আবু দাউদ)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন, যাও, উপবিষ্ট ঐ ফেরেশতার দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোনো। কেননা এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম (সম্ভাষণ)। আদম (আঃ) গিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া

রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ "ওয়া রহমাতুল্লাহি" বাড়িয়ে বলেন। যে ব্যক্তি বেহেশতে যাবে সেই হবে আদম (আবু দাউদ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট। তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের দেহাবয়ব (উচ্চতাবারানী) ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।

(বুখারী, মুসলিম)
আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৯৮৭
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك, فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن» .
صحيح (خ, م)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত, তিনি তাকে সৃষ্টি করে বলেনঃ যাও সেখানে বসে থাকা ফেরেশতাদের দলকে সালাম কর, খেয়াল করে শোন তারা তোমাকে কি অভিবাদন জানায়, কারণ তা-ই হচ্ছে তোমার ও তোমার সন্তানের অভিবাদন। তিনি বললেনঃ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ। তারা বললঃ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ। তারা অতিরিক্ত বলল। সুতরাং যে কেউ জান্নাতে যাবে সে আদমের আকৃতিতে যাবে, আর তারপর থেকে মানুষ ছোট হওয়া আরম্ভ করছে, এখন পর্যন্ত তা হচ্ছে"।
[বুখারি ও মুসলিম] হাদীসটি সহিহ।

সহিহ হাদিসে কুদসি, হাদিস নং ১২৬
হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

সুতরাং হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ মানুষকে শুরুতে (পরিপূর্ন)বৃহৎ আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। এই ক্রমধারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত থাকবার পর থেকে মানুষ ক্রমাগত ছোট হতে হতে এখন

মানুষের উচ্চতা ৫/৬ ফুটে পৌছেছে। শুধু তাই নয় সুবিশাল দেহের আদীম সেই মানুষ জ্ঞান বুদ্ধিতেও আজকের তুলনায় উন্নত ছিল(সে আলোচনা সামনে আসছে)। সুতরাং সবকিছু ক্রমশ অধঃপতনের দিকে এসেছে। এটা বিবর্তনবাদের ঠিক উলটো। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী সবকিছু ক্রমশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নয়নমুখী।

প্রত্যেক প্রানী বা বস্তু সবকিছু ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে কমপ্লেক্স ও এ্যাডভান্স হচ্ছে। শূন্য থেকে মলিকিউল, এরপরে অনুন্নত অর্গ্যানিক বস্তু, এরপরে সুক্ষ প্রানী → মৎস্যজাতীয় প্রানী→সরীসৃপ →স্তন্যপায়ী→ বানর→মানুষ→......। সেই নিয়ানডার্থাল থেকে হোমোসেপিয়েন্স, ভাষাহীন লজ্জাহীন গুহাবাসী থেকে কথিত সভ্যতা ও উৎকর্ষের চরমে পৌঁছানো আজকের মানুষ।

অতএব এ যেন দুটি আলাদা জ্ঞানগত ধারা। এর একটির শিক্ষা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই। সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে। সবকিছু নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। অন্যদিকে জ্ঞানের অপর ধারাটি বলে সবকিছুই এক মহান স্বত্ত্বা কর্তৃক সৃষ্ট। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সবকিছু একা একা সৃষ্টি হবার স্রষ্টাহীন জ্ঞানগত ধারাটিকে মহান সৃষ্টিকর্তা কুফর সাব্যস্ত করেন। এ চিন্তাধারা মূলত শয়তানের থেকেই আগত। অতীতের পৌত্তলিকরাও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করত না। তারাও বিশ্বাস করত আসমান, যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। বৃষ্টিদানকারীও আল্লাহ বলে বিশ্বাস করত। তাদের অবিশ্বাস ছিল পুনরুত্থান দিবসে। তারা মূর্তি বানিয়ে পূজা করত এই আশায় যাতে সেগুলো আল্লাহর কাছে তাদের ব্যপারে সুপারিশ করে। তারা আল্লাহর সিফতের ব্যপারে সংকীর্ণ ধারনা রাখত।

অতএব বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা এমনই এ্যাডভান্স কুফর যা মূলধারার প্রাচীন মুশরিকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল না। এটা শুধুমাত্র যাদুকরদের আকিদায় প্রচলিত ছিল এবং এখন শয়তান তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার, যিনি এই স্রষ্টাহীন 'আপনাআপনি নিজে নিজেই' সবকিছু সৃষ্টির আল্টিমেট কুফরি তত্ত্বের ব্যপারে কুরআনে উল্লেখ করতে বাদ রাখেন নি। আল্লাহ বলেনঃ

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ

তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।[৫২:৩৫-৩৬]

বিগব্যাং তথা কস্মোলজিক্যাল এভ্যুলুশ্যন[২০] এবং গোটা Evolutionary Cosmogenesis প্রতিষ্ঠা শুধু এই জন্য যে সেটা স্রষ্টাবিহীন বিকল্প কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসের দরজা খুলে দেয়। এত কিছু শুধুই অলটারনেটিভ বিলিফ সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য। এই বিবর্তনবাদি দর্শনের মূল কথা হচ্ছে সবকিছুই আপনা আপনিই সৃজিত হয়েছে ,সকল বস্তু নিজেই নিজের স্রষ্টা এবং আরো গভীর শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত বস্তুই একে অপরের Co-Creator(Pantheism), সহজভাবে বললে এই কাফিররা বলতে চায় তারাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এরূপ আকিদা তৈরির আসল কারন হচ্ছেঃ এরা কাফির। তাই সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে Reality এর Origin নিয়ে Alternative theory বানিয়ে নিয়েছে যেখানে সব কিছুই আপনাআপনি সৃষ্টি হয়,সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। এজন্য আল্লাহ এ আয়াতেই শেষে বলে দিয়েছেন। "বরং তারা বিশ্বাস করে না"(৫২:৩৬)। এটাই আসল ব্যাপার।
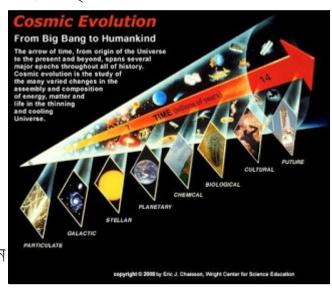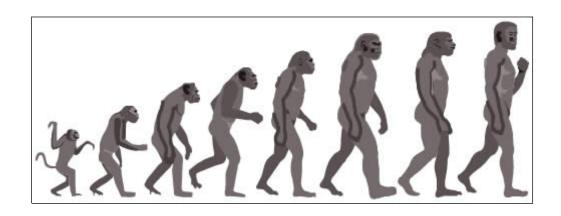
বিবর্তনবাদ অনুযায়ী ক্ষুদ্র থেকে সমস্ত জিনিস বিবর্তিত বিবর্ধিত অর্থাৎ মানুষ ক্ষুদ্র কোষ থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে আজকের ৫-৬ ফুট উচ্চতার দৈহিক আকৃতি লাভ করেছে। আর অন্যদিকে বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহ প্রথম মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন ৬০ কিউবিটের বৃহৎ বলিষ্ঠ আকৃতি দিয়ে।

তখনকার যুগের মানুষ শুধু দৈর্ঘ্যের দিক দিয়েই বড় ছিল না, তাদের আয়ুষ্কালও অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল। এক একজন মানুষ হাজার বছরের হায়াত পেয়েছে যেখানে অধিকাংশ মানুষ আজ ১০০ বছরই পার করতে পারেনা। আদম(আঃ) ৯৩০ বছর বেচেছিলেন। নূহ(আঃ) ৯৫০ বছর,শুয়াইব(আঃ) ৮৮২ বছর হায়াত লাভ করেন।

অতীতের দানবীয় আকৃতির মানুষের প্রমাণস্বরূপ আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদেহী মানব কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সেই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের নির্মিত মেগালিথিক স্ট্রাকচার,মনুমেন্ট, মন্দির,সুউচ্চ প্রাসাদ। এমনকি তাদের সুবৃহৎ পায়ের ছাপও পাওয়া গিয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে বিবর্তনবাদ বা ইভ্যলুশ্যন একেবারেই মিথ্যা। যেহেতু বৃহদাকার মানব কঙ্কাল বিবর্তনবাদী চিন্তাধারাকে মিথ্যা প্রমাণ করে,তাই স্মিথসোনিয়ানের মত হাজারো প্রতিষ্ঠান Evolutionary chronology কে টিকিয়ে রাখতে হাজার হাজার দীর্ঘদেহী মনুষ্য কঙ্কাল ধ্বংস করেছে এবং এর সকল তথ্য গুম করেছে।

তেল,গ্যাস, কয়লা উত্তোলনসহ বিভিন্ন খননকার্যে সহস্রাধিক দানবাকৃতির মানব কঙ্কাল পাওয়া গেছে, যার প্রায় সবই সরকারী হস্তক্ষেপে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। কারন এই তথ্যের সাথে জড়িয়ে আছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যপুস্তকসহ গোটা পৃথিবীর ব্যপারে মানুষের ধারনাগত দৃষ্টিভঙ্গি, যা কাফির মুশরিকরা বহু বছরের চেষ্টায় ঢেলে সাজিয়েছে। তারা কখনোই এই সুদীর্ঘ চেষ্টার ফসলকে নস্ট হতে দেবে না।

২০০০ সালে তেল কোম্পানি Aramco দক্ষিন-পূর্ব সৌদি আরবে তেল খননকালে মাটির নিচে প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার সুবিশাল মানব কঙ্কাল আবিষ্কার করে। খবর পেয়ে সৌদি পুলিশ চলে আসে এবং সাধারণ মানুষকে সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে, দুএকটা ছবি যা তোলা হয়েছিলো তাও জব্দ করে। এই মানব কঙ্কালকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কি করে তার আর জানা যায়নি[২]
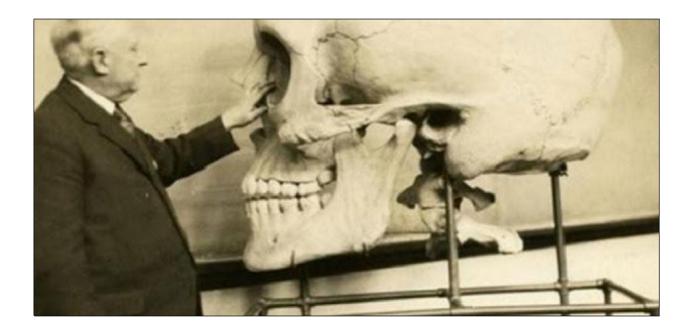
এরকম হাজারো দীর্ঘদেহী মানব কঙ্কালের অস্তিত্বের সহস্র রেকর্ড রয়েছে সারাবিশ্ব জুড়ে আমেরিকার ওহিও, শিকাগো,ক্যালিফোর্নিয়া, ডেথভ্যালি,টেক্সাসসহ অনেক অঞ্চলে জায়ান্ট স্কেলিটন উদ্ধারের রেকর্ড পাওয়া যায়।

আমেরিকান এ সকল লম্বা মানুষদের কঙ্কালগুলো অধিকাংশই ৮ ফুট উচ্চতার। এছাড়া মেক্সিকো,চীন দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকা এমনকি ভারতেও লম্বা মানুষের স্কেলিটন পাওয়া গিয়েছে[৩]। এদের অধিকাংশই ২০/৩০ ফুট মাটির নিচে দেখা যায়। এদের উচ্চতা ৮ ফুট থেকে ১৫ ফুট। কিছু কিছু কঙ্কালের হাতের আঙ্গুল সংখ্যা ছয়টি, এদের চোয়ালও দুইপাটি বিশিষ্ট!

THE BONES OF A GIANT FOUND.

ST. PAUL, Minn., May 24.—A skull of heroic size and singular formation has been discovered among the relics of the mound-builders in the Red River Valley. The mound was 60 feet in diameter and 12 feet high. Near the centre were found the bones of about a dozen men and women, mixed with the bones of various animals. The skull in question was the only perfect one, and near it were found some abnormally large body bones. The man who bore it was evidently a giant. A thorough investigation of the mound and its contents will be made by the Historical Society.

The New York Times
Published: May 25, 1882

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিত্যাক্ত নির্জন অঞ্চলে থাকা উচু মাটির ডিবিকে লোকমুখে প্রাচীন লম্বা দানবাকার মানুষের কবর বলে প্রচলিত আছে।

ডেভিড হ্যাচার্ড চিলড্রাস একজন ম্যাভারিক আর্কিওলজিস্ট যিনি আমেরিকান জায়ান্ট লোকগল্পের

দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন, তিনি বলেন," *আমেরিকার মিডওয়েস্টের বেশ কিছু উচু ডিবি খনন করা হয়েছিল ১৮৫০ এর দিকে, তখন অনেক দীর্ঘদেহী স্কেলিটন উদ্ধার করা হয় যাদের উচ্চতা সাতের উপর। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের কারো কারো দুইসারির চোয়াল এবং ৬ টি করে আঙ্গুল ছিল।*"

১৯১২ সালে, নেভাডার লাভলকের এক প্রত্যন্ত বিচ্ছিন্ন পরিত্যাক্ত গুহার কাছে এক লোক সারের জন্য ব্যাটগুয়ানো নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসে, গুহার ভেতরে বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, সে ভেতরে এসে দেখে প্রচুর ব্যাটগুয়ানো, মাছ ধরার সরঞ্জামাদি এর পরে অদূরেই লালচুল ওয়ালা দীর্ঘদেহী মানুষের মমী। পরবর্তীতে এখান থেকে প্রায় ৬০ টি মমি ও কঙ্কাল উদ্ধার করা হয় যাদের উচ্চতা ৭-১০ ফুট। কিন্তু এগুলো কি করা হয়েছে তার সন্ধান আর কোথাও মেলেনা[8]।

গত দুইশত বছরে পাওয়া জায়ান্ট স্কেলিটন গুলো বের করবার পরে রহস্যজনকভাবে সেসব হারিয়ে গেলেও ওই সময়কার পত্রিকায় আসা জায়ান্ট স্কেলিটনের খবর এখনো খুজে পাওয়া যায়। নিচে কিছু লম্বা মানুষের কঙ্কাল উদ্ধারের রেকর্ডঃ

- From records and sources all over the world.

Giant Skeletons: In his book, The Natural and Aboriginal History of Tennessee, author John Haywood describes "very large" bones in stone graves found in Williamson County, Tennessee, in 1821. In White County, Tennessee, an

"ancient fortification" contained skeletons of gigantic stature averaging at least 7 feet in length.

Giant skeletons were found in the mid-1800s near Rutland and Rodman, New York. J.N. DeHart, M.D. found vertebrae "larger than those of the present type" in Wisconsin mounds in 1876. W.H.R. Lykins uncovered skull bones "of great size and thickness" in mounds of Kansas City area in 1877.

SAN ANTONIO EXPRESS
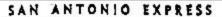
Beach Giant's Skull Unearthed By WPA Workers Near Victoria

Believed to Be Largest Ever Found in World; Normal Head Also Found

That Texas "had a giant on the beach" in the long ago appears probable from the large skull recently unearthed in a mound in Victoria County, believed to be the largest human skull ever found in the United States and possibly in the world.

Twice the size of the skull of normal man, the fragments were dug up by W. Duffen, archaeologist, who is excavating the mound in Victoria County under a WPA project sponsored by the University of Texas. In the same mound and at the same level, a normal sized skull was found. The pieces taken from the mound were reconstructed in the WPA laboratory under supervision of physical anthropologists.

A study is being made to determine whether the huge skull was that of a man belonging to a tribe of extraordinary large men or whether the skull was that of an abnormal member of a tribe, a case of giantism. Several large human body bones also have been unearned at the site.

Marcus B. Goldstein, physical anthropologist employed on the WPA project, formerly was an aide of Ales Hdrlicken, curator of the National Museum of Physical Anthropology.

Finds made through excavations in Texas are beginning to give weight to the theory that man lived in Texas 40,000 to 46,000 years ago, it is said.

GIANT SKULL—Believed to be possibly the largest found in the world, the human skull shown on the right was recently unearthed in Victoria County by Texas University anthropologists. The other two are of normal size.

STAMP SOCIETY MEETS

San Antonio Philatelic Society will hold its first meeting of 1940 at the Y. M. C. A. at 8:30 p. m. Monday, when a bourse of rare stamps will be shown by collectors in this vicinity. New officers of the society are Norman H. Brock, president; B. A. Turner, vice president; L. F. Fields, secretary and treasurer, and Edward Albach, reporter. Both the president and vice president were re-elected.

George W. Hill, M.D., dug out a skeleton "of unusual size" in a mound of Ashland County, Ohio. In 1879, a nine-foot, eight-inch skeleton was excavated from a mound near Brewersville, Indiana (Indianapolis News, Nov 10, 1975).

A six foot, six inch skeleton was found in a Utah mound. This was at least a foot taller than the average Indian height in the area, and these natives- what few there were of them -were not mound builders.

"A skeleton which is reported to have been of enormous dimensions" was

found in a clay coffin, with a sandstone slab containing hieroglyphics, during mound explorations by a Dr Everhart near Zanesville, Ohio. (American Antiquarian, v3, 1880, pg61).

In an old book entitled "History And Antiquities Of Allerdale," there is an account of a giant found in Cumberland, England, at an unknown date in the middle ages. Called "A True Report of Hugh Hodson, of Thorneway," it states: "The said gyant was buried four yards deep in the ground, which is now a corn field. He was four yards and a half long, and was in complete armor; his sword and battle-axe lying by him....his teeth were six inches long, and two inches broad...." The bones of a twelve foot tall man were dug up in 1833 by a group of soldiers at Lompock Rancho, California. The skeleton was

GIANT INDIAN SKELETONS

Roamed Indian Swamps 500 Years Ago Living on Shell Foods

Tampa, Fla. (AP).—Giant Indians who roamed Florida swamps 500 years or more, living on shell foods which they cracked with their teeth, is a picture unfolded by archeaologists who have delved into a burial ground on a gulf island near here.

The skeletons were discovered on a small section of land, where a lone fisherman has lived for years. Scientists estimated the bones are at least 500 years old and are remains of a tribe known as the Garibs, natives of the West Indies. They are believed to have inhabited the state and adjacent islands before the arrival of Spaniards in Florida.

The skulls, larger than those of current history, battered and crushed, indicated tribal battles. The jaw and teeth are unusually large. Likewise are the bod-- bones, indicating the Indians of past ages were veritable giants in comparison with those of today.

Mounds similar to the one in which the bones were unearthed are common in the state.

The bones have been sent to the Smithsonian Institution for further examination.

(AND NEVER HEARD OFF AGAIN!!!)

FROM "FL-LAWRENCE WORLD JOURNAL AUGUST 25-1927

surrounded by giant weapons, and the skull featured a double row of teeth. Yet another giant was unearthed in 1891, when workmen in Crittenden, Arizona excavated a huge stone coffin that had evidently once held the body of a man 12 feet tall. A carving on the granite case indicated that he had six

toes.

The skeleton of a huge man was uncovered at the Beckley farm, Lake Koronis, Minnesota; while at Moose Island and Pine City, bones of other giants came to light. (St. Paul Globe, Aug. 12, 1896).

When Giants Roamed Earth

The past was more prolific in the production of giants than the present. In 1830 one of these giants, who was exhibited at Rouen, was ten feet high, and the giant Galabra, brought from Arabia to Rome in the time of Claudius Caesar, was the same height. Fannum, who lived in the time of Eugene II, was eleven and one-half feet in height.

The Chevalier Scrog in his journey to the Peak Teneriffe found in one of the caverns of that mountain the head of a giant who had sixty teeth and who was not less than fifteen feet high. The giant Faragus, slain by Orlando, the nephew of Charlemagne, according to reports, was twenty-eight feet high. In 1814 near St. Gernad was found the tomb of the giant Isolent, who was not less than thirty feet high. In 1590 near Rouen was found a skeleton whose head held a bushel of corn and which was nineteen feet in height. The giant Bacrt was twenty-two feet high.

In 1623 near the castle in Dauphine a tomb was found thirty feet long, sixteen feet wide and eight feet high, on which were cut in gray stone the wards, "Kentolochus Rex." The skeleton was found entire and measured twenty-five and one-fourth feet high, ten feet across the shoulders and five feet from breastbone to the back.

But France is not the only country where giant skeletons have been unearthed. Near Palermo, Sicily, in 1516, was found the skeleton of a giant thirty feet high. Near Magrino, on the same island, in 1816, was found the skeleton of a giant of thirty feet whose head was the size of a hogshead and each tooth weighed five ounces.

Charity Machine a Wonder

"A charity machine," said the sailor, "stands in front of the house of Edison Murphy of Croydon. Any tramp that comes along can get a cent out of the machine.

"The tramps don't believe their eyes at first. They stand and look at the charity machine in a knowing way. They say to themselves that they ain't green, and it's no use tryin' to do them.

"But there the big, cast iron instrument stands, and it states plain and direct on the dial of it that any [illegible] if he turns the handle a while. Then he turns with the left hand. At fifty he stops to rest, and with a grunt he wipes the beads from his brow. Finally out drops a cent.

"The tramp grins. He thinks he'll turn ten hundred times, and get ten cents for two beers. He is pretty tired; though, by the time he's turned 500 times, and, besides, the morning is pretty well gone now. So he stops at the five hundred. He goes off with five coppers, rubbin' his arms. His arms'll be stiff next day.

"Hard-earned coppers! Edison Murphy calls his invention a charity machine, but there's not much charity

abroad, a noted doctor, quench what he considered tion, went down one eveni parson's grave in the chur the sea, and, sitting on th lit his pipe as the clock stru is true also that a succeedin er professed to have heard inexplicable noises proceed the attic in which the su curred, but he observed:

"As long as he keeps t don't mind." Some agnostic ed folk may have more n others.

Personally, I have heard many stories of what has be the right side of nature, no for publication, but as str periences by friends and ances whose honesty and go have no reason whatever to

A lady I know was resi her uncle and aunt. The dangerously ill. One even and niece were sitting in downstairs in which was an father's clock which had n for years. Suddenly, withou certained cause, the weigh

Ten skeletons "of both sexes and of gigantic size" were taken from a mound at Warren, Minnesota, 1883. (St. Paul Pioneer Press, May 23, 1883) A skeleton

7 feet 6 inches long was found in a massive stone structure that was likened to a temple chamber within a mound in Kanawha County, West Virginia, in 1884. (American Antiquarian, v6, 1884 133f. Cyrus Thomas, Report on Mound Explorations of the Bureau of Ethnology, 12th Annual Report, Smithsonian Bureau of Ethnology, 1890-91).

STRANGE SKELETONS FOUND.

Indications That Tribe Hitherto Unknown Once Lived in Wisconsin.

Special to The New York Times.

MADISON, Wis., May 3.—The discovery of several skeletons of human beings while excavating a mound at Lake Delavan indicates that a heretofore unknown race of men once inhabited Southern Wisconsin. Information of the discovery was brought to Madison to-day by Maurice Morrissey, of Delavan, who came here to attend a meeting of the Republican State Central committee. Curator Charles E. Brown of the State Historical Museum will investigate the discoveries within a few days.

Upon opening one large mound at Lake Lawn farm, eighteen skeletons were discovered by the Phillips Brothers. The heads, presumably those of men, are much larger than the heads of any race which inhabit America to-day. From directly over the eye sockets, the head slopes straight back and the nasal bones protrude far above the cheek bones. The jaw bones are long and pointed, bearing a minute resemblance to the head of the monkey. The teeth in the front of the jaw are regular molars.

There were also found in the mounds the skeletons, presumably of women, which had smaller heads, but were similar in facial characteristics. The skeletons were embedded in charcoal and covered over with layers of baked clay to shed water from the sepulchre.

The New York Times
Published: May 4, 1912

A large mound near Gasterville, Pennsylvania, contained a vault in which was found a skeleton measuring 7 feet 2 inches. Inscriptions were carved on the

vault. (American Antiquarian, v7, 1885, 52f).

In 1885, miners discovered the mummified remains of woman measuring 6 feet 8 inches tall holding an infant. The mummies were found in a cave behind a wall of rock in the Yosemite Valley.

In Minnesota, 1888, were discovered remains of seven skeletons 7 to 8 feet tall. (St. Paul Pioneer Press, June 29, 1888).

THE BISBEE DAILY REVIEW, BISBEE, ARIZONA, SUNDAY MORNING, JUNE 21, 1908.

GIANT SKELETON FOUND IN MEXICO

Charles C. Clapp a Boston broker of 19 Congress street, who has recently returned from Mexico, tells a remarkable story of the finding of the complete skeleton of a man who in life walked with his head nine feet above the earth. Mr. Clark said:

"Late one night, while we were sitting in the camp, a shot was heard from the distant hills. A party of us started out at once to investigate, for when the sound of a gun is heard in the State of Jalisco it means that a white man is shooting and that he means business.

"We finally located the forman of the mines, who said that on going to the window of his hut he had seen two shining eyes below and had fired. we at once started on the hunt, with men and torches, and discovered traces of a wounded mountain lion. Following the trail, we came to a cave, the mouth of which was blocked up with stones with the exception of a small hole where the stones had been clawed away, evidently by some wild animal.

"We crawled through this hole with our torches and found ourselves in a long cave. We walked along until we came to a spacious apartment. Here, strewn about on the floor of the cave were great numbers of human bones. I don't pretend to have any scientific knowledge of the human frame, but picking over the bones I was able to articulate a complete human skeleton, which measured just 8 feet 11 inches.

"The femur measure up to my thigh, the ribs were mare like those of a horse, the molars were big enough to crack a cocoanut, and the head from front to back measured 18 inches. I imagine there were enough of these bones to make 200 complete skeletons.

"The cave was evidently the burial place of a race of giants who antedate the Aztecs, and who subsisted upon the abundant game of the locality. Together with the bones, among the various relics found, was a massive stone hatchet, weighing 30 pounds.

"The Mexican government holds a jealous guard over its relics and buried treasures so that in order for the bones to be brought from that country for American scientists to study, it will be necessary for some noted archeologist to go down and arrange for their removal. I intend to see Professor Alexander Agassiz in regard to my discovery, and see if some attempt can be made to secure some of the bones to bring here.

"I have already interested Roland Thomas, the magazine writer in these prehistoric remains, and I expect that he will shortly visit the scene of my discovery, and prepare a report which will be given to the public later on."

A mound near Toledo, Ohio, held 20 skeletons, seated and facing east with jaws and teeth "twice as large as those of present day people," and besides each was a large bowl with "curiously wrought hieroglyphic figures." (Chicago Record, Oct. 24, 1895; cited by Ron G. Dobbins, NEARA Journal, v13, fall 1978).

In 1911, several red-haired mummies ranging from 6 and a half feet to 8 feet tall were discovered in a cave in Lovelock, Nevada. In February and June of 1931, large skeletons were found in the Humboldt lake bed near Lovelock, Nevada. The first of these two skeletons found
measured 8 1/2 feet tall and appeared to have been wrapped in a gum-covered fabric similiar to the Egyptian manner. The second skeleton was almost 10 feet long. (Review - Miner, June 19, 1931).

FIND GIANT SKELETON.

While Excavating at Westernport, Md., Bones Are Discovered.

Special Dispatch to The Star.

WESTERNPORT, Md., August 20.—While excavating for a building in the rear of the Morrison property here yesterday, William A. Liller, contractor, unearthed parts of a giant skeleton. The find was under a flat stone that weighed about half ton. The body had evidently been placed in a shallow excavation and this stone put over it. The stone itself had been buried several feet by earth and rocks that had slipped down off the cliff above, but when placed there had evidently been about level with the surrounding ground.

The top and front of the skull are in a fairly good state of preservation. The walls of the skull are thick and the cheek bones high, indicating that of an Indian. There is a large double tooth in the upper jaw near the front.

A 7 foot 7 inch skeleton was reported to have been found on the Friedman ranch, near Lovelock, Nevada, in 1939.(Review - Miner, Sept. 29, 1939) In 1965, a skeleton measuring 8 feet 9 inches was found buried under a rock ledge along the Holly Creek in east-central Kentucky.

AUSTRALIAN GIANTS:

There was a race or group of people found in Australia called "meganthropus" by anthropologists. These people were of very large size--estimated between 7 to 12 feet tall, depending on what source you read. These people were found with mega tool artifacts, so their humaneness is difficult to question. Four jaw fragments and thousands of teeth have been found in China of "gigantopithecus blacki"--named after the discover. Based on the size of the teeth and deep jaws, its size has been estimated at around 10 feet and as tall as 12 feet, 1200 pounds.

PROOF OF AUSTRALIAN GIANTS:

In old river gravels near Bathurst, NSW, huge stone artifacts -- clubs, pounders, adzes, chisels, knives and hand axes -- all of tremendous weight, lie scattered over a wide area. These weigh anything from 8, 10, 15, to 21 and 25 pounds, implements which only men of tremendous proportions could possibly have made and used. Estimates for the actual size of these men range from 10 to 12 feet tall and over, weighing from 500 to 600 lbs. A fossicker searching the Winburndale River north of Bathurst discovered a large quartzitised fossil human molar tooth, far too big for any normal modern man. A similar find was made near Dubbo, N.S.W.

Prospectors working in the Bathurst district in the 1930's frequently reported coming across numerous large human footprints fossilised in shoals of red jasper.

Even more impressive were fossil deposits found by naturalist Rex Gilroy around Bathurst. He excavated from a depth of 6 feet (2 m) below the surface a fossil lower back molar tooth measuring 67 mm. in length by 50mm. x 42 mm. across the crown. If his measurements are correct, the owner would have been at least 25 ft. tall, weighing well over 1,000 lbs!

MAY BE RELATED TO CARDIFF GIANT

Bones of a Human Skeleton Eleven Feet High Are Dug Up in Nevada.

WINNEMUCCA, Nev., Jan. 23.—Workmen engaged in digging gravel here today uncovered at a depth of about twelve feet a lot of bones, part of the skeleton of a gigantic human being.

Dr. Samuels examined them and pronounced them to be the bones of a man who must have been nearly eleven feet in height.

The metacarpal bones measure four and a half inches in length and are large in proportion. A part of the ulna was found and in its complete form would have been between seventeen and eighteen inches in length.

The remainder of the skeleton is being searched for.

The Saint Paul globe., January 24, 1904

At Gympie, Queensland, a farmer, Keith Walker, was ploughing his field when he turned up the large fragment of the back portion of a jaw which still possessed the hollow for a missing lower back molar tooth. This is now in Rex GiIroy's possession. The owner of the tooth would have stood at 10 feet tall.

In the Megalong Valley in the Blue Mountains NSW, a Mr P. Holman found in ironstone protruding from a creek bank the deeply impressed print of a large human-like foot. The print was that of the instep, with all 5 toes clearly shown. This footprint measures 7 inches across the toes. Had the footprint been complete it would have been at least 2 feet (60 cm in length, appropriate to a 12 foot human. However, the largest footprint found on the Blue Mountains must have belonged to a man 20 feet tall!

A set of 3 huge footprints was discovered near Mulgoa, south of Penrith, N.S.W. These prints, each measuring 2 ft long and 7 inches across the toes, are 6 ft. apart, indicating the stride of the 12 ft. giant who left them. These prints were preserved by volcanic lava and ash flows which "occurred millions of years" before man is supposed to have appeared on the Australian continent (if one is to believe the evolutionary theory): Noel Reeves found monstrous footprints near Kempsey, N.S.W. in sandstone beds on the Upper Macleay River. One print shows toe 4 inches (10cm) long and the total toe-span is 10 inches (25cm) - suggesting that the owner of the print may have been 17 feet tall.

GIANTS' SKELETONS FOUND.

Cave in Mexico Gives Up the Bones of an Ancient Race.

Special to The New York Times.

BOSTON, May 3.—Charles C. Clapp, who has recently returned from Mexico, where he has been in charge of Thomas W. Lawson's mining interests, has called the attention of Prof. Agassiz to a remarkable discovery made by him.

He found in Mexico a cave containing some 200 skeletons of men each above eight feet in height. The cave was evidently the burial place of a race of giants who antedated the Aztecs. Mr. Clapp arranged the bones of one of these skeletons and found the total length to be 8 feet 11 inches. The femur reached up to his thigh, and the molars were big enough to crack a cocoanut. The head measured eighteen inches from front to back.

The New York Times

Published: May 4, 1908

MORE GIANT RECORDS:

A living giant was sighted in the little village of Buffalo Mills, Pennsylvania, on August 19, 1973. A man at least nine feet tall strode down the main street of the village, dressed in strange clothing, which appeared to be made of some sort of shimmering material. He gazed at the startled townspeople in a dark, penetrating way and then loped off casually into oblivion.

OTHER GIANT EVIDENCES:

In July, 1877, four prospectors were looking for gold and silver outcroppings in a desolate, hilly area near the head of Spring Valley, not far from Eureka, Nevada.

VOL. 1.

Wonderful Discovery!

Great Excitement Among the Workmen--The Largest Skeleton Ever Found.

THE EXHUMATION OF AN ANTIDELUVIAN HUMAN SKELETON.

Day before yesterday, while the quarrymen, employed by the Sauk Rapids Water Power Company, were engaged in quarrying rock for the dam which is being erected across the Mississippi at this place, found imbedded in the solid granite rock the remains of a human being of gigantic stature. About seven feet below the

Scanning the rocks, one of the men spotted something peculiar projecting from a high ledge. Climbing up to get a better look, the prospector was surprised to find a human leg bone and knee cap sticking out of solid rock. He called to his companions, and together they dislodged the oddity with picks. Realizing they had a most unusual find, the men brought it into Eureka, where it was placed on display.

The stone in which the bones were embedded was a hard, dark red quartzite, and the bones themselves were almost black with carbonization - indicative of great age. When the surrounding stone was carefully chipped away, the specimen was found to be composed of a leg bone broken off four inches above the knee, the knee cap and joint, the lower leg bones, and the complete bones of the foot. Several medical doctors examined the remains, and were convinced that anatomically they had indeed once belonged to a human being, and a very modern-looking one.

RACE OF MEN WERE GIANTS

Bones Recently Found Show Gigantic Stature and a Low Order of Intelligence.

Eleven skeletons of primitive men, with foreheads sloping directly back from the eyes, and with two rows of teeth in the front upper jaw, have been uncovered in Craigshill at Ellensburg, Wash. They were found about twenty feet below the surface, twenty feet back from the face of the slope, in a cement rock formation over which was a layer of shale. The rock

But an intriguing aspect of the bones was their size: from knee to heel they measured 39 inches. Their owner in life had thus stood over 12 feet tall. Compounding the mystery further was the fact that the rock in which the bones were found was dated geologically to the era of the dinosaurs, the Jurassic - over 185 million years old. The local papers ran several stories on the marvelous find, and two museums sent investigators to see if any more

of the skeleton could be located. Unfortunately, nothing else but the leg and foot existed in the rock." Strange Relics from the Depths of the Earth--Jochmans

EVEN MORE RECORDS OF GIANTS:

In 1936 Larson Kohl, the German paleontologist and anthropologist, found the bones of gigantic men on the shore of Lake Elyasi in Central Africa. Other giant skeletons were later found in Hava, the Transvaal and China. The evidence for the existence of giants is incontrovertible. "A scientifically assured fact," says Dr. Louis Burkhalter.

1. Large bones in stone graves in Williamson County and White County, Tennessee. Discovered in the early 1800s, the average stature of these giants was 7 feet tall.

2. Giant skeletons found in the mid-1800s in New York state near Rutland and Rodman.
3. In 1833, soldiers digging at Lompock Rancho, California, discovered a male skeleton 12 feet tall. The skeleton was surrounded by caved shells, stone axes, other artifacts. The skeleton had double rows of upper and lower teeth. Unfortunately, this body was secretly buried because the local Indians became upset about the remains.
4. A giant skull and vertebrae found in Wisconsin and Kansas City.
5. A giant found off the California Coast on Santa Rosa Island in the 1800s was distinguished by its double rows of teeth.
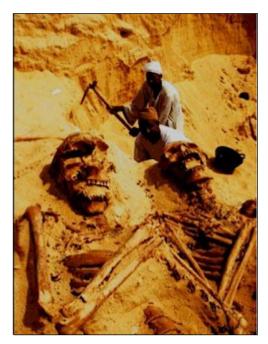
6. A 9-foot, 8-inch skeleton was excavated from a mount near Brewersville, Indiana, in 1879.

7. Skeletons of "enormous dimensions" were found in mounds near Zanesville, Ohio, and Warren, Minnesota, in the 1880s.

8. In Clearwater Minnesota, the skeletons of seven giants were found in mounds. These had receding foreheads and complete double dentition.
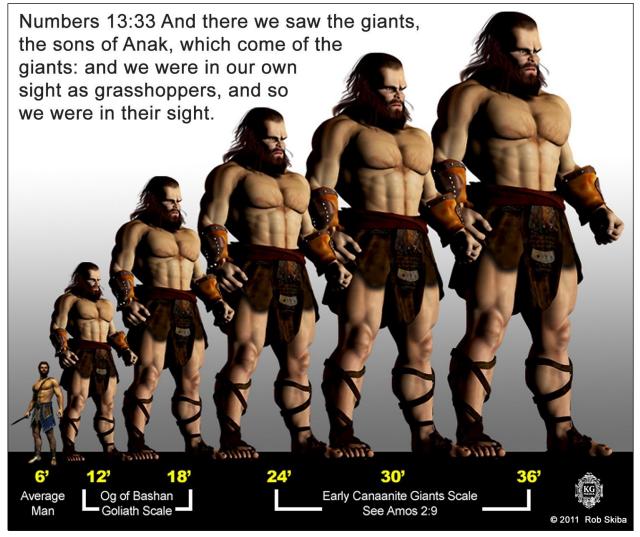
9. At Le Crescent, Wisconsin, mounds were found to contain giant bones. Five miles north near Dresbach, the bones of people over 8 feet tall were found.

10. In 1888 seven skeletons ranging from seven to 8 feet tall were discovered.

11. Near Toledo, Ohio, 20 skeletons were discovered with jaws and teeth

"twice as large as those of present day people." The account also noted that odd hieroglyphics were found with the bodies.

12. Miners in Lovelock Cave, California, discovered a very tall, red-haired mummy In 1911

13. This mummy eventually went to a fraternal lodge where it was used for "initiation purposes."

14. In 1931, skeletons from 8 ½ to 10 feet long were found in the Humbolt lake bed in California.
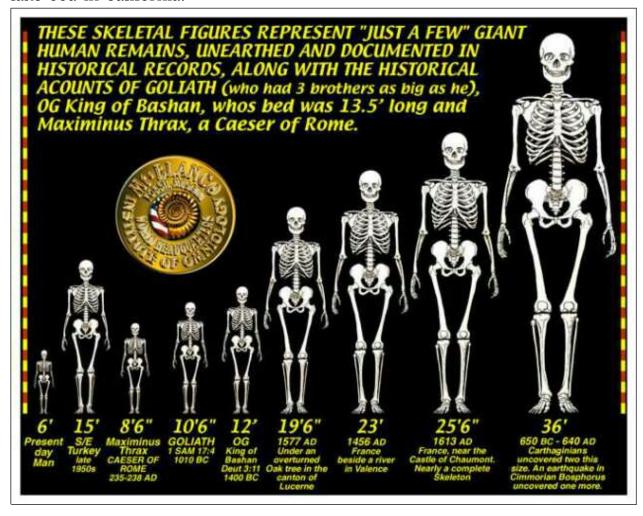
15. In 1932, Ellis Wright found human tracks in the gypsum rock at White Sands, New Mexico. His discovery was later backed up by Fred Arthur, Supervisor of the Lincoln National Park and others who reported that each

footprint was 22 inches long and from 8 to 10 inches wide. They were certain the prints were human in origin due to the outline of the perfect prints coupled with a readily apparent instep.

16. During World War II, author Ivan T. Sanderson tells of how his crew was bulldozing through sedimentary rock when it stumbled upon what appeared to be a graveyard. In it were crania that measured from 22 to 24 inches from base to crown nearly three times as large as an adult human skull. Had the creatures to whom these skulls belonged been properly proportioned, they undoubtedly would have been at least 12 feet tall or taller.
17. In 1947 a local newspaper reported the discovery of nine-foot-tall skeletons by amateur archeologists working in Death Valley.
18. The archeologists involved also claimed to have found what appeared to be the bones of tigers and dinosaurs with the human remains.
19. The Catalina Islands, off California, are the home of dwarf mammoth bones that were once roasted in ancient fire pits. These were roasted and eaten by human-like creatures who were giants with double rows of teeth.
[বিঃদ্রঃ চিত্রে দেওয়া দীর্ঘকায় স্কেলিটনগুলোর কোন কোনটিতে ফটোশপের ভূমিকা থাকতে পারে]
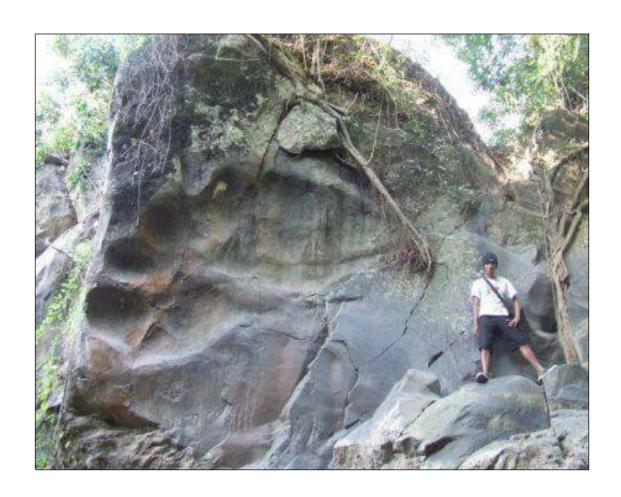
শুধুমাত্র লম্বা মানুষের হাড়,স্কেলিটনই নয় তাদের প্রস্তরীভূত(petrified) পায়ের ছাপও আজকের দিন পর্যন্ত টিকে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এত বড় পায়ের ছাপও পাওয়া গিয়েছে যেগুলো দৈর্ঘ্যে প্রায় আজকের যুগের একজন মানুষের সমান! তিনফুট, চার ও পাচফুটেরও বেশি দীর্ঘ পায়ের ছাপ আজ পর্যন্ত টিকে আছে। ভারতের lepakshi মন্দিরে প্রায় ৩ ফুট দৈর্ঘ্যের পায়ের ছাপ রয়েছে। হিন্দু-মুশরিকরা এখন এসব দীর্ঘদেহী মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ করে। এজন্য কোথাও বিশাল আকৃতির পায়ের ছাপ মিললেই শুরু হয়ে যায় সেটাকে ঘিরে পূজা অর্চনা, এমন কি মন্দির পর্যন্ত নির্মিত হয়। মুশরিকরা তো বড় গাছ দেখলেও পূজা শুরু করে দেয়!

এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ২.৫-৫ ফুট দীর্ঘ পায়ের ছাপের দেখা মিলেছে। আর্কিওলজিস্ট মিকাঈল টেলিঙ্গার দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ৪ ফুটেরও বেশি লম্বা পায়ের ছাপের কাছে পৌছান যেটা ১৯৩১ সালে এক কৃষক শিকারের সময় আবিষ্কার করেন। টেলিঙ্গারের ওই ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হয়[৫]। এছাড়াও জায়ান্ট হিউম্যানের লম্বা আঙ্গুল এবং ফসিলও তিনি প্রকাশ করেছেন[৬]

এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে হযরত আদম(আ) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শ্রীলংকায় অবতরণ করেন(এ ব্যপারে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক কোন দলিল নেই)। শ্রীলংকার আদমচূড়া(Adams peak) নামের পাহাড়ের উপরে ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ২ ফুড় ৬ ইঞ্চি প্রস্থের সুবিশাল পায়ের ছাপ রয়েছে যেটাকে অনেক খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা আদম (আঃ) এর প্রথম অবতরণের ফলে সৃষ্ট পদচিহ্ন বলে দাবি করে। স্থানীয় বৌদ্ধরা এর নাম দিয়েছে শ্রীপদ। বৌদ্ধরা একে বুদ্ধের পায়ের ছাপ এবং হিন্দুরা একে শিবের পায়ের ছাপ মনে করে বিভিন্নভাবে ভক্তি প্রদর্শন এবং পূজা করে [৭]।
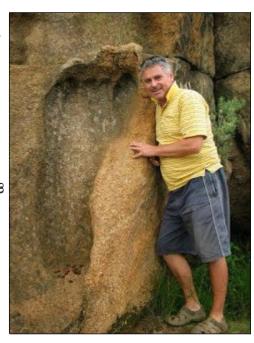
আদমচূড়া পর্বতের সুবিশাল পায়ের ছাপ আদম(আ) না কার, সেটা আলোচ্য বিষয় নয় বরং মূল বিষয় হচ্ছে এর আকৃতি। স্বাভাবিকভাবে এটা অনুমেয় এই পদযুগলের অধিকারী দেহ কত সুবিশাল হতে পারে! আগেই উল্লেখ করেছি মুশরিকদের শাস্ত্র যেহেতু ক্রিয়েশনিজমের বিরুদ্ধে অবস্থান করে, এরা জায়ান্ট হিউম্যান রেসের ফসিল ও পদচিহ্নগুলোর উপর দেবত্ব আরোপ করে। এরা বলে এটা আমাদের অমুক দেবতার পায়ের ছাপ। অবশ্য প্রাচীন যুগে এই দীর্ঘদেহী মানুষের মধ্যে অত্যাচারীরা খর্বাকৃতির মানুষদের উপর গোলামি চাপিয়ে দিতো। এজন্য সেসময়কার খর্বাকার মুশরিকদের মধ্যে জায়ান্ট হিউম্যানের মধ্যে দেবতুল্য প্রভুত্বের ধারনা ছিল যার জন্য হয়ত আজকে টিকে থাকা জায়ান্ট মানুষদের সাক্ষ্যপ্রমাণগুলোকে দেবদেবীর উপর আরোপ করে[৮]।

এ ব্যপারে আল্লাহ ভাল জানেন।

[বিঃদ্রঃ এখানে এরূপ বলছিনা যে মুশরিকদের দেবতা মানেই প্রাচীন দীর্ঘাকার মানুষ]

আজ দীর্ঘদেহী সেইসব দৈত্যাকার শক্তিশালী জাতি বেচে নেই কিন্তু টিকে আছে তাদের তৈরি সুউচ্চ স্থাপত্য, স্তম্ভ, ইমারত এবং মন্দির। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেগালিথিক জাইগ্যান্টিক স্ট্রাকচারের নির্মাতাদেরকে বিবর্তনবাদী আর্কিওলজি খুজে না পেলেও সেগুলোর বিশালতা এবং স্থাপত্য নৈপূন্য খুব সহজেই তাদের পরিচয় বলে দেয়।

পিরামিড
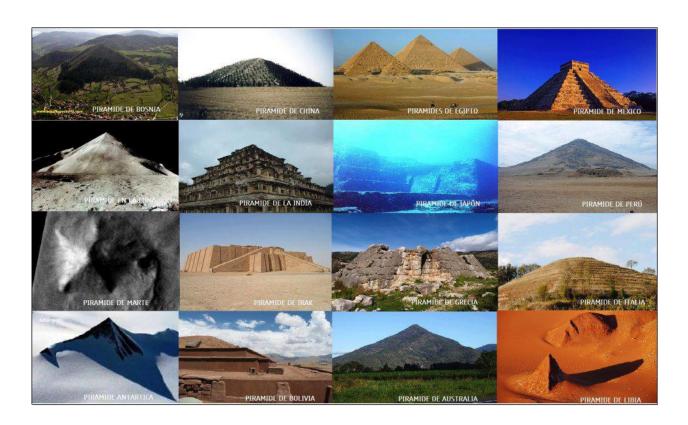
পিরামিড স্ট্র্যাকচার শুধু যে মিশরেই রয়েছে, তা নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পিরামিডগুলোকে নির্মাণ করা হয়েছিল। পৃথিবীর এক সমান্তরাল রেখায় কিছু তারকাদের অবস্থান বরাবর সেগুলোকে নির্মাণ করা হয়। পিরামিড আছে মিশরে,চীন, বলিভিয়া, পেরু,গুয়েতেমালা, সুদান, স্পেন,

রোম,ইরাক,
মেক্সিকোতে, এমনকি আমাজন জঙ্গলে ও সমুদ্রের নিচেও পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বলা হয় পিরামিড গুলো মমি বা মৃতদেহ সংরক্ষণ বা কবর হিসেবে ব্যবহার হয়। কিন্তু হয়ত এর মূল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। পিরামিড গুলো নিয়ে এই যুগে সবচেয়ে বেশি উন্মাদনা চলছে ইউটিউব সহ সব সোস্যাল নেটওয়ার্কে, অধিকাংশ মানুষের ধারনা এগুলো নির্মিত হয়েছিল ইলেক্ট্রিসিটি বা পাওয়ার হাউজ হিসেবে। অনেক মানুষ এর সপক্ষে দলিল প্রমাণ ও যুক্তিও দ্বার করায়। কিন্তু আসলে পিরামিড গুলোর রহস্যময় অবস্থানের সাথে তারকার সম্পর্ক এবং জটিল গাণিতিক ও জ্যামেতিক হিসাবের উপরে ভিত্তি করে নির্মাণের ব্যপারটি নির্দেশ করে, হয়ত পিরামিড দ্বারা ম্যাজিক্যাল রিচ্যুয়াল,ন্যাচারাল ম্যাজিক্যাল ফোর্স ম্যানিপুলেট করার উদ্দেশ্যে নির্মাণ হয়েছিল। হতে পারে এটা স্পিরিচুয়াল জগতের গেইটওয়ে হিসেবেও কাজ করে অর্থাৎ বিভিন্ন অকাল্ট কমিউনিটির মতানুযায়ী এগুলো পৃথিবীতে অন্য ডিমেনশনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিরিচুয়াল এনার্জি ব্যালেন্স রক্ষা করে। সহজ ভাষায় বুঝাতে গেলে বলব, শয়তানের জগতের সাথে আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে সংযোগ এবং যোগাযোগের দরজা তৈরিতে এবং সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে।

পিরামিড গুলোর অবস্থানগুলো চিহ্নিত করে রেখা টানলে একটা circumnavigation তৈরি হবে। ঠিক এই একই রেখার ব্যপারে হলিউডের Drag me to the hell ফিল্মে বলে এই রেখার অবস্থানগুলো শয়তানের জন্য স্পিরিচুয়াল গেইটওয়ে হিসেবে কাজ করে[৯]।পিরামিড গুলো ড্রাগন্স ট্রায়াঙ্গল এবং ডেভিলস ট্রায়াঙ্গল বরাবর রয়েছে। পিরামিড গুলোর আকৃতিও হাইপার ডিমেনশনাল ফিজিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ, অকাল্ট ফিলসফিতে বিশ্বাসী পশ্চিমারা এই জিওমেট্রিক শেইপকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, এই শেইপের স্ট্র্যাকচার তৈরি করে তার নিচে ধ্যান বা ঘুমে 'চেতনার ওপারে', এ্যাস্ট্রাল প্রোজেকশান, লুসিড ড্রিমিং ইত্যাদি তে খুব দ্রুত পৌঁছানো সহজ হয়।
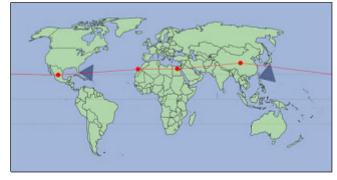
যাদুশাস্ত্রভিত্তিক প্যাগান দর্শনে বিশ্বাসী পশ্চিমারা এও বিশ্বাস করে পিরামিড যত সংখ্যায় বাড়বে ততই তাদের জন্য পজেটিভ এনার্জির পরিধি বাড়বে,রেডিয়েশন কমবে এজন্য তারা হঠাৎ করে পিরামিডের আকৃতিতে ক্রিস্টাল এবং অর্গোনাইট গিফটিং প্রজেক্টও হাতে নিয়েছিল[১০]। ক্রিস্টাল ম্যাজিক অনুযায়ী অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে ক্রিস্টালে প্রকৃতির মৌলিক প্রাণশক্তি আছে। তাছাড়া Dr. Wilhelm Reich এর দ্বারা প্রকৃতিতে অর্গন নামের মৌলিক এনার্জি ফিল্ডের অস্তিত্বের বিশ্বাস তত্ত্ব ও স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে পিরামিডের ডিজাইনে অর্গোনাইট নামের কিছু প্রোডাক্ট বের করেছে যা কিনা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃতিতে ওই অর্গন ফোর্স ফিল্ডের বা এনার্জির সঞ্চালন ত্বরান্বিত করে বলে প্রচারণা চালানো হয়[১১]।
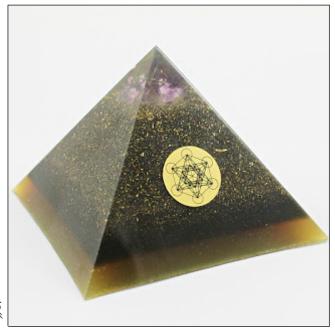
অর্থাৎ সেই পিরামিডেই প্রত্যাবর্তন। ওরা পিরামিড দ্বারা সর্বত্র ভরে দিতে চায়। যদি পিরামিড শেইপড স্ট্রাকচার স্পিরিচুয়াল ডিমেনশান এবং আমাদের ত্রিমাত্রিক জগতের মাঝে এনার্জি ফ্লো এর ভারসাম্য রাখে, (শয়তান জ্বীনের জন্য)একটা পথ তৈরি করে বা তাতে সহায়তা করে, তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না কেন ওরা সারা বিশ্বে পিরামিড দিয়ে ঢেকে দিতে চায়। পিরামিডে এমনিতেই অর্গন জাতীয় রহস্যময় যাদুকরি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব বেশি বলে প্রচার হয়, অতএব ভিন্ন ধরনের বিকল্প যাদুকরি infinite শক্তির ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে তারা কাজে লাগাতে চায়। এজন্য ইতোমধ্যে পিরামিড দ্বারা অবসেজড লোকেদের মধ্যে ইতোমধ্যে এর দ্বারা শক্তি উৎপাদনের কল্পনা জল্পনা আর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে[১২]। পিরামিড দ্বারা স্পেকুলেটেড শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ইতোমধ্যে এলিয়েন টেকনোলজির অন্তর্ভুক্ত বলা হচ্ছে। এক পিরামিড এন্থুজিয়াস্ট বলেন, এই পিরামিড দ্বারা শক্তি উৎপাদন সম্ভব বলে এলিয়েনরা(শয়তানরা)

জানিয়েছে। এখনো সেসব প্রকাশ করবে না যেহেতু তাদের(এলিয়েন/শয়তানদের) মতে এখনো সে সময় আসেনি।
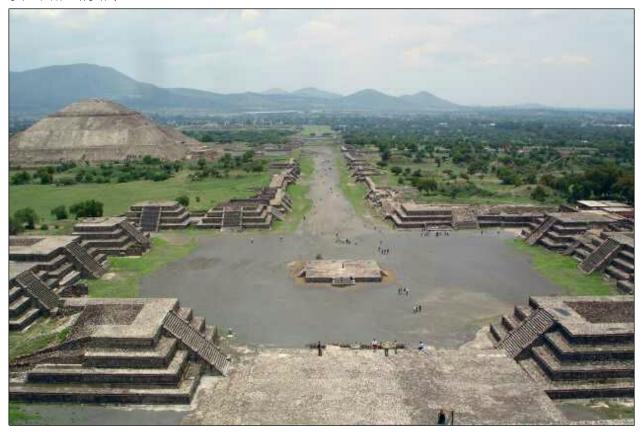
প্রাচীন যুগের এইসব স্থাপত্যকর্ম নির্মাতাদের বিভিন্ন জ্ঞানগত সমৃদ্ধিকে প্রকাশ করে, তাদের গাণিতিক, জ্যামিতিক অগাধ জ্ঞান ছিল সেটা সুনিশ্চিত। আবিদো মন্দিরের নিচে যে অকাল্ট জিওমেট্রিক বিদ্যার ছাপ পাওয়া যায় তাতে অবিশ্বাস করার কিছু পাই না যে ওরা বিকল্প শক্তি উৎপাদনের প্ল্যান্ট হিসেবে গ্রহন করেনি।। অর্থাৎ এরা হয়ত ম্যাজিক্যাল বিদ্যা বা তত্ত্বকে মেক্যানিক্যাল পর্যায়ে নেওয়ার বিদ্যাও রাখতো। ফিজিক্স আজকে যেসব বিদ্যাকে নতুন করে দেখাচ্ছে, যেগুলো তাদের কাছে সাধারণ বিজ্ঞান, সুতরাং আজকের বিদ্যুতনির্ভর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তারা হয়ত আমাদের চেয়ে এ্যাডভান্স ছিল না, কিন্তু জ্ঞানগত দিক দিয়ে আজকের স্বীকৃত বুদ্ধি আর বিদ্যার চেয়েও তাদের জ্ঞান-বিদ্যা গভীর এবং উন্নত ছিল। প্রাচীন যুগের অকাল্ট সায়েন্স নির্ভর প্রযুক্তি এবং আজকের প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, হয়ত তাদের প্রযুক্তি বেশি মাত্রায় holistic ছিল। সেসব প্রযুক্তি প্রাকৃতিক নীতি এবং শক্তির সাথে harmonic ছিল, কিন্তু আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তি natural forces এর সাথে collide/collision এর দ্বারা শক্তি উৎপাদন করে। অর্থাৎ তাদের কাছে ম্যাজিক্যাল ফোর্স ব্যাবহার করে শক্তি উৎপাদনের বিদ্যা ও জ্ঞান থাকতে পারে(আল্লাহ ভাল জানেন)। আজকের বিজ্ঞান ঠিক এর বিপরীতে হেটেছে এবং

পুনরায় ম্যাজিক ও মিস্টিসিজমের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে তাদের মসীহের নিয়ন্ত্রনে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দুনিয়াতে সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসকে বিলুপ্ত করে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

পিরামিডগুলো এমন সব স্থাপত্য যার ব্যাপারে আজকের উন্নত প্রযুক্তি হাতে বিজ্ঞানী ও আর্কিওলজিস্টগন এক বাক্যে বলে এসব আমাদের নিকট বিদ্যমান কোন প্রযুক্তি দ্বারা নির্মান সম্ভব না। এর কারন হচ্ছে নির্মানে ব্যবহৃত সুবিশাল মেগালিথিক স্ট্রাকচার। এক একটা পাথরের ওজন ৯০০ টনেরও বেশি।
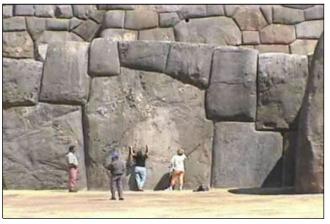
কিছু কিছু পাথর এত বিশাল যে সেগুলোর ওজন কত হতে পারে তা অজানা। এত বড় পাথর বহন এবং তা দিয়ে ইমারত নির্মানের প্রযুক্তি আসলে আমাদের নেই।

তাছাড়া পিরামিডে ব্যবহৃত অসাধারণ জিওমেট্রিক প্রোপোর্শনে এত বড় স্ট্রাকচার দ্বার করানো দুঃসাধ্য ব্যপার। বিবর্তনবাদী আর্কিওলজিস্টরা যেহেতু সাধারণভাবে এসব স্থাপত্যের ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাই এরা এলিয়েন বা বহির্জগতের প্রানী এবং তাদের দেওয়া উন্নত প্রযুক্তিকে(alien technology) এর পেছনে দ্বার করায়। কিন্তু সত্য হলো এসব সুবিশাল স্তম্ভ ও স্থাপত্যকর্ম প্রাচীন দীর্ঘাকার মানুষদের কাজ। যে পাথরগুলো আজকের সবচেয়ে বেশি

ভারী বোঝা বহনে সক্ষম ক্রেনেও বহন সম্ভব না সেসব দীর্ঘাকার শক্তিশালী কওমের কাছে বহনে দুঃসাধ্যের কিছু ছিল না। তাদের কাছে এগুলো ইট স্বরূপ। মিশরীয় হায়ারোগ্লিপ্সে তাদের বহন প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন।

একটা বড় মিথ্যা ইতিহাস সমাজে প্রচলিত আছে, বলা হয় পিরামিড গুলো ফেরাউনদের দ্বারা নির্মিত।এরা তো ফিরাউন বলতে বংশপরম্পরায় মিশরীয় শাসকদেরকে বুঝিয়ে সত্যিকারের ইতিহাস লুকায়, সত্য হচ্ছে ফেরাউন একজন মাত্র ব্যক্তির নাম ছিল[২১]। পিরামিড গুলো কখনোই ফেরাউনের স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে ছিল না, বরং ফেরাউনের নির্মিত সকল ইমারত, দালানকোঠাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ধ্বংস করেছেন।
আল্লাহ বলেনঃ

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।[৭:১৩৭]

সুতরাং এই স্থাপত্য কাদের দ্বারা নির্মিত? হতে পারে দীর্ঘাকার শক্তিশালি আদ জাতি অথবা এরূপ দীর্ঘদেহী কোন কওমের নির্মিত।দৈত্যাকার শক্তিশালী আদ জাতির দৈহিক বলিষ্ঠতা এবং দীর্ঘাকৃতির ব্যাপারে আল্লাহই উল্লেখ করেন।
আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন,যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি।[সূরা ফাজরঃ৬-৮]

হযরত মিকদাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ এর উল্লেখ করে বলেনঃ "তাদের এতো বেশী শক্তি ছিল যে, তাদের কেউ উঠতো এবং একটি (প্রকাণ্ড) পাথর উঠিয়ে অন্য কোন সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করতো। এ পাথরে চাপা পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা সবাই মারা যেতো।"[১]

হযরত আনাস ইবনে আইয়ায (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাওর ইবনে যায়েদ দাইলী (রঃ) বলেনঃ "আমি একটি পাতায় দেখেছি যে, তাতে লিখিত ছিলঃ "আমি শাদ্দাদ ইবনে আদ, আমি স্তম্ভ মজবুত করেছি, আমি হাত মযবুত করেছি, আমি সাথে হাতের একটি ধনভাণ্ডার জমা করে রেখেছি। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত এটা বের করবে।"[২] অথবা এটা বলা যায় যে, তারা উৎকৃষ্ট উচ্চবিশিষ্ট গৃহে বাস করতো। অথবা বলা যায় যে, তারা ছিল উচ্চ স্তম্ভের অধিকারী। অথবা তারা ছিল উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের মালিক। অথবা তারা দীর্ঘ দেহের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ তারা এক কওম বা সম্প্রদায় ছিল যাদের কথা কুরআনে সামূদ সম্প্রদায়ের সাথে বহু জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। এখানেও আদ ও সামূদ উভয় কওমের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ হলো একটি শহর, তার নাম হয় তো দামেস্ক অথবা আলেকজান্দ্রিয়া। কিন্তু এ উক্তি সঠিক বলে অনুভূত হয় না। কারণ এতে আয়াতের অর্থে সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া এখানে এটা বুঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেক হঠকারী বিশ্বাসঘাতককে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন যাদের নাম ছিল আ'দী, কোন শহরের কথা বুঝানো হয়নি। আমি এ সব কথা এখানে এ কারণেই বর্ণনা করেছি যে, যেন কতিপয় তাফসীরকারের অপব্যাখ্যায় কেউ বিভ্রান্ত না হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তোমরা কি আশ্চর্য্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে।

তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর-যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।[আরফঃ৬৯]

Record of obelisks construction and their giant human builders
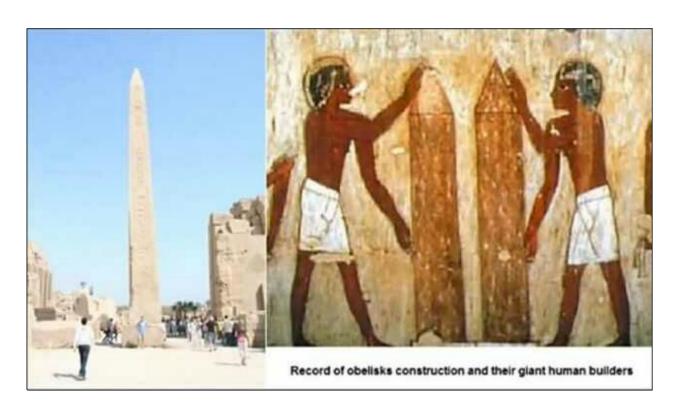
মিশরীয় obelisk[১৩] স্তম্ভগুলো আজও দাঁড়িয়ে আছে। হায়্রোগ্লিপ্সে খোদিত ছবিতে দেখা যায় সেগুলো নির্মাণ কৌশল। এই স্তম্ভ গুলোর চেয়ে এর প্রতিষ্ঠাতাদের শারীরিক উচ্চতা অনেক বেশি। উপরের ছবিতেই দেখতে পারছেন। এসব স্তম্ভের উচ্চতা কোন কোনটি ১০০ ফুটেরও বেশি। অতএব বুঝতেই পারছেন প্রাচীন মানুষের দৈর্ঘ্য এবং শক্তি। সেই সাথে বুঝতে পারছেন আদ জাতির দেহ সত্যিই সম্ভের ন্যায় লম্বা ছিল। আদ জাতিও উচু স্থান সমূহে উচু স্তম্ভ, ফলক নির্মান করত বিনা কারনে। তারা এমনভাবে বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণ করত,যেন তাতে চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ বলেনঃ

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ?এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে।[শু'আরাঃ১২৮-১২৯]

Petra : The lost city
সামূদ জাতির শহর

দানবাকৃতির আদ জাতির পর আল্লাহ সামূদ জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। কুরআনে আল্লাহ এদের শৌর্যবীর্যের কথা না বললেও এদের স্থাপত্যকর্মে নৈপুন্যের কথা বলেছেন। এরা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত। তারা পাহাড়ি উপত্যকার ভেতরে পাথর কেটে সুবিশাল কক্ষ তৈরি করত। আল্লাহ বলেনঃ

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।[সূরা আল ফাজরঃ০৯]

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ

তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত।[সূরা হিজরঃ৮২]
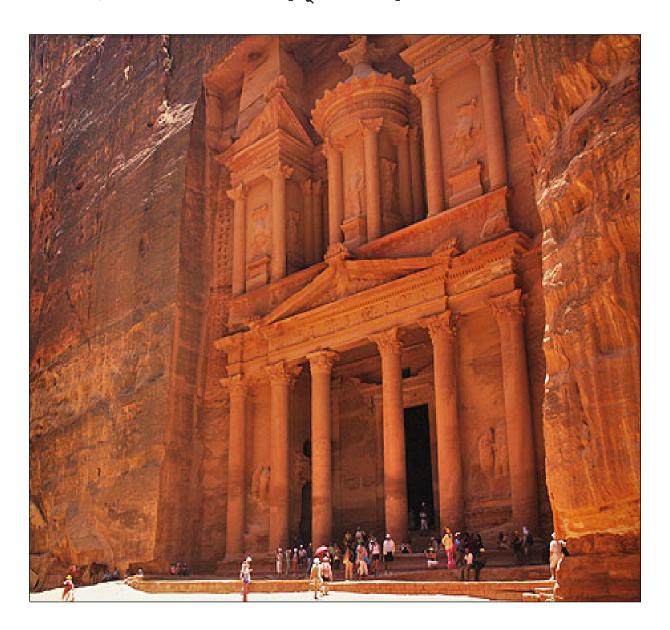
এরাও যে দীর্ঘদেহী ছিল সেটা তাদের নির্মিত গৃহের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাদের বসতি ছিল এই ধ্বংসপ্রাপ্ত পেট্রা নগরীতে। তৎকালীন সময় সামূদ জাতির শহর ছিল সবচেয়ে উন্নত এবং সমৃদ্ধ শহর। জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। কুরআনে উল্লিখিত সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত অভিশপ্ত শহর বন্দর এবং জাতি গুলো তৎকালীন সময়ে তেমনই ছিল যেমনভাবে আজ আমাদের মানসিকভাবে পরাজিত উম্মাহ আমেরিকা,চীন, রাশিয়ার দিকে তাকায়। আল্লাহ এই জাতিকে ধ্বংস

করেছেন একটি মাত্র বিকট শব্দের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এদের স্থাপত্যকর্মকে টিকিয়ে রেখেছেন আজকের যমীনে ঘুরে বেড়ানো অহংকারী অত্যাচারীদের শিক্ষা গ্রহনের জন্য।
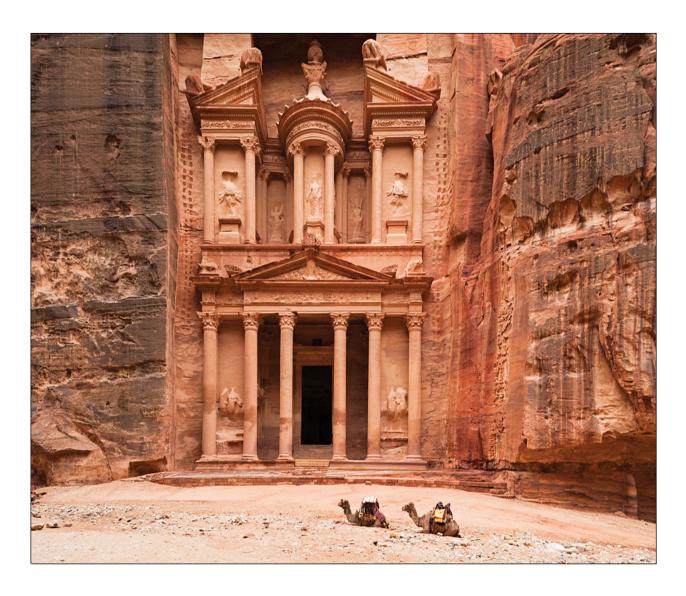
ছবিতে দেখতে পারছেন এদের সুবিশাল গৃহ বা প্রাসাদসমূহকে। এদের ঘরের সামনে উটগুলোকেও ক্ষুদ্র মনে হয়,মানুষকে মনে হয় পিঁপড়ে। হাজার বছর আগেও তাদের গৃহ গুলো কত রাজকীয় কারুকার্যে সজ্জিত ছিল! এরা অবশ্যই আজকের যুগের স্থাপত্যকলার জ্ঞানের চেয়ে উন্নত জ্ঞান রাখত যার জন্য পাহাড়ি পাথর কেটে ঘর/প্রাসাদ নির্মানের মত দুঃসাধ্য কাজ সহজ ছিল। এক আর্কিওলজিস্ট অবাক হয়ে বলেন,তাদের দালানকোঠা নির্মানের পদ্ধতিটা বিস্ময়কর, এরা আগে উপরের দিক দিয়ে নির্মাণকাজ শুরু করে এরপরে নিচের দিকটা করে যেটা আজকের স্থাপত্য নীতির বিপরীত।

অভিশপ্ত সামুদ জাতির নির্মিত এসব সুবিশাল সুউচ্চ গৃহগুলো দেখলে তাদের দৈহিক গড়নের ব্যপারে আঁচ করা যায়। এদের গৃহের দরজাগুলোয় পাশাপাশি ২০জন দাড়ালেও পুরোপুরি আটকে যাবে না। দরজার উচ্চতা আনুমানিক ৪০-৫০ ফুট। হয়ত সামুদ জাতি আদ জাতির ন্যায় অতবেশি দীর্ঘকায় ছিল না কিন্তু এরপরেও আজকের প্রেক্ষাপটে অতিকায়। আল্লাহ ভাল জানেন।

আজ কাফিররা যমীনে মু'মিনদের উপর সারা পৃথিবীতে নির্যাতন করছে। আজ উম্মাহ মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে গেছে। আমেরিকা,ইংল্যান্ড,রাশিয়া,চীন ইত্যাদি দেশগুলোকে অপরাজেয় এবং দুর্দমনীয় মনে করছে অথচ এদের চেয়েও শক্তিশালী জাতিগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ধবংস করেছেন। এমন প্রতাপশালী কওমগুলোকে ধবংস করেছেন যাদের ৫০ জনও যদি আমেরিকার উপর দিয়ে দৌড়ে যায়,তবে সন্ধ্যা হবার আগেই আমেরিকার অর্ধেক ঘরবাড়ি এবং সমগ্র শক্তি ধবংস হয়ে যাবে। যে সকল ধবংসপ্রাপ্ত অভিশপ্ত জাতির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, এরা সকলেই তাদের যুগ সমূহে সবচেয়ে শক্তিধর এবং অত্যাচারী। এমনকি এরা আজকের যেকোন কওমের চেয়েও শক্তিধর ছিল।

বালবেক মন্দির(Temple Baalbek)

বা'আল দেবতার জন্য নির্মিত হয়েছিল বালবেক মন্দির।লেবাননে অবস্থিত এই মন্দিরটি পৃথিবীর প্রাচীনতম স্থাপত্যকর্ম। এটি সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। অনেকে মনে করে এটা ৬-৯ হাজার বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। অনেকে বলে এটি মাত্র দুইহাজার বছর আগে নির্মিত। স্থানীয়দের লোকমুখে প্রচলিত আছে এই মন্দিরকে নমরুদ দানবাকৃতির মানুষদের দিয়ে নির্মাণ করায়। এর প্রকৃত নির্মাতা যারাই হোক না কেন, এই নির্মাণকর্ম আদৌ সাধারন কারও নয়। আজকের যুগের মানুষ যারা সেখানে পর্যটনের উদ্দেশ্যে যায় তাদের আকৃতি ওই বিশাল মন্দিরের তুলনায় পিপড়ের মত। এরা তো উচ্চতায় মন্দিরের পিলার সমূহের base কেই অতিক্রম করে না। মেগালিথিক স্টোন ব্লক দ্বারা নির্মিত স্ট্র্যাকচারগুলো আধুনিক কোন যন্ত্র দ্বারাই বহন যোগ্য নয়[১৫]।

প্রাচীন যুগের মুশরিকরা কত কিছুই করেছে এদের কাল্পনিক মিথ্যা দেবতাদের জন্য। যে বা'আলের পূজা তারা করত তার কথা কুরআনেও আল্লাহ বলেছেনঃ

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ
أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি ভয় কর না ? তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। [আস সাফফাতঃ১২৩-১২৫]

ধারনা করা হয় আমাদের দেশের বাউল সম্প্রদায় এই যৌনাচার এবং প্রজননের দেবতা বা'আল এরই অনুসারী এবং ওই মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। কালক্রমে এই বা'আল লোকধর্মই পরবর্তীতে

বাউল লোকধর্মে পরিণত হয়েছে এবং লোকনিরুক্তি অনুসারে বাউল শব্দটি বা'আল>বাওল>বাউল এভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে।[১৪]।

অতএব, এটা এটা খুব স্পষ্ট যে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেগালিথিক জাইগ্যান্টিক স্ট্রাকচারগুলো দীর্ঘকায় মানব জাতিরই গড়া। আমেরিকান লেখক,চল ব্র্যাড স্টেইগার বলেন,*" আজ পৃথিবীতে আমরা যেসব প্রাচীন শহর দেখি যেমন দক্ষিন আমেরিকার মাচুপিছু, টিওবোনাকো, শাসেহুমাং..আমি মনে করি সেগুলোর দালানকোঠার স্থাপত্য কারিগর আদি দীর্ঘদেহী মানুষগুলো, যারা ৫০০ টন, ২৫০ টন ওজনের সুবিশাল বিল্ডিং ব্লক গুলো দিয়ে সেগুলো নির্মান করে।"*

এ্যলবিয়ন লেখক জেনিফার ওয়েস্টউড বলেন," *ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম জায়ান্ট হিউম্যানদের বসতি ছিল*"। তার মতে স্টোনহেঞ্জও দানবাকার মানুষদের কাজ।

আমেরিকান জার্নালিস্ট এবং লেখক জিম মার্স বলেন," *আর্কিওলজির তখন খুব বড় দিন চলছিল, প্রত্যেকেই চেষ্টা করত কিছু খুজে দেখার, সবচেয়ে মজার বিষয় যে এই জায়ান্ট মানুষ এবং তাদের মমিকৃত মৃতদেহ,জীবাশ্ম-ফসিল এবং হাড় শুধুমাত্র পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলেই পাওয়া যাচ্ছিল বলে আপনি দেখাতে পারবেন না, বরং তাদের পাওয়া যাচ্ছিল ইতালিতে, মধ্যপ্রাচ্যে, আমেরিকায়। এরপরেও আপনি যদি এরকম কিছু লিখার চেষ্টা করেন ,যে জায়ান্ট হিউম্যান বা দীর্ঘদেহী মানবের বিষয় গুলো কোনরূপ ধাপ্পাবাজি বা অপব্যাখ্যা বা এরকমকিছু , তবে অবশ্যই বলব আপনি এখনো বিপুল সাক্ষ্যপ্রমাণের থেকে পিছিয়ে আছেন যেগুলো স্পষ্ট ভাবে বলে, কোন*

একটা সময়ে পৃথিবীতে এই জায়ান্ট বিং বা দানবাকার মানুষরা বসবাস করেছে।"

পাঁচ ছয় হাজার বছর আগে শুধু মানুষই যে দীর্ঘকায় ছিল এমন নয়, তৎকালীন সময়ে গাছপালা, পশুপাখি এমনকি কীটপতঙ্গও অতিকায় বৃহৎ ছিল। সেই দিক দিয়ে ভাবলে আজকের যুগে কোথাও আসল বনজঙ্গলের সামান্যভাগও অবশিষ্ট নেই। এমনটা হতে পারে মহাপ্লাবনের পূর্বে যমীনের গাছপালা ঐরূপ সুবিশাল আকৃতির ছিল। এর সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করে আজকের অনেক পেট্রিফাইড গাছের নিম্নভাগ(কথিত পাহাড়সমূহ) । মনোযোগের সাথে দেখলে অনেক কথিত পাহাড়ের সাথে কর্তিত গাছের শেকড়/গুঁড়ির(tree stamp) সাথে সাদৃশ্য খুজে পাবেন। অনেক মরুর বুকে বিশাল এলাকাজুড়ে থাকা গাছের শেকড়ভাগের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা কথিত পাহাড় ও টিলা গুলো আসলে একসময়ের দৈত্যাকার গাছ। আমরা আজ এদের কে পাহাড় ভেবে ভুল করছি।

এরা হয়ত কোন কোনটি হাজার ফুট দীর্ঘ ছিল। কিছু কিছু পাহাড়ের তো বাকলগুলোও এখনো স্পষ্ট রয়ে গেছে। নিচে এরকম কিছু ছবি দেওয়া হলোঃ

Tree
stump!
www.alamy.com - G0AXBC
Tree
stump?

NOTHING LOOKS MORE LIKE A GIANT PETRIFIED
TREE STUMP THAN A GIANT PETRIFIED TREE STUMP
imgflip.com

IS MONUMENT NATIONAL PARK
REALLY AN OLD GIANT PETRIFIED
FOREST?

JJP
TREE STUMP!
JJP
TREE STUMP ?
imgflip.com

Venezuela

Venezuela
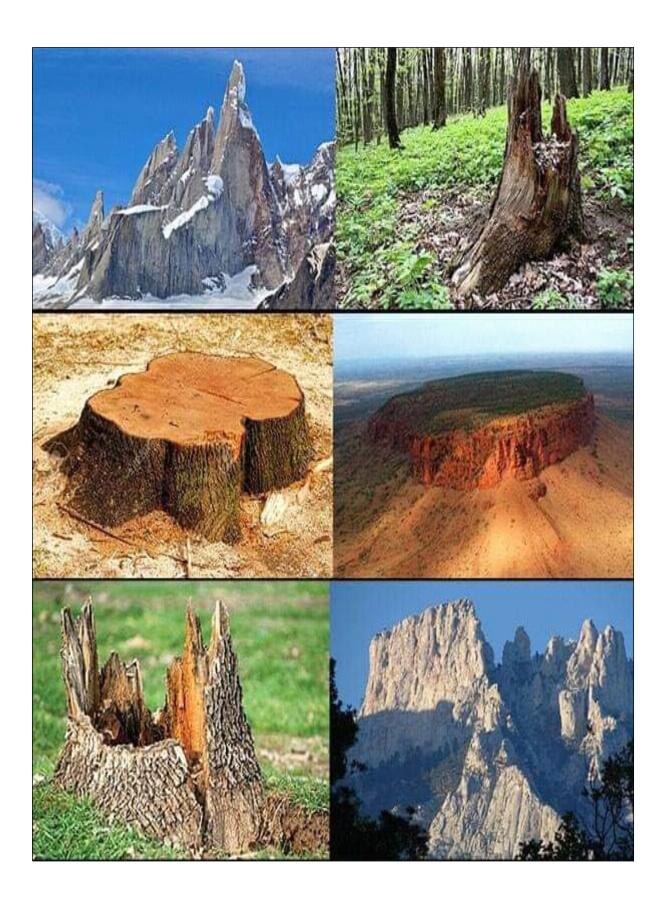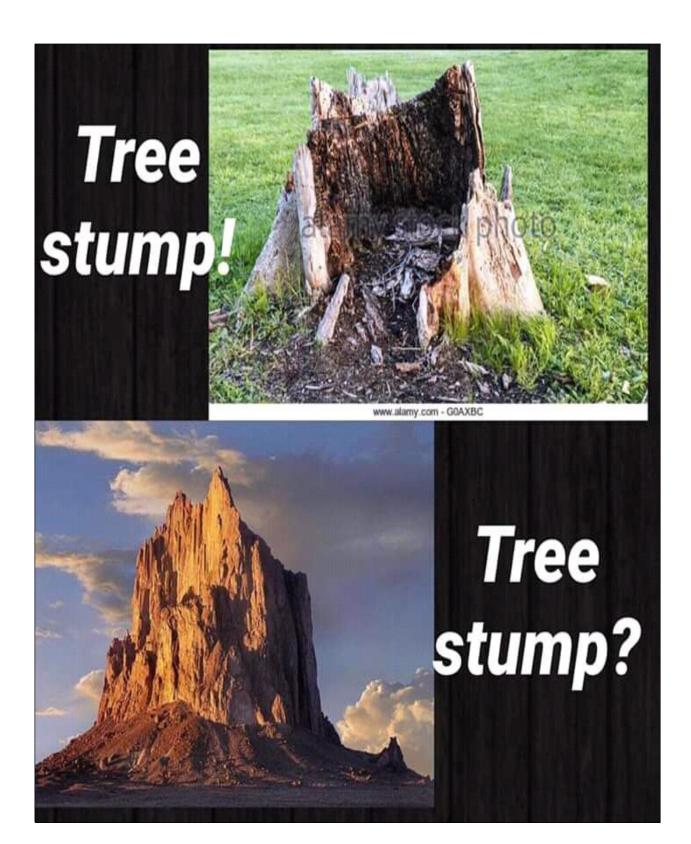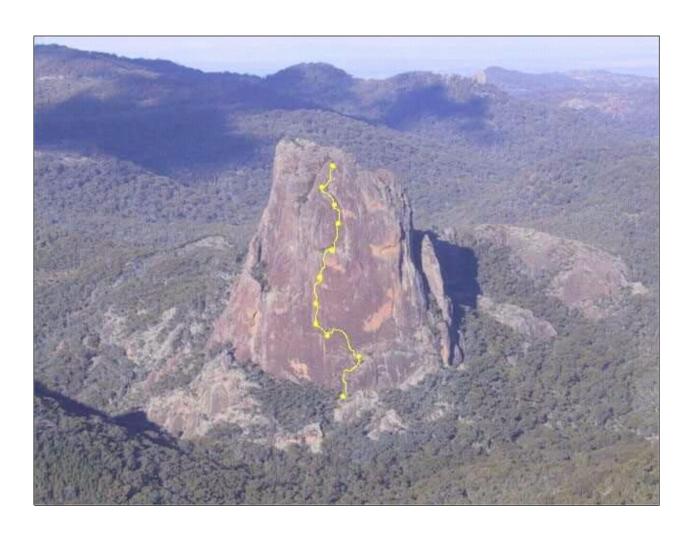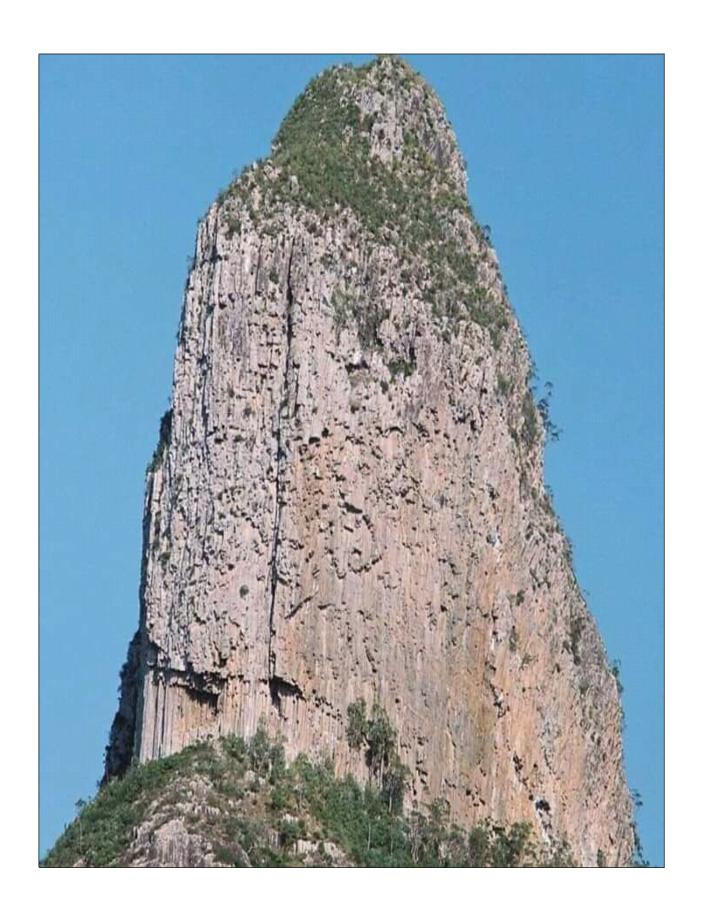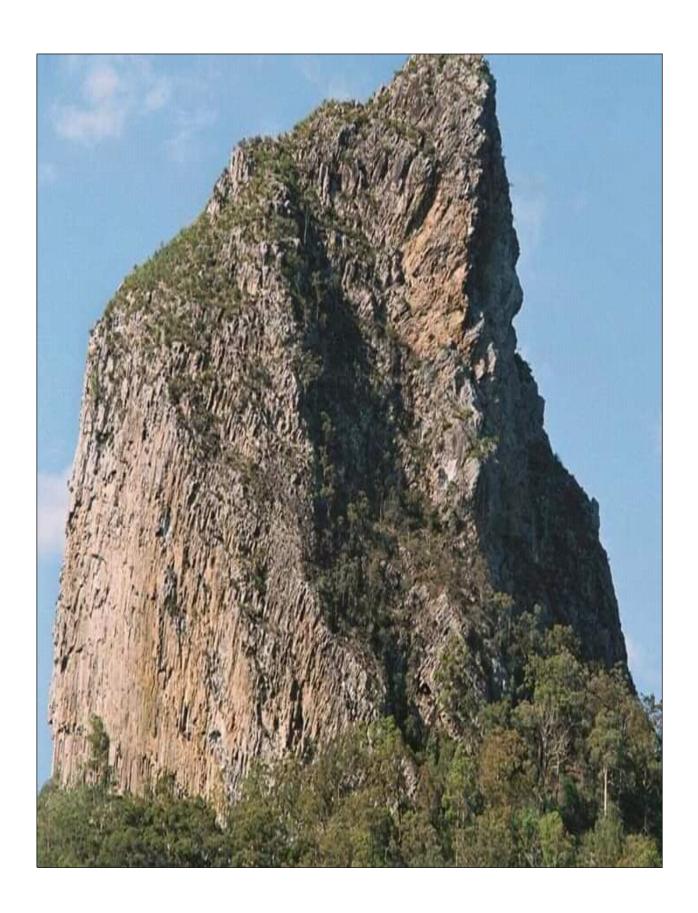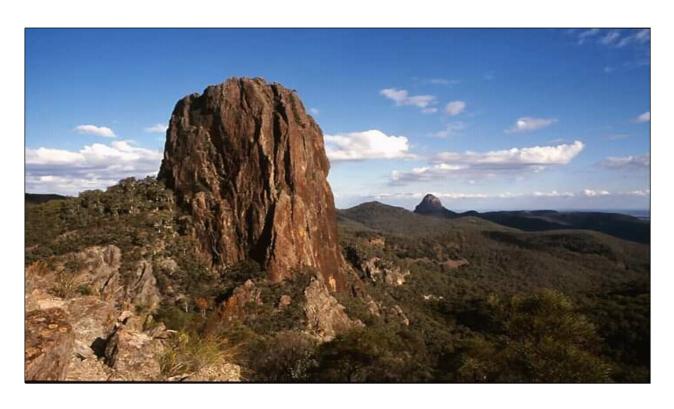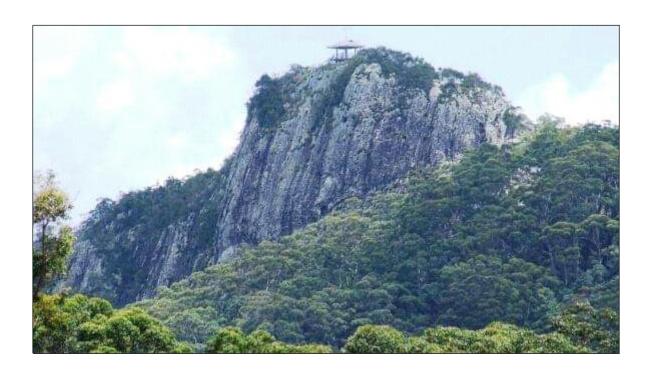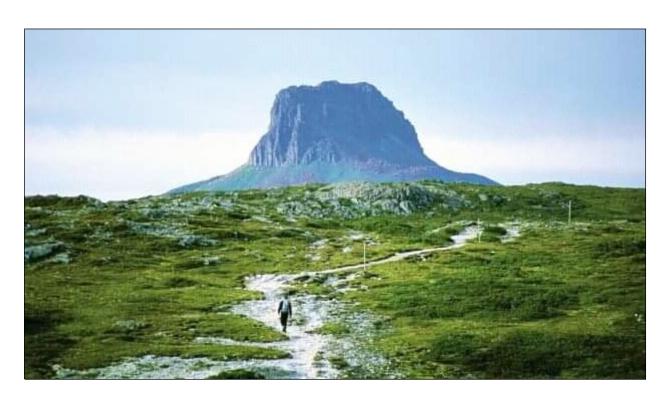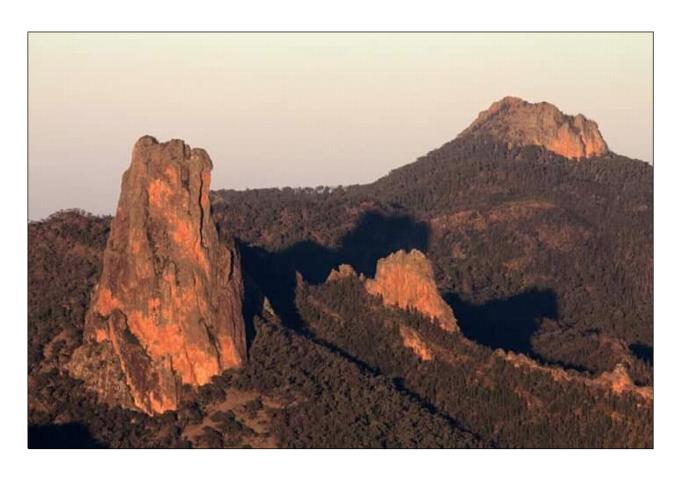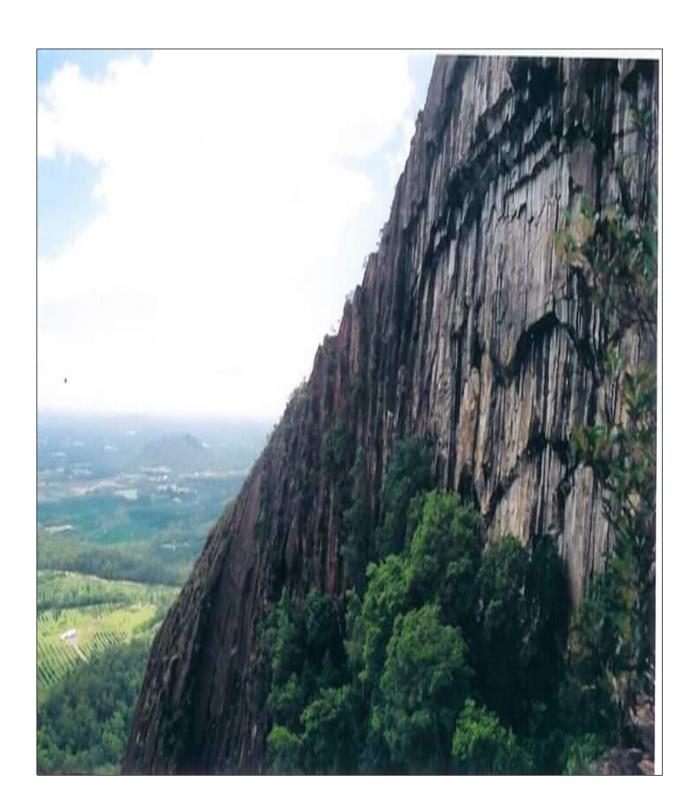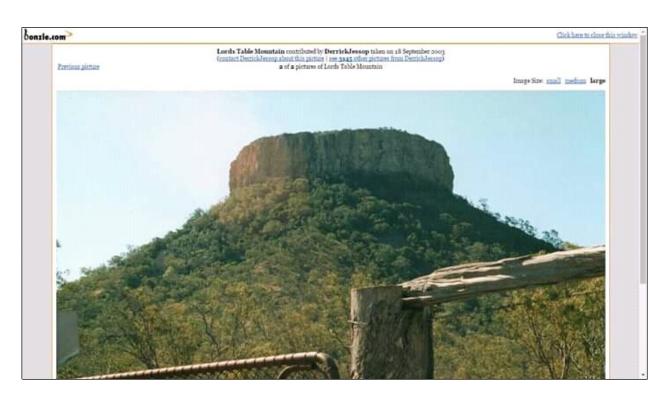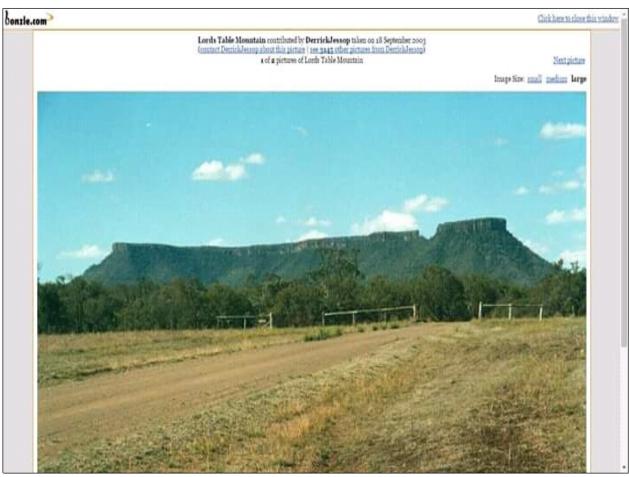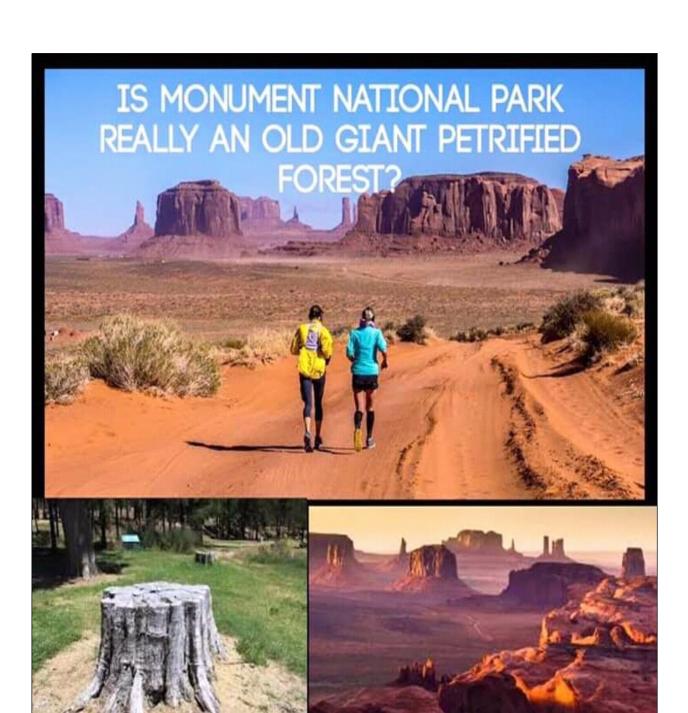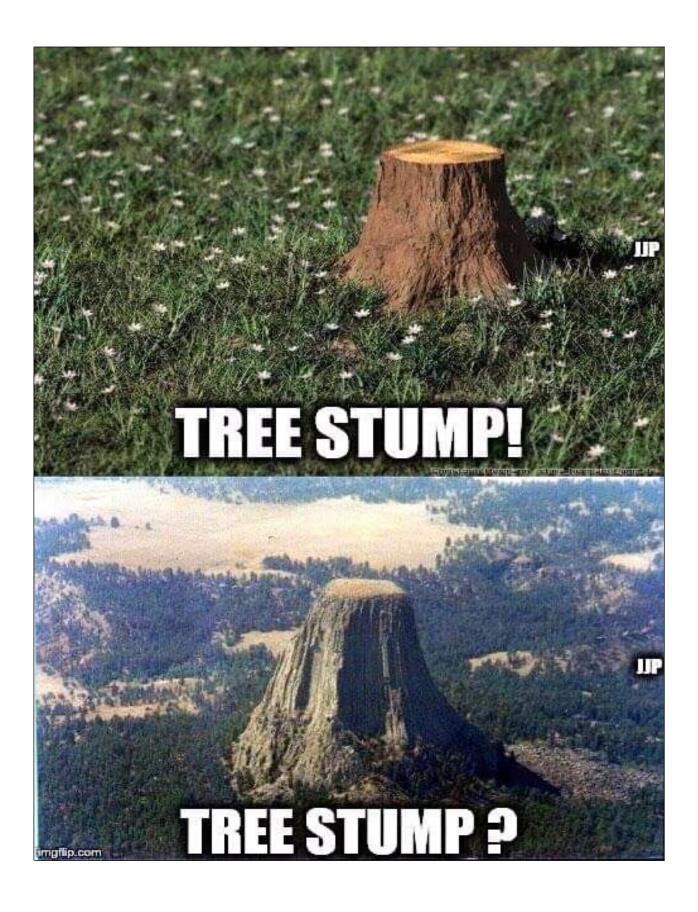
DEVIL'S TOWER IS AN ANCIENT MASSIVE TREE STUMP FROM THE DAYS OF OLD.
THE GIANT TREE IS STRATEGICALLY ADDED AND PLACED ON THE LEFT SIDE OF THE SIGN IMAGE HIDDEN IN PLAIN SIGHT
Devils Tower National Monument
ALEXIS
COMPARE THE "DEVIL'S TOWER" TO OTHER TREE STUMPS FOUND THROUGHTOUT THE WORLD...SEE THE STRIKING RESEMBLANCE?
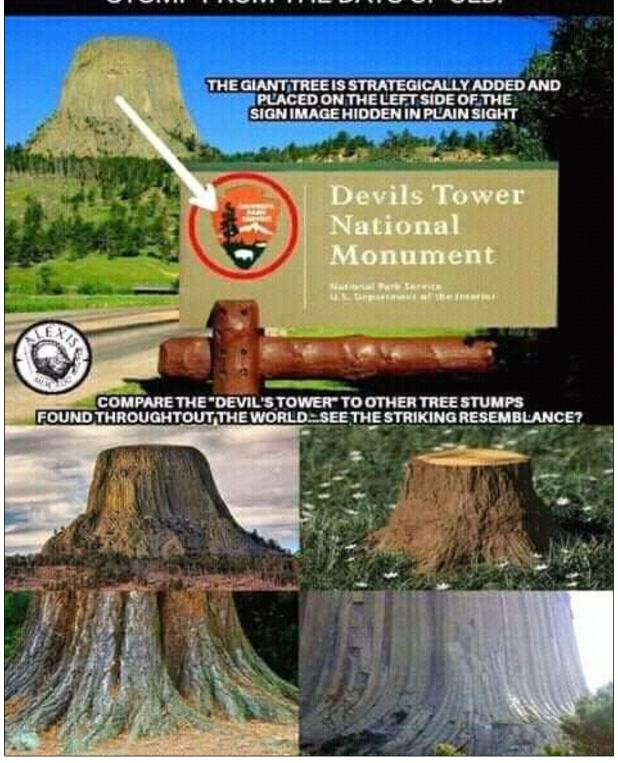
At its height this trees trunk was 2.5 miles across,

the tree full grown would reach 10 miles into the sky

EARTH BEFORE THE FLOOD

THE EARTH AFTER THE FLOOD

fb.com/aterraeplana
aterraeplana.com

এই গাছ গুলো হয়ত নূহ(আ) এর সময়কার মহাপ্লাবনে অথবা অন্য কোন কারনে ধবংস হয়ে যায় অথবা প্রাচীনকালেই অতিকায় জাতিরা কেটে ফেলে। আজও সামান্য কিছু অতিকায় গাছ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদেরকেও কেটে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন দৈত্যাকার গাছগুলোর তুলনায় এসব গাছ অনেক ছোট।
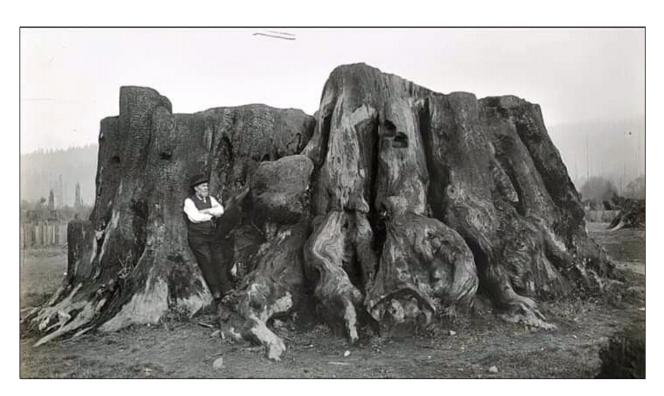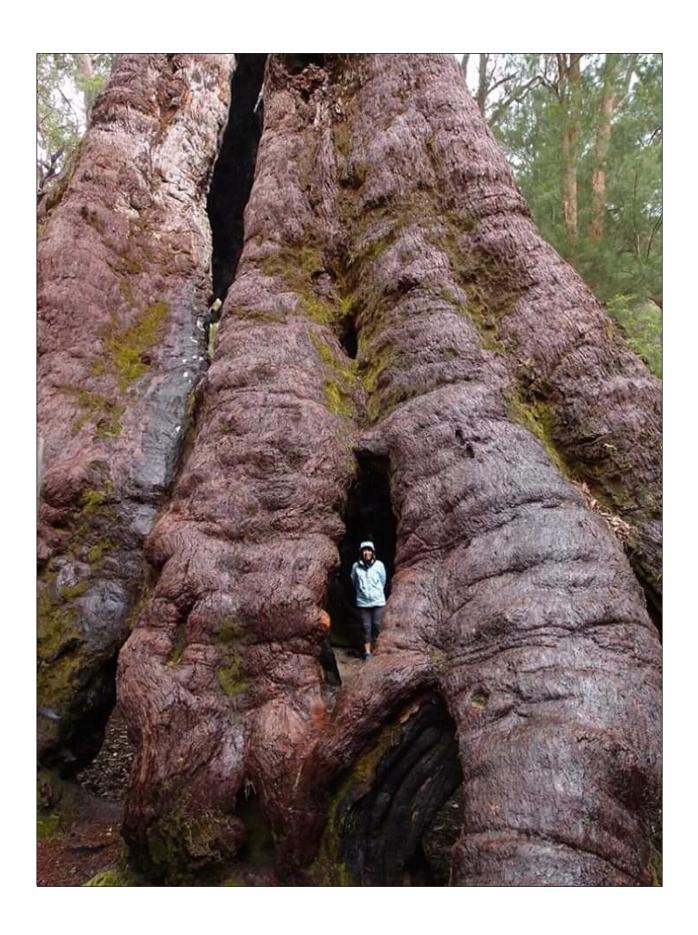
এসব সুবিশাল বৃক্ষগুলো জান্নাতের গাছ গুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেগুলোর ছায়ায় কোন অশ্ব আরোহী শত বছর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতে এক বিশাল গাছ আছে, যার ছায়াতলে যে কোন যাত্রী একশত বছর ধরে চলতে থাকবে (কিন্তু তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না)।
সহীহ : বুখারী (৩২৫২)।
আনাস ও আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণিতঃ
রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ’ বছর পর্যন্ত সফর করতে থাকবে। (ই.ফা. ৬৮৭৫, ই.সে. ৬৯৩২)

সহিহ মুসলিম
হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

ডক্টর কার্ল বও মনে করেন পরিবেশগত আনুকূল্যতা(favorable atmospheric condition) প্রাচীনযুগের সবকিছু অতিকায় হবার পেছনে রয়েছে। তিনি বলেনঃ *" অপটিক্যাল জেনেটিক*

এক্সপ্রেশন মানে অর্গ্যানিজম গুলোর সবচেয়ে ভাল ডিএনএ প্রকাশ পায় পরিবেশগত আনুকূল্যতার দরুন। বর্নিত পরিবেশগত আনুকূল্যতার জন্য গাছপালা এবং প্রানীদেহ আজকের তুলনায় আগে অনেক বড় আকারের হত এবং দীর্ঘজীবী হত। এটা ঠিক তাই ,যা আমরা ফসিল রেকর্ডে জিওলজ্যিক কলামে দেখতে পাই। গাছপালা এবং সকল জীবন্ত বস্তু অধিকতর বড় হত,আমরা এখন যে প্রানীগুলো দেখি তা ৮ বা ৯ ফুট উচু হয় যা ছিল পূর্বে ১৬-২০ দীর্ঘ। আমরা এখন যে সকল কীটপতঙ্গ দেখি যেমন ফড়িং, যেগুলোর আজ প্রায় ৪ ইঞ্চি পাখার দৈর্ঘ্য, কিন্তু এক সময় এর পাখা ৫ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল,যা ফসিল রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে। সব কিছু বড় বড় ছিল। পৃথিবীর আসল পরিবেশগত অবস্থার ব্যপারে আগ্রহী হবার পরে ৩৫ বছর টানা গবেষণার পর আমি এই গোটা ব্যপারটিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করি। এর জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগীতায় কৃত্রিম বায়োস্ফিয়ার তৈরি করি যেটাতে এ্যাটমোস্ফিয়োরিক প্রেশার দ্বিগুণ করি,এটাতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি, অক্সিজেনের লেভেলও বাড়ানো হয়(toxicity 'র লেভেলের আগ পর্যন্ত)। এতে আল্ট্রাভায়োলেট রে রেডিয়েশন একদম শূন্যতে আনা করা হয়। এবং এতে যে পরীক্ষা চালানো হয় তা খুবই সন্তোষজনক। আমাদের কন্ট্রোল্ড সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টে, আমরা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের উপর পালস ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইফেক্ট পরিমাপ করেছি। আমরা এখানে যে মাছ রেখেছি তার বয়স দেড় বছর। এর দৈর্ঘ্য স্বাভাবিক ভাবে প্রায় ১০ ইঞ্চির মত হবে। কিন্তু এখানে(কৃত্রিম বায়োস্ফিয়ারে) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ইঞ্চি। আমরা খুব দ্রুত গতিতে জায়ান্টিজম তৈরিতে সফল হয়েছি।"

হোয়াইটম্যান্স ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের বিজ্ঞানী ডক্টর মার্ভিন এ্যান্টেলম্যান বলেন," *আমি এই মতামত পোষণ করি যে প্রাচীন যুগের মানুষরা ভাল পরিবেশগত কারনে শুধু মাত্র লম্বা জীবনই পেতনা শুধু তারা অনেক লম্বাও ছিল।"*

হযরত মূসা (আ) যখন ইহুদীদের নিয়ে পবিত্রভূমির কাছে পৌছান, তখন সেখানে দানবাকার অতিকায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পান। তাদের সেখানে শুধু মানুষই না, গাছপালা ফলমূলও দৈত্যাকার ছিল যার বর্ননা হাদিসে এসেছে। অতএব অতিকায় মানবজাতির পাশাপাশি অতিকায় দৈত্যাকার গাছপালা এবং পশুপাখির যে বর্ননা দিয়েছি তা সত্য। এটা ফসিল রেকর্ডেও পাওয়া যায়।

মূসা(আ) এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ জায়ান্ট কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ এলে, ইহুদীরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে জিহাদে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লাহ বলেনঃ

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ
قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ
قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ ’ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ
قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

[সূরাতুল মায়েদা]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ)'আরীহা'র নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি বারোজন গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক গোত্র থেকে তিনি একজন করে গুপ্তচর গ্রহণ করলেন। অতঃপর সঠিক সংবাদ আনয়নের জন্যে তাদেরকে আরীহায় প্রেরণ করলেন। এ লোকগুলো তথায় গিয়ে তাদের মোটা দেহ ও শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলো। তারা সবাই একটা বাগানে অবস্থান করছিল। ঘটনাক্রমে বাগানের মালিক ফল পাড়ার জন্যে তথায় আগমন করলো। সে ফল পেড়ে নিয়ে ফলের সাথে সাথে ঐগুলোকেও গাঁঠরির মধ্যে ভরে নিলো এবং বাদশাহর সামনে হাযির হয়ে ফলের গাঁঠরি খুলে ফেললো। গাঁঠরির মধ্যে এরা সবাই ছিল। বাদশাহ তাদেরকে বললেনঃ "এখন তো আমাদের শক্তি অনুমান করতে পেরেছো। আমি তোমাদেরকে হত্যা করছি না। যাও, তোমাদের লোকদের কাছে ফিরে আমাদের সম্পর্কে অবহিত কর।" সুতরাং তারা ফিরে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো, যার ফলে বানী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু এ হাদীসটির ইসনাদ ঠিক নয়।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তাদের মধ্যে একটি লোক ঐ বারোজন লোককে ধরে ফেললো এবং স্বীয় চাদরের গাঁঠরিতে তাদেরকে বেঁধে ফেললো এবং শহরে নিয়ে গিয়ে জনগণের সামনে তাদেরকে নিক্ষেপ করলো। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ "তোমরা কোথাকার লোক?" তারা উত্তরে বললোঃ "আমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কওমের লোক। আপনাদের খবরাখবর নেয়ার জন্যে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।" তারা এমন একটি আঙ্গুর তাদেরকে প্রদান করলো যা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট ছিল। আর তারা তাদেরকে বললোঃ "যাও, তোমরা তোমাদের লোকদেরকে বলে দাও যে, এটা হচ্ছে তাদের ফল।" তারা ফিরে গিয়ে স্বীয় কওমের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে ঐ শহরে প্রবেশ করার ও শহরবাসীদের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলো—আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন, অতঃপর যুদ্ধ করুন, আমরা এখান হতে নড়ছি না।

হযরত আনাস (রাঃ) একটি বাঁশ মেপে নেন যার দৈর্ঘ ছিল পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাত। অতঃপর তিনি ওটা গেড়ে দিয়ে বলেনঃ "ঐ আমালীকদের দেহ এ পরিমাণ লম্বা ছিল।"

সুতরাং পাঁচ,ছয় হাজার বছর পূর্বে, এমনকি মূসা(আ) এর যুগেও তাদের পাশাপাশি দীর্ঘকায় জাতির বসতি ছিল। সমস্ত লিভিং অর্গ্যানিজম সেখানে ঐরূপ অতিকায় ছিল। আজকের ক্ষুদ্র আঙ্গুর ফলও এত বড় ছিল যে তা একজনের জন্য যথেষ্ট। তাদের ফলের ঝুড়িতেই ফলের সাথে অনেক জনকে নেওয়া যেত। এই সাক্ষ্যপ্রমাণসমূহ বিবর্তনবাদী চিন্তার বিপরীতের। আমাদের দেশীয় বিবর্তনবাদী মুক্তমনারা আদম(আ) এর উচ্চতা এবং প্রাচীন দীর্ঘাকৃতির মানুষের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, এদের কাছে এটা এজন্যই অগ্রহণযোগ্য যে, এটা বিবর্তনবাদের সাথে সাংঘর্ষিক[১৬]।
বিবর্তনবাদের এই শয়তানি কন্সেপ্টের গোড়া খুজতে থাকলে মিলবে অকাল্ট মিস্ট্রি স্কুল। এসেছে বাবেল অথবা মিশর থেকে। এগুলো সন্দেহাতীতভাবে হায়ার ডাইমেনশনাল এন্টিটির(শয়তান) কথা বৈ কিছু নয়। ইতোপূর্বে এ নিয়ে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম[১]।
বিবর্তনবাদের লক্ষ্য আল্লাহর উপর এবং আল্লাহর থেকে আসা সকল কিতাবের জ্ঞানের ব্যপারে অবিশ্বাস সৃষ্টি। এই বিবর্তনবাদ শুধু প্রানের বিকাশের সাথেই সম্পর্কযুক্ত না বরং এর গোটা আসমান যমীন এবং গোটা অস্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওরা যে বিগব্যাং নির্ভর সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলে সেটা হচ্ছে Cosmological Evolution! অর্থাৎ কোনরূপ সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন ও হস্তক্ষেপ ছাড়াই আসমান-যমীন একা একাই শূন্য থেকে সৃষ্টি ও বিকশিত হবার কল্পনা!
বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এই পৃথিবী ও সমস্ত সৃষ্টির বয়স বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর। বানর থেকে মানুষ হবার গল্পই লক্ষ লক্ষ বছরের হিসাব। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান যমীনকে সৃষ্টি করেন ৬দিনে(পৃথিবীর ৬০০০ বছর) এবং আদম(আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত এর বয়স ৭০০০ বছর গড়ায় নি।

ইবনু আববাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الدُّنْيَا جُمُعَةٌ مِنْ جُمَعِ الْآخِرَةِ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَقَدْ مَضَى سِتَّةُ آلَافٍ وَمِائَةُ سَنَةٍ- 'দুনিয়া হ'ল আখেরাতের জুম'আ সমূহের মধ্যে একটি জুম'আর সমতুল্য। আর তা হ'ল সাত হাযার বছর।
[তারীখু ত্বাবারী ১/১০, ১৬ ; ইবনু আবী হাতেম হা/১৩৯৮৭, ১৮৪৩৪; শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ৩/৫৪৫; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/২৬৪৪।]

যাহহাক বিন যিম্ল আল-জুহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ.. فَإِذَا أَنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مِنْبَرٍ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ، وَأَنْتَ فِي أَعْلَاهَا دَرَجَةً... وَأَمَّا الْمِنْبَرُ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ وَأَنَا فِي أَعْلَى دَرَجَةٍ، فَالدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَأَنَا فِي آخِرِهَا أَلْفًا-

'রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতের পর ছাহাবীদেরকে তাদের রাতে দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম... হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একটি মিম্বারের উপর আছেন যার সাতটি স্তর ছিল। আর আপনি সর্বোচ্চ স্তরে আরোহন করেছেন।... এর ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর অর্থ হ'ল দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর আর আমি সপ্তম সহস্রাব্দে পদার্পণ করছি' [ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮১৪৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১৭৭২; বায়হাকী, দালায়েলুল নবুঅত হা/২৯৬০; সুহায়লী, আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩০।]

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ مُدَّةُ الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا نُعَذَّبُ بِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا يَوْمًا وَاحِدًا فِي النَّارِ، وَإِنَّمَا هِيَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ-

'ইহূদীরা বলত, পৃথিবীর মেয়াদকাল সাত হাযার বছর। পৃথিবীর দিনসমূহের তুলনায় প্রতি হাযারে আমাদেরকে একদিন জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা নির্দিষ্ট সাতদিন। এরপর শাস্তি মওকূফ হয়ে যাবে। এর প্রতিবাদে আললাহ তা'আলা নাযিল করেন, 'আর তারা বলে, আমাদের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না'...। [বাকারাহ ১/৮০; মু'জামুল কাবীর হা/১১১৬০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৮৩৬; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/২১৯৪; সুহায়লী, আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩০; বর্ণনাটি বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থেও রয়েছে।]

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন জনৈক নওমুসলিম আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِن الله تَعَالَى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} وَجَعَلَ أَجَلَ الدُّنْيَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، وَجَعَلَ السَّاعَةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ}، فَقَدْ مَضَتِ السِّتَّةُ الْأَيَّامُ، وَأَنْتُمْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি দুনিয়ার বয়স ছয় দিন নির্ধারণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত সপ্তম দিনে ধার্য করেছেন। 'তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার

বছরের সমান' (হজ্জ ২২/৪৭)। এর মধ্যে ছয় দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং তোমরা সপ্তম দিনে অবস্থান করছ।
[তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম হা/১৩৯৮৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/৪৪০; তারীখুল খামীস ১/৩৪; দুররুল মানছূর ৬/৬৩।]

ওছমান বিন যায়দাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ كُرْزٌ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تُرِيحُ نَفْسَكَ سَاعَةً؟ فَقَالَ: كَمْ بَلَغَكُمْ عُمَرُ الدُّنْيَا؟ قَالُوا: سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ. قَالَ: فَكَمْ بَلَغَكُمْ مِقْدَارُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا: خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ. قَالَ: أَفَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ سُبْعَ يَوْمٍ حَتَّى يَأْمَنَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ *'কুরয ইবাদতে মশগূল থাকতেন। তাকে বলা হ'ল, আপনি কি কিছু সময় নিজেকে বিশ্রাম দিবেন না? তিনি বললেন, পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে তোমাদের নিকট কি সংবাদ পেঁŠছেছে? তারা বলল, সাত হাযার বছর। তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিনের পরিমাণ সম্পর্কে কি সংবাদ পেয়েছ? তারা বলল, পঞ্চাশ হাযার বছর। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দিনের এক সপ্তাংশ সময় আমল করতে সক্ষম হবে, যাতে সে ঐ দিনে নিরাপত্তা লাভ করবে?'।*
[আল-মুজালাসা হা/৯১৭; সাখাভী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/১২৪৩; সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ২/১০৭; ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/৬৯।]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُسْلِمِ فِي اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ عُمُرَ الدُّنْيَا سَبْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ، صِيَامُ نَهَارِهِ وَقِيَامُ لَيْلِهِ *'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমানের কোন প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার আমলনামায় পৃথিবীর বয়স সাত হাযার বছরের সমপরিমাণ দিনে ছিয়াম ও রাতে ক্বিয়াম করার ছওয়াব লিখে দিবেন'।*
[ইবনু আসাকির ২৩/১৩৩; আল-হাভী ২/১০৫।]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عُمْرُ الدُّنْيَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ) *আখেরাতের দিনগুলোর তুলনায় পৃথিবীর বয়স সাত দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান'।*
[হজ্জ ২২/৪৭)-(তারীখে জুরজান ১/১৪০; ফালাকী, আল-ফাওয়ায়েদ ২/৮৮ ; আল-হাভী ২/১০৫।]

ইবনু আববাস থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, الدّنْيَا سَبْعَةُ أَيَامٍ كُلّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَةٍ وَبُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهَا 'দুনিয়া সাতদিন। প্রতিদিন এক হাজার বছরের সমান। আর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে এর শেষদিনে'।
[সুয়ূতী, আল-লাআ'লিল মাছনূ'আ ২/৩৬৯; সুহায়লী, আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩৮; উমদাতুল ক্বারী ৫/৫২-৫৩।]

[৭০০০ বছর,মুসলিম উম্মাহর ১৫০০ বছর প্রভৃতি হাদিসকে ব্যবহার করে নানারূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কিয়ামতের সময় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন তোলা জ্ঞানী মুসলিমের কাজ না। নিঃসন্দেহে কিয়ামতসংক্রান্ত সমস্ত(গায়েবের) জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ
يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটেই।

وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান।]

সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষকোটি বছরের বিবর্তনবাদী হিসাব একদম অসত্য। ওরা যা বলে তা ইসলামের শিক্ষা ও আকিদার বিপরীত। শরী'আতে এর কোন গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও একদল মুসলিম ঠিকই প্রচলিত অপবিজ্ঞানের সাথে আপোষে গিয়ে এরূপ বলে যে, 'আদম(আ) শুধু আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু অন্য সকল সৃষ্টি বিবর্তনের ফসল'। ইতোপূর্বে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সরাসরি সমস্ত প্রানীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির কথা বলেছেন। ওই অপবিজ্ঞানঘেষা এ্যাপোলোজেটিক মুসলিমরাই বিবর্তনবাদী কুফরি থিওরিগুলোর সাথে সাংঘর্ষিকতা দূর করতে শার'ঈ দলিলগুলোর যেগুলো বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক সেসবের মধ্যে দুর্বলতা খুঁজে খুঁজে বাদ দিতে চেষ্টা করে। এরা তারাই যারা ৭ হাজার বছরের পৃথিবীকে অবিশ্বাস করে, ৬ হাজার বছরে(৬ দিনে) সৃষ্ট আসমান যমীনের (অপবিজ্ঞান ঘেঁষা)বিকৃত রূপ উপস্থাপন করে এবং প্রচার করে।
অথচ এরা যে বিবর্তনবাদের সমর্থন করে, যে অপবিদ্যার সামনে মাথানত করে সে শিক্ষার ধারকদের কাছে যখন ডারউইনিয়ান এভ্যুল্যুশনের পর্যবেক্ষণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ চেয়ে প্রশ্ন করা হয়,

এদের থেকে কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। এক খ্রিষ্টধর্মের প্রিচার ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা এবং ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করে বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চেয়ে। তাদের কারো কাছেই কোন উত্তর ছিল না। অবশেষে তারা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় যে বিবর্তনবাদ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাস করবার জন্য বিকল্প বিশ্বাস ব্যবস্থা। এক শিক্ষার্থী সরাসরি বলেই দিয়েছে,"ধার্মিক লোকেরা যেভাবে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে, আমিও তেমনি বিবর্তনবাদি বিশেষজ্ঞদের কথা এবং লেখায় বিশ্বাস স্থাপন করি!" অপর আরেক শিক্ষার্থী স্বীকৃতি দেয় যে, "এটা একটা প্রমাণ বিহীন অন্ধবিশ্বাস"। তাদের কারো কাছেই এমন কোন প্রমাণ নেই যে কোন প্রানী এক জাত থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তর হয়েছে। বস্তুত দুনিয়াতে এমন কোন পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈজ্ঞানিক অথবা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই[১৭]। মূল ব্যপার হচ্ছে এরা কাফির সম্প্রদায়,এরা যেকোনরূপে আল্লাহকে অস্বীকার করবে, প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও। এজন্যই আর্কিওলজিক্যাল, ম্যাথম্যাটিক্যাল[১৯] অবজারভেবল সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা স্বত্ত্বেও দুরাচারী কাফিররা অবিশ্বাস করে। এজন্যই বিবর্তনবাদের মিথ্যাচার প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া ঠেকাতে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট হাজারো দীর্ঘকায় মানব কঙ্কাল ধ্বংস করেছে[১৮]।

মুসলিমদের মধ্যে অন্তরে যাদের রোগ আছে তারাই এদের সান্নিধ্যের কামনা করে,এদের সঙ্গে আপোষ করে, গায়েবের ব্যপারে শার'ঈ আকিদাগুলোকে কুফরের চাকায় ঘোরায়,সত্যকে মানতে পারে না। এই পর্বভিত্তিক আর্টিকেল সিরিজের অন্যতম উদ্দেশ্য এই বিকৃতিকে সুস্পষ্টভাবে দেখানো, সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করা,আকিদাগত বিচ্যুতির ব্যপারে সতর্ক করা। আল্লাহ যাদের বক্ষকে সত্যকে ধারণ করবার উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন তারা অবশ্যই কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বকে গ্রহন করবে এবং শয়তানের থেকে আসা কুফরি সৃষ্টিতত্ত্বকে বর্জন করবে।

আত-তাফাক্কুর ফি খলকিল্লাহ
আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা

তাফাক্কুর ফি খলকিল্লাহ বা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ফিকির করা অত্যন্ত ফযিলত পূর্ণ ইবাদত। অন্তরের অসংখ্য ইবাদতের মধ্যে এটা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ন ইবাদত।

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ সহিহ সনদে বর্ননা করেছেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন,'*অল্প সময়ের চিন্তা ফিকির একরাত জেগে নামাজ পড়ার থেকে উত্তম*'।

সালাফগন তাফাক্কুরের প্রতি অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন।ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন,'*আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম।*'

একজন আদর্শ মু'মিনের হৃদয় সবসময় জাগ্রত থাকে। আসমান ও যমীনের প্রতিটি সৃষ্টিতে আল্লাহর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি বস্তুতে দয়াময় আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিয়ন্ত্রন এবং তার নিপুণ জ্ঞানের নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তিনিই ভুমন্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু’দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শণ রয়েছে, যারা চিন্তা করে[রা'দ ৩]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা’ আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর

আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে [বাকারা:১৬৪]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার একত্ব, ক্ষমতা প্রকাশের পূর্বে অজস্র আয়াতে আসমান যমীন,চাঁদ-সূর্য ও নক্ষত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো সবই আল্লাহর নিদর্শন। জ্ঞানীরাই এসকল নিদর্শন বা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। আল্লাহর প্রতিটা সৃষ্টি এরূপ নিদর্শনস্বরূপ যা মানুষকে আল্লাহর কথা এবং তার সাথে পুনরুত্থান দিবসে সাক্ষাতের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং সে ব্যপারে বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। আল্লাহ বলেনঃ

اللّهُ **الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ**

আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও [সূরা রা'দ ২]

বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান অনুযায়ী সমস্ত সৃষ্টি একরকম এ্যাক্সিডেন্টের দ্বারা সৃষ্টি। এতে কোন তাৎপর্য নেই। অথচ আল্লাহ এতে গভীর তাৎপর্যের কথা বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আসমান ও যমীনকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। এগুলো কোন তাৎপর্যহীন অনর্থক সৃষ্টি না যেমনটা বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান বলে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পছন্দ করেন এসব নিয়ে তার বান্দারা গভীর চিন্তাভাবনা করুক। দুঃখজনক ব্যপার হচ্ছে আজকের প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে চরম বিকৃত ধারনা দেয়,নিঃসন্দেহে সে বিকৃত অপবিদ্যাভিত্তিক চিন্তাগবেষণা একদমই নিরর্থক। একইভাবে কাফিরদের ভিত্তিহীন কুফরি দর্শনকেন্দ্রিক ধারনার উপর ভিত্তি করে চিন্তাগবেষণাও অর্থহীন এবং নিতান্ত মূর্খদের কাজ। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহর সৃষ্টির ব্যপারে সঠিক ধারনা করে এবং সে ব্যপারে চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেনা। রহমানের বান্দারা দাঁড়ানো,বৈঠকে ও শায়িত সর্বাবস্থায় সত্যিকারের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে চিন্তা ও গবেষণা করে। আসমান ও যমীনের বিভিন্ন নিদর্শনের ব্যপারে চিন্তাভাবনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেনঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও[আল ইমরানঃ১৯১]

রেফঃ

[১]
https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/documentary-article-series_10.html

[২]
http://www.sydhav.no/giants/saudi_arabia.htm
http://objectiveministries.org/creation/news.html#8-2-2004%20
https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_11.htm
https://answersingenesis.org/creationism/arguments-to-avoid/were-giant-skeletons-found-in-the-desert/

[৩]
https://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/skeletons-china-giants-5000-year-old-archaeologists-discovered-jiaojia-jinan-shandong-a7824326.html
http://www.wondersandmarvels.com/2016/07/ancient-romans-excavate-a-giant-skeleton-in-morocco.html
https://www.gaia.com/article/giant-skeletons-have-been-found-buried-in-mounds-across-america

[৪]
https://skeptoid.com/episodes/4390
https://strangesounds.org/2019/06/red-haired-cannibal-giant-lovelock-cave-video.html
http://earthmysterynews.com/2017/03/28/the-ancient-giants-of-nevada-and-the-mystery-of-lovelock-cave/
https://www.ancient-origins.net/myths-legends-americas/lovelock-cave-tale-giants-or-giant-tale-fiction-003060

[৫]
https://michaeltellinger.com/todays-trip-to-giant-footprint/
https://m.youtube.com/watch?v=dRuxw-nZoJw

[৬]
https://michaeltellinger.com/fossilized-giants-found-in-south-africa/
https://michaeltellinger.com/giants-in-history/

[৭]
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%AE_%E0%A6%9A%E0%A7%82%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE
http://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/jamesbondbd/28896872

https://www.islamiclandmarks.com/various/adams-peak
http://sripada.org/adams-peak-ascent.htm
http://www.mysrilankaholidays.com/adams-peak-history.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adam%27s_Peak

[৮]
http://ramubangalore.blogspot.com/2013/02/footprints-of-bheema-near-bangalore.html

[৯]
https://m.youtube.com/watch?v=1Qisl-4Bx6Y

[১০]
https://m.youtube.com/watch?v=KMfcGxWiz3c
https://m.youtube.com/watch?v=m0QE90hAg1U

[১১]
https://m.youtube.com/watch?v=mFQZZsTba2Q
https://m.youtube.com/watch?v=r0-xY3Gb1Vk
https://m.youtube.com/watch?v=Wegrsx8dw4I
https://m.youtube.com/watch?v=W7VXSzMsqHQ
https://m.youtube.com/watch?v=opZuu08EiEQ
https://m.youtube.com/watch?v=j5fYsfDwtmI

[১২]
https://m.youtube.com/watch?v=CV1czPLeiEw
https://m.youtube.com/watch?v=oeACqqOX5TU
https://m.youtube.com/watch?v=TeEyEJ88CBg
https://m.youtube.com/watch?v=q4WpVLfc4q8

[১৩]
https://www.ancient.eu/Egyptian_Obelisk/

[১৪]
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80:%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2/%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%98%E0%A6%B0
http://www.al-ihsan.net/FullText.aspx?subid=4&textid=2221
http://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/chirag/29706171
http://iqbalahmed42024.blogspot.com/2017/05/blog-post.html?m=1

[১৫]
https://www.newyorker.com/tech/elements/baalbek-myth-megalith
https://maptia.com/martaprzybyl/stories/the-legends-of-baalbek
https://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/forgotten-stones-baalbek-lebanon-001865
https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/monumental-baalbek-largest-building-blocks-earth-00656
https://www.middleeasteye.net/discover/baalbek-lebanon-ruins-tour

[১৬]
https://blog.mukto-mona.com/2011/09/25/19004/

[১৭]
https://m.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ

[১৮]
https://www.gaia.com/article/this-conspiracy-claims-the-smithsonian-destroys-giant-skeletons
https://newsinstact.com/earth/smithsonian-confess-the-destruction-of-giant-skeletons-and-evidences/amp/
https://www.disclose.tv/smithsonian-museum-ordered-large-scale-cover-up-of-giant-nephilim-skeletons-314715

[১৯]
https://m.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE

[২০]
https://www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/splash.html
https://www.space.com/13352-universe-history-future-cosmos-special-report.html
https://www.universetoday.com/54756/what-is-the-big-bang-theory/

[২১]
https://www.youtube.com/watch?v=aGzGH6MgCHI
https://www.youtube.com/watch?v=1_vnQqKufMk
https://www.youtube.com/watch?v=frB_A8nvMvs
https://www.youtube.com/watch?v=DtJkZ387a34

বিগত পর্বগুলোঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2019/03/article-series_85.html

ওয়া আল্লাহু আ'লাম

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

[সমাপ্ত]